মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের

কাশীবাস।

মহামহোপাধ্যায়োপাধিক

শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

সঙ্কলিত।



কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed at

Messrs J. G. CHATTERJEE & CO.'S PRESS,

44, Amherst Street, CALCUTTA.

সন ১৩১২।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীদুর্গা।

উৎসর্গ পত্র।

সতীকুলশিরোমণি, আশ্রিতপালিনী, অন্নপূর্ণারূপিণী,

হাতুয়ার মহারাণী

তাঁহার পবিত্র-নামে উৎসর্গীকৃত এই

ক্ষুদ্রোপঢৌকন গ্রহণ করুন।

विनिग्रह-महाशनि-द्विषदरण्य-विद्राविणी
धराप्रथित-हातुया-शुभविमानमालम्बिनी ।
सदाधिदवहारिणी जगति कापि कादम्बिनी
महामहिमशालिनी विजयताम्महीपालिनी ॥

तत्सूनुर्लभतां गणेशगुरुतां कौमारिकीं वीरतां
यस्मात् सा शरणागताय जननी क्षेमप्रदा चाम्बदा ।
लब्ध्वा तत्तनयापि सिन्धुतनया-दृष्टिं शुभां शोभतां
इत्थं नित्यमहं परं पुरभिदः पादद्वये प्रार्थये ॥

নিবেদন।

যাঁহার উদ্বেগরাশি ভবে গিয়াছেন নাশি'
মা তোমার স্বর্গগত স্বামী,
স্বামী তব স্বর্গে গেলে যাঁহার উদ্বেগ এলে
বিন্ধ্যাচলে ঘুচায়েছ তুমি,
মাগো এই ক্ষুদ্র গাথা তাঁহারি জীবন-কথা
সে জীবন তোমারি সংসারে
ল'য়ে আত্মপরিজন অনুদিন, অনুক্ষণ,
সুখে দুঃখে স্মরিয়া তোমারে,
যাপিছে বার্দ্ধক্য-দিন অন্য যত আশা ক্ষীণ,
দুটী মাত্র ভিক্ষা বিভু-পাশে—
তোমার কল্যাণ ; আর, ভবরজ্জু আপনার
যায় যাহে চিরতরে খ'সে।
ধন্য সে বিবুধ-মণি অন্নপূর্ণা-স্বরূপিণী
তুমি যাঁর জননীর প্রায়,
রাজ্যেশ্বরী ধন্যা তিনি নিত্য পূজিছেন যিনি
নররূপি-পূর্ণ-দেবতায় !
শক্তি যথা শক্তিধরে সুত যেন শক্তি ধরে
সিন্ধুসুতা পালুন সুতায়,
পূর্ণ আয়ুঃ পাও সবে, চিরানন্দ চিরোৎসবে
রাজ্যেশ্বরি বিরাজ' ধরায়।





[illegible]

শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন।



ভূমিকা

অস্মদ্‌গণের মস্তকের চূড়া পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লী পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসার্থ গমন করিলে পর হইতে, দেশের বহু-সম্ভ্রান্তব্যক্তি কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া আসিতেছি যাহাতে বঙ্গদেশে তাঁহার স্মরণ-চিহ্নরূপে একখানি পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই কার্য্যটী সম্পন্ন করা আমরা নিতান্ত সহজ জ্ঞান করিতে পারি নাই। কারণ, কেবলমাত্র সন-তারিখ সহযোগে বাহ্য-ঘটনাবলীর সমাবেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে। আমাদের বিশ্বাস এই, যাঁহার জীবনে যে অংশে অলৌকিকত্ব, চরিতাবলী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে তাঁহার জীবনের সেই অংশ বিশদরূপে বিবৃত করা সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের যাহা অলৌকিকত্ব, তাহা সর্ব্বসাধারণের অনুভূত হইবার বস্তু নহে। শাস্ত্র-তত্ত্বে দীর্ঘকাল শ্রম করার পর, শাস্ত্রোক্ত-প্রথায় যুক্তিবাদ পর্য্যালোচনা করিবার পক্ষে যাঁহারা তীক্ষ্ণদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অলৌকিকত্ব তাঁহারাই মাত্র অনুভব করিবার অধিকারী। যাঁহার অলৌকিকত্ব অনুভব করিতে হইলে, তুল্য পথের পথিক হইয়া অগ্রে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া লইতে হয়, সর্ব্বসাধারণকে তাঁহার অলৌকিকত্ব

সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করান সম্ভবপর হইতে পারে না। জীবনের যে যে অংশ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই মাত্র এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব, এই পুস্তকখানি প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনচরিত নহে। জীবনের বিশেষ-ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পরিচায়ক মাত্র। কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি-কর্তৃক ভবিষ্যতে জীবনচরিত রচিত হইলে, এইগুলি তাহার উপকরণ-রূপে গৃহীত হইতে পারিবে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে যেন তিনটী জীবনের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। কবিজীবন, অধ্যাপকজীবন ও ঋষিজীবন। ন্যায়রত্ন মহাশয় আপনার কবিজীবনকে কোনও রূপ প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনে নিয়োগ করেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত দুইজীবনে রাঢ়ে বঙ্গে সর্ব্বত্র তাঁহার ছাত্র, শিষ্য এবং ভক্তসম্প্রদায় পরিগঠিত। আমরা এই পুস্তকে উক্ত তিন জীবনেরই কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কাল এক্ষণে ভাল নহে। দেশের হিতকর বোধে শিক্ষামার্জ্জিত-বুদ্ধি, পক্ককেশ-মনীষিগণ যে বিষয়ের শিক্ষক, অসম্যক্‌-পরিপক্কবুদ্ধি, আত্মাভিমানী, যুবক এক্ষণে অনেকক্ষেত্রে সেই বিষয়ের সমালোচক। পথের প্রকৃত পথিকে যে বিষয়ে তত্ত্বাতত্ত্বের নির্দ্ধারক, স্বতন্ত্র-পথচারী, লৌকিকযুক্তি-সর্ব্বস্ব, অপরিণতবয়স্ক ব্যক্তি সেই বিষয়েরই হয়তো পরীক্ষক। এইরূপ স্ব-স্বপ্রধান বিচারক-পরিব্যাপ্ত সময়ে, সকল সিদ্ধান্ত সকলের নিকট সমানভাবে পরিলোকিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি দেশের উপকারার্থ আত্মজ্ঞান মতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য নহে, এইরূপ বিশ্বাস থাকায় এই পুস্তকখান আমরা স্বাধীনভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং স্বদেশবাসীদিগের জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি,

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৩	১১	অনুসঙ্গ	অনুষঙ্গ
২০৭	৩	লোহণিনা	লোহমণিনা
২৩৬	১৭	পুরীততিত	পুরীততিতে
২৩৭	১৯	প্রামান্য	প্রামাণ্য
২৩১	১২	মীমাংসা	মীমাংসার বিষয়
২৪২	১	বিভশ্চেৎ	বিভাগশ্চেৎ
২৪৬	৬	জীবানং	জীবানাং
২৪৬	১৩	ভেদ-সংস্থাপনে যে তর্কসিদ্ধদোষ	যে ভেদ-সংস্থাপনে তর্ক
২৫৭	১০	নিত্য	নিত্যঃ
৩৭২	৫	পুরণাদি	পুরাণাদি
৩০৯	৯	প্রাণায়ম	প্রাণায়াম
৩০৯	১৪	প্রাণায়ম	প্রাণায়াম
৩২০	১৭	সদ্‌জ্ঞান	সজ্‌জ্ঞান



পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৫	১	অসীৎ	আসীৎ
১৬৯	৩	তদৈক্ষত	স ঐক্ষত
১৭২	১৮	অস্মৎ	অস্মৎ
১৭২	২৩	কর্ত্তা	কর্ত্তৃত্ব
১৭২	২৩	অব্যয়ত্বাবচ্ছেদে	অবিত্তারাহিত্যাবচ্ছেদে
১৭২	২৩	অকর্ত্তা	অকর্ত্তৃত্ব
১৭৩	১	সহে	নহে
১৭৩	১৮	উৎপত্তি	উৎপাদক
১৭৫	৪	†	†
১৭৬	১৩	জলধারা	জন্যজলধারা
১৭৬	২০	রন্ধ্রস্তক	রন্ধ্র
১৭৬	২১	ত্র্যাসরেণু	ত্রসরেণু
১৭৭	১	ভূতধারার	জন্য ভূতধারার
১৭৭	১২	ত্র্যাসরেণু	ত্রসরেণু
১৭৭	২২	ত্র্যাসরেণু	ত্রসরেণু
১৭৯	২১	জুষমানো	জুষমাণো
১৮০	১৪	সমমেত	সমবেত
১৮১	১২	মুখান্ত	মুখ্যান্ত
১৯১	২০	ধর্ম্মের	ধর্ম্মীর
১৯২	১৯	সথয়া	সথায়া

† ১৭৫ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তিতে "তৈজস পরমাণুমূলক।"—ইহার পরেই এই অংশটুকু হইবে। যথা—"তৎপরেস্থূ জল ভূতদ্বিতয়াত্মক।"



মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের

কাশীবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভট্টপল্লী-সমাজ ও বশিষ্ঠবংশের পরিচয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্ম। পূর্ব্বপুরুষ ও ভ্রাতৃবর্গের পরিচয়। পূর্ব্বপুরুষের বঙ্গদেশে আগমন ও ভট্টপল্লীতে বাসস্থাপন বৃত্তান্ত। পাঠারম্ভ। বিবাহ। তদনুসঙ্গে পত্নী পুত্রাদি পরিজনেরও পরিচয় সমাপন।

ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া বঙ্গীয় বিদ্বৎ-সমাজে বহুকালাবধি সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। এই পবিত্র স্থান ভারত-রাজধানী কলিকাতা হইতে ন্যূনাধিক ২৪ মাইল উত্তরে, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত, এবং পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর পূর্ব্ব-কূলে অবস্থিত।

মহর্ষি বশিষ্ঠ-দেবের বংশ-সম্ভূত কতিপয় হিন্দু পরিবার এই স্থানে বাস করেন। স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও পবিত্রতার জন্য, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের

মধ্যে, এই বংশের গুরুতা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এই বংশে পূর্ব্বাবধি অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ভট্টপল্লী-সমাজকে এইরূপ প্রাচীন বিদ্বৎ-সমাজের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় করাইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয় সন ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র তারিখে এই পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পিতা ৺ সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম, দানাদি করিতেন, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেন, বিষয়ী লোকেও সকলে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি জীবনে কত বস্ত্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি বৎসরই শীতকালে চাদর ও বনাত দান ছিল। এতদ্ব্যতীত বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে ভাল শালও সদ্ব্রাহ্মণে দান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই পিতার একোদ্দিষ্টের সময় অতিযত্নে বিবিধ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়া দলস্থ সকল ব্যক্তিকে ভোজন করাইতেন, এবং ঐ সময় প্রতিবৎসরই ত্রিবেণী-সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আহ্বান করিতেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে নবদ্বীপ-সাধারণও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা প্রভৃতিও যাবজ্জীবন করিয়াছেন। গোসেবা তিনি অসাধারণ ভাবে করিতেন। অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে অন্যে যে গাভী পরিত্যাগ করিতেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই গাভী খরিদ করিয়া অনেক সময় দুগ্ধবতী করিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এত ক্রিয়াশীল ছিলেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ক্রিয়াকর্ম্মে কেহ প্রশংসা করিলে অনেক সময়েই তাঁহাকে বলিতে শুনা যায় "বাবা যেরূপ

ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার তৃতীয়াংশও আমি করিতে পারিলাম না।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও স্ববাহুবলে ধর্ম্ম-ধন উপার্জ্জনের দ্বারা এই সকল ক্রিয়াকর্ম্ম দানাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অথচ নিজ সন্তানগণকে একেবারে নিরন্ন করিয়া যান নাই। স্থূল ভাবে অন্নবস্ত্র পাইয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, নিজের চারি পুত্রের জন্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশীলাভ করেন। তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বয়ঃক্রম আনুমানিক ৩৬ বৎসর। মৃত্যুর একমাস মাত্র পূর্ব্বে তিনি কাশীবাস করিয়াছিলেন। তাদৃশ মহাত্মার অবস্থানে গ্রামের মঙ্গল, ইহা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় বিশ্বনাথ অধিক পূর্ব্বে তাঁহাকে কাশীধামে লইয়া যান নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতীব রসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সেই রসিকতা বাঙ্গালা মেয়েলি ছড়ায় সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার গুরু ভার বিধাতা তাঁহার মস্তকে ফেলিয়া ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দুই বিবাহ ছিল। সপত্নী-বিদ্বেষ বশতঃ জগতের চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে যখন পত্নী-দ্বয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়া সাংসারিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা ঘটিত, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎক্ষণাৎ এমন রসিকতাপূর্ণ মেয়েলি ছড়া বাঁধিতেন যে, পরিবারদ্বয়ের কলহ ঘুচিয়া গিয়া হাসি সম্বরণ করিবার উপায় থাকিত না। এখনও কোন' যুবক দুই বিবাহের নাম করিলে, ভট্টপল্লীর পাঁচবাটীর পাড়ার (অর্থাৎ যে পাড়ায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাস ছিল, সেই পাড়ার) বুড়ীরা নানারকম রঙ্গভঙ্গের সহিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুরের রচিত ছড়া আবৃত্তি করিয়া দুই বিবাহের দোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন শোনা যায়।

সাত জন্ম থাকি যেন
আইবড় হ'য়ে,
এমন সুখের মুখে ছাই
(যে জন) করে দু'টো বিয়ে ॥
দুটো বিয়ের কথা কিছু
সংক্ষেপেতে কই
কত মজা দেখ্‌ব যদি
আর কিছু কাল রই ॥
টাকার উপর টাকার বোঝা
শাড়ীর উপর শাড়ী,
ভারে ভারে এনে যোগাই
তবু বদন ভারি ॥
সৃষ্টিছাড়া নূতন সৃষ্টি
এম্‌নি মিষ্টি বচন,
অকারণে হিংসে সদা
মিন্‌সে জ্বালাতন ॥
ব'লে ক'য়ে গেলেম যদি
ছোট রাণীর ঘরে,
অম্‌নি শুনি, "দূর হ'য়ে যাও
কায কি আছে মোরে।"

যত সাধি, অপরাধী,
কেবল বলেন রোষে
"মাথায় করে' এনে ঘরে
পায়ে হান, শেষে।"
বড় মহিষী, বল্‌ব কি হায়
তাঁর ব্যবহার,
প্রাণপণে মন যোগাই যদি
তবু বদন ভার ॥
বোঝা ব'য়ে মরেন শালা
চোরের মতন সাজা,
বুকে বসে' দাড়ি ছেঁড়ে
এই টুকু কি মজা !!
কার সাধ্য কে টেক্‌তে পারে
দুই সতীনের চোটে,
যখন যিনি বল্‌তে থাকেন
মুখ দিয়ে খই ফোটে ॥
বড় বলেন "সর্ব্বনাশী
তুই বাড়ীর দাসী,
ছোট বলেন "কর্ত্তা আমি
কথা শুনে হাসি ॥"

"আঁটকুড়ি" "চোক খাগী"
উভয়েরই বোল,
মাঝে মাঝে মারামারি
নিত্য গণ্ডগোল॥
পাড়াপরশি, বড়ই খুসী,
মজা দেখেন বসে';
যার জ্বালা, সেই জানে,
মিন্‌সে বেড়ায় ভেসে॥

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বহুপরিজন সত্বেও পুণ্যবলে জীবনে কখনও তাঁহাকে শোক পাইতে হয় নাই। কেবল তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে কনিষ্ঠা পত্নীর গঙ্গালাভ হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঐ জ্যেষ্ঠা পত্নীর নাম বিমলা দেবী এবং কনিষ্ঠা পত্নীর নাম হরমোহিনী দেবী। প্রথম পত্নী বিমলা দেবীর গর্ভে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্ম। ৺তারাচরণ তর্করত্ন ও ৺অন্নদা-চরণ তর্কভূষণ নামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আরও দুই কনিষ্ঠ সহোদর ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হরমোহিনী দেবীর গর্ভে ৺অভয়াচরণ বিদ্যারত্নের জন্ম হয়। ৺তারাচরণ তর্করত্ন জ্যেষ্ঠ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যপ্রাচীন সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া কাশীরাজের সভাপণ্ডিতরূপে ৺কাশীধামে অবস্থান করতঃ কাশী সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পশ্চিম দেশীয় ৺দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত-গণকে শাস্ত্রীয় বিচার সভায় সর্ব্বদা তর্করত্ন মহাশয়ের প্রাধান্য স্বীকার

করিতে হইত। ইঁহার কবিত্ব শক্তিও অসাধারণ ছিল। কেহ কোনও সমস্যা পূরণ করিতে বলিলে, তিনি সেইক্ষণেই তাহা করিতে পারিতেন। ভ্রাতা অভয়াচরণ এবং অন্নদাচরণও স্মৃতিশাস্ত্রে উপযুক্ত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ফলতঃ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে যাঁহার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, কাহাকেও শাস্ত্রানভিজ্ঞ দেখা যায় না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণও সকলেই কোন' না কোন' শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিয়া গিয়াছেন। পিতা ৺সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পিতামহ ৺গোপীনাথ তর্কালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রে এবং প্রপিতামহ ৺বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত স্মৃতি শাস্ত্রে অধ্যাপক ছিলেন। বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺রাম গোপাল বিদ্যাবাগীশের ন্যায় নৈয়ায়িক তৎকালে কুত্রাপি ছিলেন না। এই সকল মহাত্মারা কেবলমাত্র এইরূপ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির গৌরবে গৌরবান্বিত নহেন, প্রত্যেকেই এক একটি ঋষিবিশেষ ছিলেন, এবং অনেক সময় দৈব কার্য্য করিয়া দেব-দয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। কথিত আছে, এক সময় অবস্থা-বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়ায়, ৺রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সংকল্প করতঃ সংযতভাবে শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করেন। ঐ চণ্ডীপাঠ শেষ হইবামাত্র, একটী ক্ষেমঙ্করী পক্ষিণী দক্ষিণদিক্ হইতে উড়িয়া আসিয়া বিদ্যাবাগীশ ঠাকুরের নিকট একটী মোহর ফেলিয়া দেয়। তদনুসারে দক্ষিণদেশে গমন করতঃ, মেদিনীপুর জেলার দোরো পরগণায় বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ঐ ভূসম্পত্তি 'রামগোপাল চক' নামে অদ্যাপি অভিহিত হইয়া আসিতেছে, এবং ঐ সম্পত্তি নিবন্ধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বংশধরগণ এপর্য্যন্ত অন্নকষ্টে পতিত হন নাই। দক্ষিণ দিক্ হইতে পক্ষিণীকে আসিতে দেখিয়া দক্ষিণ দেশে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ভাগ্যোন্নতি হওয়া দেবীর

অভিপ্রেত, ইহা তাঁহার পিতা ৺ রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর বুঝিতে পারেন এবং তাঁহারই অনুমতি ক্রমে বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ঐরূপে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া উক্ত ভূমি, দান-রূপে লাভ করিয়াছিলেন।

স্বীয় ব্রাহ্মণ্য রক্ষার দ্বারা তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণ সন্তান কতদূর উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে ঋষিগণের অলৌকিক চরিতাবলী যেমন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে, ভট্টপল্লীর পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের জীবনী অন্বেষণ করিলেও সেইরূপ তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর সাধনাবলে সর্ব্বজ্ঞ বিশেষ হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে যেরূপ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কাহিনী ভট্টপল্লীর বৃদ্ধ-পরম্পরায় ও শিষ্য-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বাহুল্য বিবেচনায়, সে সকল এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। কিম্বদন্তী আছে, লোকে মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন কাশীবাস করে, ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর সংকল্প করতঃ সেইরূপ গঙ্গাগর্ভে শতহস্তের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যু-সময়ে নানারূপ দৈব চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া জনরব আছে। এই সকল মহাত্মার অবস্থান সময়ে ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দু-সন্তানের চক্ষে ভট্টপল্লী, মহর্ষিগণের পুরাকালীন তপোবনের ন্যায় পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হইত। এক কালে ঈদৃশ মহাত্মারা ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুসন্তানকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বঙ্গব্যাপি-শিষ্যাবলীর বিস্তৃত শাখা প্রশাখার চক্ষে অদ্যাবধি ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠ-সন্তানেরা অনেকেই দেব-ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষের বঙ্গদেশে প্রথম আগমন ও ভট্টপল্লীতে বাসস্থাপন সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত এইরূপ। ন্যায়রত্ন মহাশয় হইতে

একাদশ পুরুষ ঊর্দ্ধে ৺গদাধর ঠাকুর নামে বশিষ্ঠ-বংশোদ্ভূত কান্যকুব্জবাসী একজন যজুর্ব্বেদী মহাসুধী ব্যক্তি, তীর্থ-যাত্রা করিয়া সস্ত্রীক ভ্রমণ করিতেন। একদা শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গমন কালে পথিমধ্যে বাঙ্গালা দেশে তাঁহার পত্নীর গর্ভ-চিহ্ন লক্ষিত হয়। গর্ভাক্রান্তা পত্নীকে লইয়া আর অগ্রসর হওয়া গদাধর ঠাকুর অবৈধ বিবেচনা করিলেন। অথচ রথ-যাত্রা সময়ে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ সন্দর্শন করিবার সংকল্প থাকায় তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। পত্নীর প্রসবাপেক্ষা না করিয়াই ঐ ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা বকদ্বীপ বা বগ্‌ড়ি নামক স্থানে কোনও সুবিশ্বস্ত ভদ্র লোকের বাটীতে পত্নীকে রাখিয়া একাকী পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া আসিলেন। সেই স্থানে তাঁহার এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ পুত্রের নাম জনার্দ্দন। শিশু জনার্দ্দনকে লইয়া তৎকালে কান্যকুব্জে যাওয়া অসম্ভব বোধে গদাধর ঠাকুরকে অগত্যা বকদ্বীপেই অপেক্ষা করিতে হইল। তথায় নিজ পাণ্ডিত্য, অনুষ্ঠান ও দৈবী-শক্তি দ্বারা অচিরেই সর্ব্ব-সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করায়, অবশেষে বঙ্গদেশে স্থায়িভাবেই থাকিয়া গেলেন। অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয় হইতে একাদশ পুরুষ পূর্ব্বে, বঙ্গীয় সন দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষের আদি নিবাস স্থাপিত হয়।

পরে জনার্দ্দন ঠাকুর, পাঠান-অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বকদ্বীপ হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গে নিরুপদ্রব-সমৃদ্ধিশালী প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে গমন করতঃ যমুনোপকূলস্থ ধূলিপুর নামক স্থানে বাস-স্থাপন করেন। ধূলিপুর বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত, সাতক্ষীরা সব্‌ডিভিসনের অধীন। তথায় নানারূপ সাধনার দ্বারা ৺জনার্দ্দন ঠাকুরের পুত্র

নারায়ণ ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ, তিনি গঙ্গাস্নান করিবার জন্য প্রত্যহ প্রত্যূষে ধূলিপুর হইতে ভাটপাড়ায় আগমন করিতেন। ভাটপাড়া ধূলিপুর হইতে তিন দিবসের পথ হইবে। সিদ্ধপুরুষ তপোবলে এই সুদীর্ঘ পথ প্রত্যহই প্রত্যূষে গমনাগমন করিতেন। ভাটপাড়ার ভূম্যধিকারী হালদার বংশীয়গণ, এই অলৌকিক তপঃপ্রভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে অন্যান্য বহুতর আস্তিক ব্রাহ্মণ-সন্তানও তাঁহার শিষ্য হন্। এই সকল পরিবারের অধস্তন বংশধরেরা অদ্যাবধি নারায়ণ ঠাকুরের বংশেরই শিষ্য। জমীদারেরা গঙ্গাতীরে গুরুর একটী তপস্যা-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তদবধি নারায়ণ ঠাকুর সেই স্থানে থাকিয়া অনেক সময়ই গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিতেন। পরে ঐ স্থানে তাঁহার গঙ্গালাভ হইলে, তাঁহার পুত্র ৺রামনাথ ঠাকুর ধূলিপুর হইতে সপরিবারে আসিয়া গঙ্গাবাস করিলেন। অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয় হইতে অষ্টম পুরুষ পূর্ব্বে, ভট্টপল্লীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিবাস স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রামনাথ ঠাকুর সপরিবারে ভাটপাড়ায় আসেন নাই। অস্থায়ি ভাবে সময়ে সময়ে আসিয়া তিনিই মাত্র ভট্টপল্লীর পিতৃ-আশ্রমে তপোজপাদি করিতেন। তাঁহার পুত্র ৺চন্দ্রশেখর ঠাকুর সপরিবারে ভাটপাড়ায় উঠিয়া আসেন।

যে সকল বশিষ্ঠবংশীয় মহাত্মারা এক্ষণে ভাটপাড়া উজ্জ্বল করিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুরের বংশ-সম্ভূত, আহার পরিচ্ছদাদির সাত্ত্বিক নিয়ম, মৎস্য, মাংস প্রভৃতির ত্যাগ, শূদ্রাদির নিকট প্রতিগ্রহ বর্জ্জন, যথানিয়মে ঈশ্বর আরাধনা ও হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত অন্যান্য কঠোর নিয়ম সকল অদ্যাবধি

ভট্টপল্লীর সিদ্ধ-সন্তানগণের মধ্যে বহুলভাবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, এবং সংস্কৃত-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের পদানুসরণ করিবার জন্য, এখনও এই বংশের বহুতর সন্তান সচেষ্ট আছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও ব্রহ্মনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যই এই বংশে চলিত হয় নাই। এবম্বিধ পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বংশ-ব্যাপি গুণাবলীর সাহচর্য্য দর্শনে বালক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাল্যকালীন মনোবৃত্তি সকল গঠিত হইতে লাগিল।

বাল্য-সহচরগণ সহ ধূলাখেলা করিতে করিতে ক্রমশঃ ন্যায়রত্ন মহাশয় পঞ্চম বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। এই সময় শুভ দিনে যথা নিয়মে তাঁহাকে বিদ্যারম্ভ করান হইল। বিদ্যারম্ভ দিনে বালকের হাত ধরিয়া খড়ির অক্ষরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যখন প্রথম লেখান হইল, তৎপূর্ব্বে সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক "শ্রীদুর্গা" এই তিনটী অক্ষর লেখাইয়া লওয়া হয়। তদবধি এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় "শ্রীদুর্গা" না লিখিয়া একটীও বর্ণ কদাপি লেখেন না। অপর কর্ত্তৃক লিখিত বিষয়ের তলদেশে যদি নিজ নাম স্বাক্ষর করিবার কখনও প্রয়োজন হয়, অথবা দলিল পত্রাদি কিম্বা ইংরাজি আফিস সম্পর্কের অন্য কোনও রূপ কাগজ পত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার কখনও আবশ্যক হয়, তখনও স্বতন্ত্র কাগজে "শ্রীদুর্গা" এই তিন অক্ষর লিখিয়া পরে নিজ নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বাক্ষরিত লিপি যদি কোনও উদ্দেশ্য সাধনে কখনও শক্তি দেখাইয়া থাকে, অথবা তাঁহার লিখিত পত্রাদি কখনও ভদ্র-স্থানে যদি আদর পাইয়া থাকে, তবে বিদ্যারম্ভ দিনে গুরুর নিকট প্রথম-প্রাপ্ত ঐ ত্র্যক্ষরী

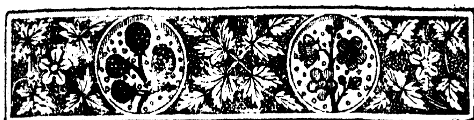
মহামন্ত্রই তাহার মূলীভূত হেতু, ইহাই যেন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিরদিনের অন্তর্ব্বদ্ধ বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এইরূপে হাতে খড়ী হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই গুরুমহাশয়ের নিকট যথানিয়মে অক্ষর পরিচয়াদি হইল। তাহার পরেই ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সুপদ্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ঐ ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ হইলে উক্ত অধ্যাপকেরই নিকট অমরকোষ অভিধান, সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন যথাক্রমে আরব্ধ হইল। এই সময়ে (চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে) ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবাহ হয়।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্বশুর ৺কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগবত ও পুরাণাদির ব্যাখ্যা করিতেন। পত্নী সুপ্রভা দেবী রূপে ও গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পত্নীর গঙ্গালাভ হয়। লক্ষ্মীর বিবিধ-প্রকার উপকরণের দ্বারা তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংসার সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বহু সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইলেও, স্ত্রীজন-সুলভ গর্ব্ব তাঁহার চিত্তে কখনও উদিত হইত না। কোনও স্ত্রীলোকের সহিত জীবনে কখনও তিনি কলহ করেন নাই। ছাত্র, অতিথি, ভৃত্য ও আশ্রিতগণকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, সর্ব্বশেষে তিনি তাহাই ভোজন করিতেন। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা এক-বাক্যে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার তুল্য মায়া, দয়া, সদ্‌বুদ্ধি ও সাংসারিক কার্য্যকুশলতা অধুনাতন স্ত্রীলোকগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বহুতর পুত্র-কন্যার মাতা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক পুত্র ছয় কন্যা ইদানীং বিদ্যমান।

পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রী। ইনি ফলিত ও গণিত উভয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও অসাধারণ কাব্য-সাহিত্য-সেবী। কবিত্ব-শক্তি ইঁহাদের বংশগত গুণ হইলেও সেই গুণ ইঁহাতে আরও বিশিষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 'বৃন্দাবন-কল্পলতিকা' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ ও 'শঙ্করাচার্য্য' প্রভৃতি কয়েক খানি বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্য ইনি রচনা করিয়াছেন। 'শঙ্করাচার্য্য' গ্রন্থের কবিত্বে কি সংস্কৃত, কি ইংরাজি উভয় বিদ্যায় পারদর্শী যাবতীয় সুধী ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছেন। এই 'কাশীবাস' গ্রন্থের শেষভাগে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিতা সমূহের তল-দেশে যে সকল বাঙ্গালা মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ও পুত্রেরই কবিত্ব। ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন-ঘটিত ন্যায়রত্নমহাশয়ের যে সকল মীমাংসা প্রদর্শিত হইবে, তৎসমুদয়ও ইঁহারই দ্বারা বঙ্গভাষায় লেখান হইয়াছে। ইঁহার এখনও পাঠাবস্থা। কবিত্ব-শক্তির তুল্য বিদ্যা-গৌরবেও ইনি বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করুন, ইহাও আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বিবাহের পর আরও পাঁচ বৎসর কাল ৺ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেই ন্যায়রত্ন মহাশয় অতিবাহিত করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে ব্যাকরণ মাত্র শেষ হইয়াছিল। তৎপরে যে পাঁচ-বৎসর কাল ঐ চতুষ্পাঠীতে থাকিলেন, সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব-কথিত অমরকোষ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র বিশেষ রূপে চর্চ্চা করিয়া লইলেন। তাহার ফলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কিরূপ অসামান্য শাব্দিকতা ও অলোকসামান্য কবিত্ব-শক্তির সঞ্চার হইল, তাহা এই গ্রন্থের শেষাংশে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন। শাস্ত্রে তন্ময়তা। যশোলাভ আরম্ভ। স্মৃতির ব্যবস্থা-সংগ্রহ। অধ্যয়ন সমাপ্তি। বিদ্যাবিস্তারে ও তেজস্বিতা রক্ষায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের পৃষ্ঠ-পোষকতা।

১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৺ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠ-সমাপ্তি হইলে পর, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। সে সময় ন্যায়শাস্ত্রের প্রলোভন, নিতান্ত গুরুতর প্রলোভন ছিল। রথী মহারথীর ন্যায় নৈয়ায়িকে দেশ পরিব্যাপ্ত। সভাস্থলে অসীম উৎসাহে দুই তিন দিবস কাল ব্যাপিয়া নৈয়ায়িকের বিচার চলিত। সভাক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অন্তরাল হইতে দেখিত, কোন্ পক্ষ পরাভূত হয়। কি দর্শন শাস্ত্র, কি ব্যবস্থাদি শাস্ত্র, সকলের মধ্যেই নৈয়ায়িকতা। সকল শাস্ত্রের বিচারে নৈয়ায়িক মধ্যস্থ। নৈয়ায়িক সকল শাস্ত্রেরই বিচার শুনিতেছেন, বিচার করিতেছেন ও মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের দ্বারাই সমাজ গঠিত, এবং

সেই সকলের স্বাক্ষরের দ্বারা সামাজিক শাস্ত্রীয় মতামত প্রকাশিত হইলেও, সভা-যুদ্ধে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হইলে নৈয়ায়িক খড়্গ ধরিতেছেন, নৈয়ায়িক বাদি-নিরাশ করিতেছেন, সমাজের প্রাধান্য-পদ নৈয়ায়িকের। সেই পদে দেশ বিদেশ হইতে সমাজের নানারূপ আবেদন, অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে। স্মার্ত্ত, জ্যোতির্ব্বিদ্, বৈয়াকরণ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় নৈয়ায়িকের অনুগত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। এখনও বঙ্গদেশে নৈয়ায়িকেরই প্রাধান্য থাকিলেও, তখনকার কালে ন্যায়শাস্ত্রের প্রলোভন, বড় গুরুতর প্রলোভন ছিল। দেশীয় শাস্ত্র সমূহের চর্চ্চা,যদি সেইরূপ প্রলোভনের সামগ্রী থাকে, তবে তাহার ক্রমিক অবনতি ঘটে না। ভাটপাড়ার তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺ যদুরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ন্যায়রত্নমহাশয় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই ন্যায়-শাস্ত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতিভার বিকাশ হইল। তৎকালে বৃহস্পতি তুল্য ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ভাটপাড়া সমাজের প্রাধান্য-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তিন বৎসর মাত্র ন্যায়-শাস্ত্র পাঠারম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় তর্কচূড়ামণি মহাশয় একদা আমন্ত্রিত হইয়া বাখ্‌লা সমাজে কোনও সভায় গমন করেন। তথায় নানা সম্ভাষণের মধ্যে পণ্ডি-তেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয় আপনার দ্বারা ভট্টপল্লী-সমাজের যে প্রাধান্য সাধিত হইতেছে, সে প্রাধান্য আপনার অবিদ্য-মানে কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইবার আশা আছে কি?" তর্কচূড়ামণি মহাশয় উত্তর করিলেন "রাখাল দাস নামে এক বালক 'বিশেষব্যাপ্তি' মাত্র পড়িতেছে। সে যদি ন্যায়শাস্ত্র শেষ করিতে পারে, ভট্টপল্লীর প্রাধান্য তাহার দ্বারা রক্ষিত হইবে।" তখন ভট্টপল্লীর প্রত্যেক

চতুষ্পাঠীতে অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। উৎকৃষ্ট অধ্যাপকও বহুতর ছিলেন। কিন্তু বালক-ছাত্র রাখাল দাসের প্রতিভায় ও মার্জ্জিত-বুদ্ধিতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কতদূর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল তাহা উপরোক্ত উত্তরে, পাঠক, অনুমান করিবেন।

অধ্যয়ন-সময়ে ন্যায়-শাস্ত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একাগ্রতা ও তন্ময়তা আজকাল একটী শুনিবার সামগ্রী। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যত সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল বা আছে, তাহাতে দশটা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত, বা কোনও বিশেষ সময় হইতে বিশেষ সময় পর্য্যন্ত ছাত্রগণের অধ্যয়ন করিবার নিয়ম নহে। ঐ সকল স্থানে দিবারাত্রি সকল সময়ে ছাত্রেরা শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন। দেশীয় ছাত্রেরা কেবল আহার নিদ্রার জন্য বাটী গিয়া থাকেন। বিদেশীয় ছাত্রেরা চতুষ্পাঠীতেই তাহা সম্পন্ন করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় রাত্রি-কালে ১১।১২টা পর্য্যন্ত বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়া প্রায় গৃহে আসিতেন। বিদ্যার্থি-ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্রে তন্ময়তা এত অধিক ছিল যে, ঐ কার্য্যে সময়ে সময়ে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত হইত। বালক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্য গৃহে ফল-মূল-দুগ্ধাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, বাটী গিয়া ভোজন করিবেন; বাহিরের দরজা খোলা রহিয়াছে; হয়তো ন্যায়শাস্ত্রের জটিল সমস্যা উত্থিত হওয়ায় যথা-কালে সে দিন সায়ং সন্ধ্যা বন্দনা হয় নাই, একেবারে ১০ টা ১১ টা রাত্রির সময় গৃহে গিয়াই তাহা সম্পন্ন করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; এই অবস্থায় কাক-কোকিল ডাকিয়া উঠিল, প্রাতঃস্নায়ী ব্রাহ্মণগণ গঙ্গায় যাইতে লাগিলেন, বাহিরে আলো হইল। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তায় ন্যায়রত্ন মহাশয় এতই তন্ময় যে, তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছে, পুঁথি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। ছাত্রা-

বস্থায়, অধ্যয়নই ব্রাহ্মণ-সন্তানের তপস্যা, ইহা শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় সে তপস্যাচরণের একটী প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। ফলতঃ, তুমি যে বিষয়েই প্রাধান্যলাভ করিতে বাসনা কর, সাধনা-কালে পরিশ্রম ও একাগ্রতায় এইরূপ কোন' না কোন' বিশেষত্ব তোমাকে দেখাইতে হইবে।

যশোলিপ্সায় এখন যেমন সংবাদ-পত্রাদির সাহায্য লওয়া, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের সুখ্যাতি-পত্র সংগ্রহ করা, বিজ্ঞাপন-প্রকাশ প্রভৃতির আবশ্যকতা হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। ধনবানেরা নানা স্থান হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া সময়ে সময়ে সভা-করিতেন। এখন বঙ্গদেশে এ নিয়ম কমিয়া আসিলেও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। পূর্ব্বে ঐ সকল সভায় শাস্ত্রার্থে যিনি উৎকর্ষ দেখাইতে পারিতেন, তিনিই প্রাধান্য লাভ করিতেন। কেবল মাত্র অধ্যাপক হইয়া নহে, ছাত্রাবস্থা হইতেই, এমন কি ছাত্রাবস্থায় যখন অধ্যয়ন অতি অল্পই হইয়াছিল, তখন হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রগাঢ় বিদ্বান্ অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। সেই ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রত্যেক বিচারে প্রভূত যশোলাভ করিতে থাকেন। 'পক্ষতা' পাঠাবস্থায়ই, ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লী হইতে ছয় ক্রোশ পূর্ব্বে, সুবর্ণপুর নামক স্থানে, নবদ্বীপের ৺গোলক নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত পক্ষতার বিচার করেন ও বিচারান্তে সভাস্থ যাবতীয় অধ্যাপকের নিকট অশেষ ধন্যবাদ লাভ করেন। এইরূপ উদাহরণ অনেক আছে। তন্মধ্যে দুই চারিটী অগ্রে প্রকাশ করা হইবে।

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালেই সময়ে সময়ে পিতা ৺সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রয়োজনীয় স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার অধ্যাপক ৺যদুরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছাত্রগণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতি এতই অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় চতুষ্পাঠী করিলে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রায় সমুদয় ছাত্র, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট চলিয়া আসেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এতই স্নেহ করিতেন যে, তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যাপনা দেখিবার জন্য ঐ স্বর্গীয় মহাত্মা প্রায়ই তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আসিয়া বসিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি করিতেন।

বিদ্যাদানের সহিত বিদেশীয় ছাত্রগণকে অন্ন-দান করিবার প্রথা ভট্টপল্লীসমাজে চিরকাল প্রচলিত। ন্যায়রত্ন মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেই, অনেকগুলি বিদেশীয় ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন। এদিকে, ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান এবং তখন নবীন অধ্যাপক। ধনবান্গণের গৃহে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ পত্রাদি পাইতে লাগিলেন, তখন তদ্দ্বারা বহু ছাত্র রাখা চলিতে পারে না। ব্যবসাবাণিজ্য বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিগর্হিত অন্য কোনও রূপ অর্থোপার্জ্জনের উপায়ও তাঁহার ছিল না। যে বংশে তাঁহার জন্ম সে বংশেরও তেজস্বিতা তখন এমনই ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট কিম্বা দেশীয় কোনও নরপতির বেতন ভুক্ হইয়া, তাঁহাদের অধীনে অধ্যাপনা করাও তেজস্বী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তেজস্বিতার পক্ষপাতী একটী পরম তেজস্বী পুরুষ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক থাকায়, তিনি সেই নব্যাবস্থায়ও বহুতর বিদেশীয় ছাত্রকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত

কলেজের তাৎকালিক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ৺জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চাননের প্রমুখাৎ বিদ্যোৎসাহী, পর-গুণ-প্রমোদী ৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-প্রশংসা নিরন্তর শ্রবণ করিয়া, এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিয়া, বিদ্যা-বিস্তার-কল্পে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তিনি একজন প্রধান সহায় হইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় পাঁচ বৎসর কাল মাত্র তাঁহার কৃত ঐরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়া, নিজ ছাত্রবৃন্দের প্রতিপালনে নিজেই সমর্থ হইলেন, এবং তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য লইতে বিরত হইলেন। এই ঘটনায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অপ্রতারকতা, সত্যবাদিতা ও অস্বার্থপরতা অনুভব করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর আরও এত দৃঢ়তর হইল যে, সকল স্থানের সকল অধ্যাপকের অপেক্ষা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তিনি আজীবন পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তদবধি নিজের বা পরিজনের পীড়াদি নিবন্ধন, যে কোনও সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কলিকাতায় দীর্ঘকাল থাকিতে হইয়াছে, চিকিৎসার ব্যয়, বাটীভাড়া, ঐস্থানের সংসার-খরচ, সকলই বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্ব্বাহ করিতেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



শাস্ত্র-জ্ঞান। দর্শন শাস্ত্র সমূহের উদ্দেশ্য। চার্ব্বাক মতের বিশেষত্ব। 'শক্তি' ও 'লক্ষণা'। দর্শন সমূহের মতভেদের হেতু। 'অনুমান' খণ্ডের প্রয়োজন ও সকল দর্শনের সহিত সম্বন্ধ নিরূপণ। দার্শনিক হেতু সমূহের বলাবল পরীক্ষা করিবার উপায়। 'ব্যাপ্তি' 'তর্ক' 'পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান' এবং 'কার্য্যকারণভাব'। নব্যনৈয়ায়িকমত।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদ্যাজীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলোচ্য সামগ্রী তাঁহার বিচার-পাণ্ডিত্য ও মীমাংসা-জ্ঞান। তাঁহার জীবন-চরিত অনুশীলন করিলে জানা যাইবে, অতি নব্যাবস্থা হইতে শাস্ত্রীয় সভায় যে কোনও শাস্ত্রের যে কোনও বিচারে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার অন্তঃ-প্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ মধ্যস্থতা করিয়াছেন, সকল শাস্ত্রের সকল অধ্যাপক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শাস্ত্রীয় মীমাংসা-প্রণালী দর্শনে চীরকাল সমানভাবে মুগ্ধ। ন্যায়শাস্ত্রের 'অনুমান-খণ্ডে' গভীর পাণ্ডিত্যই সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই তীক্ষ্নদর্শিতার মূল হেতু। 'অনুমান-খণ্ডে' গভীর পাণ্ডিত্য এরূপ হেতু হইবার কারণ কি, ইহা অবগত হইতে হইলে, শাস্ত্র সমূহে বিশেষতঃ সমগ্র দর্শনশাস্ত্রে ঐ

অনুমান-খণ্ডের কি পরিমাণ সম্বন্ধ, তাহাই সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ বুঝিতে হইবে।

সদসৎ পদার্থ নির্ণয়ই সকল দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আর্য্যদর্শন-কারেরা নানাবিধ হেতুতর্কাদির দ্বারা সেই সদসৎ পদার্থের নির্ণয় করিয়াছেন, এবং পোষকশ্রুতি সাধক দেখাইয়াছেন। শ্রুতি নানাবিধ। এক শ্রুতি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়, অন্য শ্রুতি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। হেতুতর্কের দ্বারাও নৈয়ায়িক যে পদার্থ সংস্থাপন করিলেন, বৈদান্তিক সেই পদার্থেরই হয়তো অন্য প্রকার হেতু দেখাইয়া খণ্ডন করিলেন। এ কারণ, চার্ব্বাকেরা অনুমান, শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণ্যই স্বীকার করেন নাই। চাক্ষুষ, ঘ্রাণ, রাসন, ত্বাচ, শ্রাবণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীত প্রকৃত পদার্থ সিদ্ধ হইতেই পারে না, ইহা তাহাদের মত। আর্য্যদর্শনকারেরা অনন্ত যুক্তি দ্বারা সে মতের খণ্ডন করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাতেও অনুমানের আবশ্যকতা আছে। যে বস্তুকে নিকটে দীর্ঘাকার দেখা যায়, সেই বস্তুই দূরে গেলে ক্ষুদ্রভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই বস্তু সম্বন্ধে, এমন কি, যাহাদের বৃহদাকার কখনও দর্শন করি নাই, সেই গ্রহতারাদি সম্বন্ধে, বৃহৎ বলিয়া জগতের যে স্থির সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাহার একমাত্র সহায় তর্ক ও অনুমান। তর্ক ও অনুমানের দ্বারা পদার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, নানা উপায়ে আর্য্যদর্শনকারেরা ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, সেই তর্কানুমানের দ্বারা শ্রুতির উপর কেহ কেহ 'নিত্যনির্দ্দোষত্ব' কেহ কেহ 'সর্ব্বজ্ঞোচ্চরিতত্ব' ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং তদনুসারে শ্রুতির প্রামাণ্য উপপন্ন করিয়া লইয়া আবশ্যক-স্থলে পোষক শ্রুতি সাধক দিয়াছেন। তবে, পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিও দৃষ্ট হয়, একথা সত্য বটে। একারণ 'শক্তি' ও 'লক্ষণা'

দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া শ্রুতির মীমাংসা করিতে হয়। 'শক্তি' দ্বারা যে বিষয় সিদ্ধ হয়, 'লক্ষণা' দ্বারা বিরুদ্ধ শ্রুতিকে তাহারই অনুকূল করিয়া লইতে হয়।

'শক্তি' ও 'লক্ষণা' কিরূপ? "রাম গঙ্গাতীরে বাস করিলেন" "রাম গঙ্গাবাস করিলেন" এই দুই বাক্যের দ্বারাই রামের 'গঙ্গাতীরে' বাসই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। পূর্ব্ব বাক্যটীতে "গঙ্গাতীর" উল্লেখ থাকায় প্রকৃত "শক্তির" দ্বারাই 'গঙ্গাতীরে বাস' এই অর্থের বোধ হইতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে মাত্র 'গঙ্গাবাস' উল্লেখ আছে। জলময়ী গঙ্গায় রামের বাস অসম্ভব হওয়ায়, 'লক্ষণার' দ্বারা এই শব্দের 'গঙ্গাতীর' অর্থ করিতে হইবে। "কুম্ভীর গঙ্গাবাস করিতেছে" বলিলে, ঐরূপ 'লক্ষণা' করিতে হইত না। জীবের 'প্রাণ' বায়ু-বিশেষ ইহা আয়ুর্ব্বেদাদির দ্বারা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু শ্রুতি রহিয়াছে 'আয়ুর্ঘৃতং' ইত্যাদি। ঘৃত বায়ু বিশেষ নহে। সুতরাং ঘৃতকে 'আয়ুঃ' বলা যাইতে পারে না। অতএব এরূপ শ্রুতি থাকিলে 'লক্ষণার' দ্বারা 'ঘৃত আয়ুর্ব্বর্দ্ধক' এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বোক্ত সরল স্থল সমূহে কোন্‌টীর শক্যার্থ, কোন্‌টীর লক্ষ্যার্থ করিতে হইবে, তাহা সহজেই সাধারণে বুঝিতে পারেন। কিন্তু নানা-বিষয়িণী অতীন্দ্রিয় শ্রুতির মীমাংসার সময় কোন্‌টীর শক্যার্থ হইবে, কোন্‌টীর লক্ষ্যার্থ হইবে, কিরূপ বা সেই লক্ষণা করিতে হইবে, এ সকল বিষয়ে হেতু দেখাইয়া প্রকৃত অনুমান বড়ই দুরূহ বস্তু।

শ্রুতির কেবল মাত্র এইরূপ শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের অবধারণে গোলযোগ নিবন্ধন দর্শন সমূহের মত-ভেদ নহে। 'প্রকরণ জ্ঞানের' দ্বারা শ্রুতির যথাযথ তাৎপর্য্যাবধারণও অনেক সময় কঠিন হইয়া

পড়ে। 'সৈন্ধব' শব্দে লবণ-বিশেষ ও ঘোটক-বিশেষ বুঝাইয়া থাকে। কোনও সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা কালে 'সৈন্ধবমানয়' বলিলে ঘোটক আনিতে হইবে। কিন্তু ভোজন-কালে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিলে. লবণ আনিতে হইবে। অতএব শব্দের তাৎপর্য্যাবধারণেও অনুমানের আবশ্যকতা। সেই অনুমানের নামই 'প্রকরণ জ্ঞান।' ঋষিবাক্য আছে 'মশূরমুদরে যস্য তস্য দূরতরো হরিঃ।' বিষ্ণু. সর্প প্রভৃতি নানা বিষয় 'হরি' শব্দে বোধ হইয়া থাকে। এই হেতু. ঐ ঋষি-বাক্যের কেহ কেহ অর্থ করেন "মশূর ডাউল ভক্ষণ করিলে বিষ্ণু দূরে যান, অর্থাৎ তাঁহার কৃপা লাভ করা যায় না।" অপর কেহ কেহ অর্থ করেন "মশূর ডাউল ভক্ষণ করিলে সর্পে দংশন করে না।" অত-এব, একটী সামান্য ঋষি-বাক্য লইয়া যখন প্রকৃত তাৎপর্য্য-গ্রহে গোলযোগ দাঁড়াইল. তখন ঘোর জটিল অতীন্দ্রিয়-বোধক শ্রুতির তাৎ-পর্য্যাবধারণ পূর্ব্বক 'ঈশ্বর' 'মুক্তি' প্রভৃতি দুরূহ বিষয় সমূহের অনুমানে যে মতভেদ হইয়া নানা দর্শনের সৃষ্টি হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

এইরূপ নানা কারণে, শ্রুতি ও অনুমানাদির দ্বারা এক দর্শনে যে বিষয় খণ্ডন করিয়াছেন, অন্য দর্শনে শ্রুতি ও অনুমানাদির দ্বারাই তাহার সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি 'তর্ক' সহিত 'ব্যাপ্যহেতু' প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর নামই 'ব্যাপ্যহেতু'। হেতুর সেই ব্যাপ্তি 'তর্কের' দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়।

এই 'ব্যাপ্তি' ও 'তর্ক' কিরূপ? ধূমে বহ্নির 'ব্যাপ্তি' থাকে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে। এইরূপ ব্যাপ্তির নাম 'অন্বয়ব্যাপ্তি'। ধূমে বহ্নির 'ব্যাপ্তি'

অন্যরূপেও স্থির করা যায়। যথা, যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে না; সেখানে সেখানে ধূম থাকেনা। এইরূপ 'ব্যাপ্তির' নাম 'ব্যতিরেক ব্যাপ্তি'। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান হয়। সেই ব্যাপ্তি নিশ্চয় করিবে কিরূপে? সকল ধূমেরই বহ্নি উৎপাদক। বহ্নিহীন প্রদেশে যদি ধূমোৎপত্তি হওয়া সম্ভব পায়, তবে বহ্নি সকল ধূমের উৎপাদক হইতে পারেনা। এই 'তর্কের' দ্বারাই ধূমে বহ্নির 'ব্যাপ্তি' নিশ্চয় হয়। একারণ, ধূম দেখিয়া বহ্নির যে অনুমান, তাহা সদনুমান। কিন্তু বহ্নি দেখিয়া যদি ধূমের অনুমান করা যায়, তাহা সদনুমান নহে। কারণ, অয়োগোলকাদিতে বহ্নি-সত্ত্বেও ধূমোৎপত্তি হয় না। একারণ, এই সকল হেতুকে 'ব্যভি-চারি-হেতু' বলে। 'ব্যভিচারী হেতুর' দ্বারা অর্থাৎ যে হেতুতে ব্যাপ্তি না থাকে সেই হেতু দ্বারা স্থল-বিশেষে পদার্থ-সিদ্ধি হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সকল স্থানে হয় না। একারণ তর্ক ও ব্যাপ্তি-বিরহিত হেতু নির্দ্দেশ করিয়া যে বস্তুর সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহার প্রামাণ্য নাই। 'বহ্নি' বা 'ধূম' দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দেখান হইল মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রের অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে শ্রুতির প্রামাণ্য-সিদ্ধি, তাৎপর্য্যাবধারণ, তাহার শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বিচার, ঈশ্বর-নিরূপণ, মুক্তি-নির্ণয়, মতদ্বৈধ স্থলে 'সদসৎ' নিরূপণ প্রভৃতি যাবতীয় অতীন্দ্রিয় বিষয় 'ব্যাপ্যহেতু' 'তর্কাদির' দ্বারা নির্ণেয়। আবশ্যকীয় তর্কানুসন্ধান করতঃ কিরূপে 'ব্যাপ্যহেতু' নির্ণয় করিয়া অনুমান-বলে পদার্থ সিদ্ধ করিতে হয়, নৈয়ায়িকগণের 'অনুমান খণ্ডে' তাহারই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা।

আবার, কেবলমাত্র ঐরূপ ব্যাপ্যহেতু প্রভৃতির দ্বারাও তুমি সকল স্থানে সকল অনুমান করিতে পার না। যে স্থানে ব্যাপ্য হেতুর সম্বন্ধ থাকে, সেই স্থানেই পদার্থ সিদ্ধ হইবে। পর্ব্বত, চত্বর, রন্ধন-শালা

প্রভৃতি যে সকল স্থানে ধূমের বিশেষ সম্বন্ধ তুমি দেখিবে, সেই স্থানেই তোমাকে বহ্নির অনুমান করিতে হইবে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য বলিয়া জলাশয়ে তুমি বহ্নির অনুমান করিতে পার না। হেতু ও সাধনীয় সামগ্রীর এইরূপ বিশেষ স্থলের নৈয়ায়িকেরা 'পক্ষ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এবং সেই পক্ষে হেতুর সম্বন্ধ জ্ঞানের নাম 'পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান।' 'ধূমের বিশেষ সম্বন্ধ পর্ব্বতে রহিয়াছে' এই 'হেতু' দৃষ্টে যে অনুমান হইবে তাহার আকার 'পর্ব্বতে বহ্নি আছে।'

পূর্ব্বোক্ত 'জলাশয়' দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখান হইল মাত্র। জলাশয়াদিতে বহ্নি বা ধূমের সম্বন্ধ নাই, তাহা সকলেরই স্থির আছে। কিন্তু যাহার বিষয় কিছুমাত্র জানা নাই, যাহা সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয়, সেরূপ 'পক্ষে' সেইরূপ কোনও অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় বিষয় স্থির করিবার জন্য, যখন সেইরূপ কোনও অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় হেতু প্রদর্শন করান হয়, তৎকালে পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে। তুমি যে বিষয় সিদ্ধ করিবার জন্য যে হেতু দেখাইলে, সেই হেতুর দ্বারা হয়তো সে বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু যে স্থলে সিদ্ধ করিয়াছ, সে স্থলে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। মনে কর, বেদ-রূপ পক্ষের উপর তোমার সাধনীয় সামগ্রী 'প্রামাণ্য'। হেতু দেখাইতেছ "সর্ব্বজ্ঞ-মহাপুরুষোচ্চরিতত্ব" "নিত্য নির্দ্দোষত্ব" প্রভৃতি। হইতে পারে, তুমি যে হেতু দেখাইলে, তদ্দ্বারা "প্রামাণ্য" সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই হেতু পক্ষবৃত্তি না হইলে বেদের উপর তুমি প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে পার না। বেদের উপর তোমার 'ব্যাপ্য হেতু' বিদ্যমান, ইহাও তোমাকে সপ্রমাণ করিতে হইবে। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল। বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানও বড় সহজ ব্যাপার নহে। সদনুমানের উপায় এই 'পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানেরও' সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান সকল, নৈয়ায়িকগণের

'অনুমানখণ্ডেই' প্রদর্শিত হইয়াছে। তুমি নানা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতে পার, নানা দর্শনের বিভিন্ন মতামত অবগত থাকিতে পার, দর্শনকারেরা কীদৃশ হেতুর দ্বারা সে সকল স্থির করিয়াছেন তাহাও সুষ্ঠুরূপে জ্ঞাত থাকিতে পার, কিন্তু সেই সকল হেতু দর্শনকারগণের সিদ্ধান্তের কি পরিমাণ উপযোগী, কতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের বলাবল, যে স্থানে যাহা সিদ্ধ করিয়াছেন সে স্থানে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে কি না, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকারিগণের হেতু ও সিদ্ধান্ত কোন্ অংশে দুষ্ট, হেতুর 'ব্যাপ্তি' 'তর্ক' 'পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান' প্রভৃতি ব্যতীত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে তাহার বিচার করিতে পারিবে না। দর্শনশাস্ত্র-রূপ কাব্যের ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দঃ অনুমান খণ্ড। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ না জানিয়া কাব্য আলোচনা করিলে, কাব্যের অনেক কবিতা উৎকৃষ্ট বলিয়া তোমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু যদি ঐসকল বিষয়ের অনুশীলন করিয়া সেই কবিতা গুলি পুনরায় কখনও দৃষ্টি কর, তখন বুঝিবে সুন্দর কবিতার কোন' কোন'টীতে হয়তো ব্যাকরণ-ভুল, অলঙ্কার-দোষ ও ছন্দঃপাত হইয়াছে। অতি অসার বস্তুর উপর চাকৃচিক্য ভাসিতেছে। তোমার বোধগম্য লৌকিক-যুক্তির দ্বারা তোমার নিকট অনেক সিদ্ধান্তই মধুর লাগিতে পারে। যে শঙ্খকে আমরা সকলে শ্বেত দেখিতেছি, বিকারাবস্থায় তাহা হরিদ্রাভ দেখায়। শঙ্খ প্রকৃতই শ্বেত কি হরিদ্রাভ ? বিকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা বিকৃত, প্রকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা প্রকৃত, এই স্থূল লৌকিক হেতুর দ্বারা তুমি শঙ্খকে শ্বেত বলিয়া স্থির করিতে পার। কিন্তু সূক্ষ্ম তর্কে এই হেতু অব্যভিচারী বা ব্যাপ্য হেতু নহে। কারণ পীড়াদি উপস্থিত হইলে অনেক সময় বিবেক উপস্থিত হয়। 'বিবেক' কি জীবের বিকৃত গুণ? যদি তোমার পূর্ব্বোক্ত হেতু অব্যভিচারী

হেতু হয়, তবে বিবেককেও জীবের বিকৃত গুণ বলিয়া ঐ হেতুর দ্বারাই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যায়। অতএব তোমার হেতুকে আরও তর্কের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, অথবা হেত্বন্তর দেখাইয়া শঙ্খের শ্বেতবর্ণ সিদ্ধ করিতে হইবে। বিকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা বিকৃত, প্রকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা প্রকৃত, এ বিষয়ের তুমি দুই চারি সহস্র দৃষ্টান্ত বা সহচার দেখাইতে পার সত্য। কিন্তু বহু সহচার দর্শন করাইলেই যে পদার্থ সিদ্ধ হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। হয়তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আর আর সকল বস্তুতে তোমার নিয়ম খাটিয়া যাইবে, কেবল মাত্র তুমি যেটী সিদ্ধ করিতেছ, সেইটীতেই তোমার নিয়ম খাটিবে না। শাস্ত্রে যাহাকে যাহাকে 'ক্ষিতি' বলা হইয়াছে, সে সকলের উপরই লৌহ-অস্ত্রের দাগ পড়িতে পারে, কেবল হীরকাদির উপরই পারে না। হীরকাদিকেও 'ক্ষিতি' পদার্থের মধ্যে পরিগণনা করা হইয়াছে। হীরকাদির উপর লৌহ অস্ত্রের দাগ পড়িতে পারে, ক্ষিতিত্বের সম্বন্ধ দেখাইয়া তুমি ইহা স্থির করাইতে পার না। যতই অন্বেষণ করিবে এ বিষয়ের সহচার মিলিবে সত্য, কিন্তু তোমার অভিলষিত স্থলেই কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিয়া যাইবে। সহচারাদি দেখাইয়া তোমার চক্ষে অনেকে অনেক সিদ্ধান্ত মধুর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ তর্কানুসন্ধান-প্রক্রিয়া না জানিয়া কোনও সিদ্ধান্তে, বিশেষতঃ ধর্ম্মসিদ্ধান্তে, নির্ভর করিতে নাই। কারণ শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে "যস্তর্কেণাভি সন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।"

এইরূপ অনুমানোপায় এবং তদ্‌ঘটিত আবশ্যকীয় ব্যাপ্তি, তর্ক, পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান প্রভৃতি ব্যতীত অনুমানখণ্ডের 'কার্য্যকারণভাব'

সকল দর্শনের আর একটী সাধারণ-সামগ্রী। যত দর্শন আছে, সকল দর্শনেই 'জন্য' ও 'নিত্য' ভেদে দুই প্রকার পদার্থ কল্পিত হইয়াছে। 'জন্য' ও নিত্য' পদার্থের নির্ব্বাচনে সকল দর্শনেরই মত-ভেদ আছে। জন্য পদার্থকে নৈয়ায়িকেরা 'কার্য্য' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। জন্য পদার্থ বা কার্য্য মাত্রেরই 'জনক' বা 'কারণ' দেখাইতে হয়। কোন্ সময়ে কিরূপ 'কারণ' কোন্ স্থলে থাকিলে কোন্ 'কার্য্য' বা জন্য পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সঙ্গত হয়, নৈয়ায়িকগণের 'কার্য্য কারণ ভাবে' তাহারই বিচার। ইহাও অবশ্য অনুমানেরই অঙ্গ। কোন্ দর্শনকার কোন্ 'জন্য পদার্থ' কি ভাবের 'কারণ' নির্দ্দেশ করিয়া নির্ণয় করিলেন, সে 'কারণ' সত্ত্বে সেরূপ কার্য্যোৎপত্তি হওয়া সঙ্গত অথবা তাহাকে 'নিত্য' পদার্থের মধ্যে পরিগণনা করিতে হইবে, যাহাকে 'নিত্য' বলা হইয়াছে তাহার উৎপাদক কারণ প্রকৃতই নাই অথবা সে পদার্থকে জন্যের মধ্যে পরিগণনা করাই কর্ত্তব্য, কার্য্যকারণ-ভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত ইহা নিরূপণের উপায় নাই। এই হেতু নৈয়ায়িকগণের 'অনুমান খণ্ড' শাস্ত্র সমূহে, বিশেষতঃ সমগ্র দর্শন-শাস্ত্রে, অদ্বিতীয় উপযোগী। মিথিলা, বঙ্গদেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িক-সমাজে অদ্যাবধি যত তীক্ষ্ণধী বিখ্যাত নৈয়ায়িক জন্মিয়াছেন, সকলেই 'অনুমান খণ্ডে' আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সুবিধা এই হয় যে, যে শাস্ত্রের যে বিষয় লইয়াই বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত হয়, অনুমান-ঘটিত নানা রূপ পথ জানা থাকায় তাঁহারা বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের অনুমান সহজেই ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে শুধু বিরুদ্ধবাদিগণকে নিরস্ত করিবার জন্য তর্কানুসন্ধান ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বিরুদ্ধ চেষ্টা হইতে আর্য্যশাস্ত্র সমূহকে চিরকাল তর্ক-শাস্ত্রই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

ন্যায়-দর্শন বেদাঙ্গ সামগ্রী। এই বেদাঙ্গ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গৌতম, কণাদ ইহার প্রথম পরিপাটী পৃথক্‌রূপে করিয়া যান। পরে সেই সকল গ্রন্থ হইতে 'প্রত্যক্ষ' 'অনুমান' 'উপমান' 'শব্দ' এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মিথিলার গঙ্গেশোপাধ্যায় নিজকৃত 'চিন্তামণি' গ্রন্থে অনেক সূক্ষ্ম সন্ধান লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাহা নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত, অপরের নিকট প্রকাশ করিতেন না। নবদ্বীপের বাসুদেবসার্ব্বভৌম মিথিলায় গিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সম্প্রদায়ের নিকট দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করতঃ, নানা কৌশলে ঐ 'চিন্তা-মণি-গ্রন্থ' এবং অন্যান্য অনেক গূঢ় শাস্ত্রীয় সন্ধান বঙ্গদেশে লইয়া আসেন। পরে রঘুনাথশিরোমণি বাসুদেবসার্ব্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করতঃ সেই সকল সন্ধান জ্ঞাত হইয়া, এবং অধ্যয়নের শেষাবস্থায় মিথিলাদেশে গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকট কিছুকাল থাকিয়া, 'চিন্তামণি' গ্রন্থের 'দীধিতি' নামে একখানি টীকা করেন। তাহাতেও অনুমান-ঘটিত নানা গূঢ় উপদেশ সাধারণে প্রকাশ পায়। তৎপরে মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'দীধিতির' সামগ্রী সমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবলম্বন করতঃ প্রত্যেক সামগ্রীর অতি বিস্তৃত বিস্তৃত টীকা করিয়া অনুমান-ঘটিত বিপুল উপদেশ লিপিবদ্ধ করতঃ রাশি রাশি পুস্তক প্রণয়ন করেন। মথুরানাথ 'দীধিতি' ব্যতীত 'চিন্তামণিরও' টীকা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত চিন্তামণির টীকাই প্রচলিত; দীধিতির টীকা প্রচলিত নাই। এইরূপে ক্রমশঃ বঙ্গদেশই অনুমানখণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ রূপে পরিগণিত হইল। যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক এক্ষণে আলোচিত হইয়া থাকে, তাঁহাদেরই পরিচয় প্রদান করা হইল। ইহাঁদের পরে অনুমানখণ্ডের আর যে সকল আচার্য্য জন্মিয়াছেন,

এই সকল গ্রন্থের টীকাটীপ্পনী প্রকাশ্যভাবে তাঁহারা করেন নাই। আপনাদের চিন্তালব্ধ সামগ্রী সাধারণকে জানিতেও দেন নাই। অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা নিজ সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করিবার জন্য আপনাদের চিন্তালব্ধ ও গুরুপরম্পরায় উপদেশ-লব্ধ পদার্থ সকল আত্মছাত্র পরম্পরায়ই অনুশীলন করাইয়াছেন, এবং সভাক্ষেত্রে নানা সমাজের নৈয়ায়িকগণ সমবেত হইলে, সেই সকল নূতন নূতন কথা উত্থাপন করতঃ পরস্পরে বিচারাদি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। এইরূপে সভার বিচারে বিচারেও নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুশীলিত অনুমানখণ্ডের বহু সূক্ষ্ম-সন্ধান, নানা আশঙ্কা, বিবিধ মীমাংসা, নৈয়ায়িক-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে অনুমানখণ্ডের সাহায্যে সকল শাস্ত্রের উপরই আবশ্যকীয় বিতর্ক-বুদ্ধি উদ্ভূত হওয়ায়, ভারতীয় বিদ্বৎসমাজে নৈয়ায়িকগণেরই প্রাধান্য বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং সকল শাস্ত্রের বিচারেই প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকগণ চিরদিন মধ্যস্থতা করিয়া অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনুমান-ঘটিত পথ সকল লইয়া বিতর্ক উত্থাপন করতঃ নৈয়ায়িক-গণের মধ্যে আপনাদের পরস্পরে যে সকল বিচার হয়, তাহা একান্ত দুর্ব্বোধ। তীক্ষ্ণধী নৈয়ায়িক ব্যতীত কোন' শাস্ত্রের কোন' অধ্যাপকেরই তাহার ক্ষুদ্রাংশেরও মর্ম্মগ্রহ হইবার উপায় থাকে না। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের সে বিচারে রসানুভব করিবার উপায় নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান্ নৈয়ায়িকগণকে সেই রস সকল শাস্ত্রের সকল রস অপেক্ষা মুগ্ধ করিয়া থাকে, এবং তাহা কত অমূল্য ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

काव्यादावपि कोमले सति महाकाठिन्य दोषान्विते
किं स्याद् युष्मदनादरः सहृदयास्तर्केऽक्षपादोदिते।
सर्व्वस्याहृदयङ्गमेऽपि हृदये लिप्ते नृपश्चन्दने
हारं मारकतं शिलामयमपि प्रीत्या न किं धारयेत् ॥

ভাবার্থ। অতি কোমল অর্থাৎ সুখবোধ্য কাব্যাদি নানা বিষয় আছে। তর্ক-শাস্ত্র সেরূপ নহে সত্য। ইহা মহাকাঠিন্য-দোষে দুষ্ট, এবং সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই বলিয়া কি, হে বুদ্ধিমন্-গণ, তোমরা ইহাকে অনাদর করিতে পার? হৃদয়ে ধারণ করা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই বলিয়া নৃপতি কি সুপ্রাপ্য-চন্দনানুলিপ্ত বক্ষঃস্থলে সুকঠিন মরকত শিলার হার ধারণ করেন না?

ন্যায়রত্ন মহাশয় কোন' বিষয়েরই নিন্দা করিলেন না। কারণ চন্দন সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী। কেবল মূল্য বিবেচনায় চন্দনে ও মরকত হারে যেরূপ পার্থক্য, অন্যান্য শাস্ত্র সহ তুলনায়, ন্যায়শাস্ত্রে সেইরূপ পার্থক্য করিলেন। চন্দন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হয়, কিন্তু মরকত হার সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পায় না; কেবল নৃপতিগণেরই হৃদ্গত হইয়া তাঁহাদেরই মাত্র প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবন-চরিত অন্বেষণ করিলে জানা যাইবে, তিনি সকল শাস্ত্রের রসাস্বাদনে সমর্থ। কাব্য-রসে অসামান্য রসিক। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের তুল্য কিছুই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। শুধু ন্যায়রত্ন মহাশয় নহেন। ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ডের পূর্ণ রসানুভব করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অপেক্ষা কেহ কস্মিন্ কালে শাস্ত্রান্তরের পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহা আমরা এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। তবে পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান-খণ্ড এতই দুর্ব্বোধ্য যে, ইহার রসাস্বাদে অসমর্থ হইয়া কাহারও কাহারও পক্ষে ইহাকে নীরস বলিয়া অনুভব করা অসম্ভব নহে। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলি, সকল শাস্ত্রের রস আস্বাদন করিয়া তাঁহারা যদি এই অনুমানখণ্ডেরও অন্ততঃ কিয়দংশ বুঝিবার শক্তি লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তুল্য অনুমান-খণ্ডেরই সমধিক পক্ষপাতী হইতেন। এ সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি এই—

शैत्य-माधुर्य्य-वैधुर्य्य-दोषश्चेदवधार्य्यते ।
नावगाह्य नचास्वाद्य तरङ्गिण्यास्तु तेन किं ॥

অর্থাৎ, তুমি অবগাহন না করিয়া যদি নদীর জল শৈত্যহীন বিবেচনা কর, আস্বাদন না করিয়া যদি কটু বিবেচনা কর, তাহাতে তরঙ্গিণীর কিছু আসে যায় না।

ন্যায়শাস্ত্রে কি প্রগাঢ় অনুরাগ ও রসানুভবেরই ব্যঞ্জক এই সকল কবিতা!!

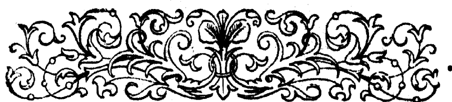
অনুমানখণ্ডের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কবিতা দুইটী কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রচিত হয়। পরে ঐ ভাবই রক্ষা করিয়া স্বরচিত 'তত্ত্বসার' নামক গ্রন্থে দুইটী কবিতা ন্যায়রত্ন মহাশয় সন্নিবেশিত করেন। নৈয়ায়িকগণ 'জীবাত্মা' ও 'মনঃ' পৃথক্ বলেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে 'অন্তঃকরণকেই' সুখদুঃখাদির আশ্রয় বলিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও অতিরিক্ত 'জীবাত্মা' স্বীকার না করিয়া 'মনেই' ঐ সকল প্রতিপন্ন করতঃ 'মনেরেই' 'জীব' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের অনুমানে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক স্বীয় অনুমানের সামগ্রী সমূহ উক্ত

'তত্ত্বসারঃ' গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং শ্রুতি ও অন্যান্য দর্শন সাধক দেখাইয়া তাহাকে 'নব্যনৈয়ায়িকমত' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল অনুমানের সামগ্রী ও আনুসঙ্গিক আপত্তি, উপপত্তি প্রভৃতি এস্থানে উদ্ধার করিয়া দেখান অসম্ভব। কারণ, সেই সমুদয়ের দ্বারা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ গঠিত হইয়াছে। তবে, নব্যনৈয়ায়িকমতে কোন্ কোন্ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, নৈয়ায়িকগণের প্রচলিত প্রাচীন মত হইতে তাহা কোন্ কোন্ অংশে বিভিন্ন, ইহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে কতিপয় সিদ্ধান্ত-কারিকা মাত্র প্রদর্শিত হইল। 'জীবাত্মা' ও 'মনে' ঐক্য সংস্থাপনে নৈয়ায়িকের এই সর্ব্ব-প্রথম উদ্যম। 'পরমাণু' 'বিশেষ' প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল পদার্থ অস্বীকৃত হইয়াছে, এবং অন্য প্রকার নবীন পদার্থ যাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৈয়ায়িক আচার্য্য-গণের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা করিয়া গিয়াছেন।

मनसामेव चैतन्यं तत्रैवेच्छादिकागुणा: ।
अहं प्रतीति स्तत्रैव न तु जीवान्तरस्थिति: ॥
अनन्तजीव संयोग वियोगादेरपेक्षया ।
महत्त्वजन्ये युक्तैव वाह्याध्यक्षे विजातिता ॥
योगिविश्वविदध्यक्षे महत्त्वाजन्यतामये ।
गुरुधर्म्मेण तद्जत्व स्वीकृतपक्षेऽति गौरवं ॥
त्रुटौ द्रव्यस्य विश्रामात् द्व्यणुकादेरलीकता ।
प्रत्यक्षे षड्विधे तस्मात् परिमाणं न कारणं॥
द्रव्यत्वञ्च गुणत्वञ्च क्रियात्वं समवायता ।
अखण्डोपाधिजातित्वं धर्म्मा भावविभाजका: ॥

दृष्टा प्रकारतात्वाद्यमखण्डोपाधिराहृत: ।
विशेषा निद्रिता: सन्तु सार्द्धं व्योमाज सौरभै: ॥
भूर्वारितेज: पवन: परमात्मा तथा मन: ।
द्रव्याणि षड्विधान्येव जीवादिर्नेतरस्तत: ॥
उपमाबोधजं मानं श्रुत्यादिषु न दृश्यते ।
अतोप्यस्यास्तु करणे मन्यतामनुमानता ॥





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।



সভাস্থলে নানা সমাজের বিদ্বদ্‌বান্ধবগণ সহ
শাস্ত্রীয় আমোদ প্রমোদ। স্বীয় সম্প্র-
দায় সৃজন। 'মহামহোপাধ্যায়'
উপাধি লাভ। সজাতীয়
সম্প্রদায়ের উপর
আবাল্য প্রাধান্য
নিদর্শন।

ক্রীড়াচতুরে ক্রীড়াচতুরে সম্মিলন ঘটিলে, ক্রীড়া-কৌতুকের দ্বারা পরস্পরে অপার আনন্দ উপভোগ করেন। প্রকৃত বীর, সমকক্ষ বীরের সহিত উল্লাস সহকারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। যিনি যে বিষয়েরই ব্যসনে মত্ত, তিনি সেই বিষয়ের উপযুক্ত ব্যসনী পাইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্ব স্ব ব্যসন-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। শাস্ত্রচর্চ্চাই যাঁহাদের ব্যসন, তাঁহাদেরও পরস্পরে একটী আনন্দ-ক্রীড়া আছে। সভাস্থলে নানা সমাজ হইতে যখন সুহৃদ্‌গণ উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা এই ক্রীড়ায় মত্ত হন। সেই সময় চতুরে চতুরে শাস্ত্রীয় চাতুরি-পরীক্ষার আদান-প্রদানে অপার আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। পূর্ব্বে, ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের একটী দল ছিল। তাঁহারা সভা-স্থলে পরস্পর সমবেত হইলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মব্যসনে মত্ত

হইতেন। দলের মধ্যে কেহ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেন, কাহাকে কাহাকেও মধ্যস্থ রাখা হইত, কেহ উত্তরবাদী হইতেন। এখনও ঐ প্রকারে সভাস্থলে অধ্যাপকগণের আনন্দ উপভোগ করিবার নিয়ম থাকিলেও, পূর্ব্বে এই আনন্দ অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। এই ক্রীড়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নৈপুণ্য এতই ছিল যে, তাঁহার প্রধান প্রধান বন্ধুগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কখন' পশ্চাৎপদ করিতে পারেন নাই। বিচার কালে অশেষ প্রকারে তিনি বন্ধুগণ সহ কৌতুক করিতেন। কখনও বা পূর্ব্বপক্ষ শুনিবামাত্র উত্তর করিতেন। কখনও বা পূর্ব্বপক্ষ সাজাইবার কালেই এমন বিচার-পথ অবলম্বন করিতেন যে, তাহা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া মধ্যস্থগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃতই হইত না। এইরূপ শাস্ত্রীয় ক্রীড়া-কৌতুকের সময় বয়স্যে বয়স্যে অনেক রহস্যও চলিত। একদা যশোহর জেলায় লক্ষ্মীপাশা নামক স্থানে কোনও সভায়, শিরোমণিকৃত 'পদার্থখণ্ডন' নামক গ্রন্থের বিচারে, ন্যায়রত্ন মহাশয়, পূর্ব্বপক্ষ সাজাইবার কালেই একটী প্রধান বন্ধুকে এইভাবে নিরাস করিলে পর, বিক্রমপুর-নিবাসী মধ্যস্থ ৺সারদা চরণ তর্কপঞ্চানন রহস্য পূর্ব্বক বলিলেন "বিচক্ষণ অধ্যাপকের নিকট পূর্ব্বপক্ষ করিতে গিয়া, পূর্ব্বপক্ষ না সাজাইতে সাজাইতে অল্পপাঠী ছাত্র যেমন নিরস্ত হয়, আপনার ন্যায় প্রবল অধ্যাপকও সেইরূপই হইল?"

একবার পুঁটীয়ার রাণী মনোমোহিনী দেবীর বাটীতে দূরদেশীয় কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতসম্প্রদায় সভা উপলক্ষে গমন করিয়া, 'সামান্য লক্ষণা' গ্রন্থের তন্তুপট-কার্য্যকারণ-ভাব বিচার প্রকরণে দুরূহ সমস্যা উত্থাপন করতঃ চারি দিবস কাল তাহার আলোচনা করিয়া রাখেন। সভাদিনে ন্যায়রত্নমহাশয় ক্লান্ত হইয়া, ঘর্ম্মাক্ত শরীরে সভা-প্রবেশ

করিবা মাত্র, সেই অবস্থায় তাঁহার নিকট ঐ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মীমাংসা করিলেন যে, মুর্শিদাবাদ-নিবাসী মধ্যস্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি সভাক্ষেত্রে বলিলেন "চারি দিবস সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে আলোচনা করিয়া রাখিয়া এই ফল হইল?"

একবার কলিকাতা কাশীপুরে জমীদার ৺প্রাণনাথ চৌধুরির শ্রাদ্ধ-কালে কোনও সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট 'সৎপ্রতিপক্ষ' গ্রন্থের এক জটিল পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হয়। সেই পূর্ব্বপক্ষের সদুত্তর হইবেনা, ইহা বিবেচনা করিয়া বহুতর পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অপ্রতিভ করিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুরতা কাহারও অপেক্ষা কম নহে। তিনি বন্ধুগণের মধ্যে এক নূতন রহস্য করিলেন। সভা-ক্ষেত্রে বলিলেন "আমার নিকট যে জিজ্ঞাস্য উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার সদুত্তর আমি নিশ্চয়ই করিব। কিন্তু অগ্রে সভা মধ্যে, মধ্যস্থগণের নিকট আমি প্রমাণ করিতে চাই যে, আমি ভিন্ন অন্য কোনও পণ্ডিতই ইহার সদুত্তর করিতে সমর্থ নহেন।" এই বলিয়া ঐ পূর্ব্বপক্ষটীর আলোচনা দ্বারা, সকল সম্প্রদায়কে নিরুত্তর করিয়া, শেষে নিজে উহার সদুত্তর করেন ও মধ্যস্থগণ কর্ত্তৃক সেই উত্তর পরিগৃহীত হয়।

একবার ঘলবলিয়া নামক স্থানে কোনও ক্ষুদ্র-সভায় নিকটবর্ত্তী স্থানের অল্পসংখ্যকমাত্র অধ্যাপক আহূত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট 'প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদের' 'সাধুঃপাকঃ' ইহার বিচার-ঘটিত এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর করিলেন। কিন্তু অন্য কোনও সময়, কলিকাতা খিদিরপুরে একটী

বৃহৎ সভায় নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান অধ্যাপক যখন সমবেত হইলেন, ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম সেই পূর্ব্বপক্ষ সেখানে উত্থাপন করাইয়া দেখিলেন তাঁহাদের কেহই কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। গুপ্তিপাড়ার ৺ গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন সে বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন।

একবার পূর্ব্ববঙ্গে 'স্থল' নামক গ্রামে তত্রত্য ভূম্যধিকারীর গৃহে এক সভায় মিথিলা-দেশের বিচক্ষণ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺ বিশ্বনাথ ওঝা মহাশয়ের নিকট বঙ্গদেশীয় কোন' প্রসিদ্ধ বিদ্বৎ-সম্প্রদায় এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করেন। বঙ্গদেশীয় বহুতর প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকের প্রতিকূল-তর্ক সত্ত্বেও ওঝা মহাশয় শাস্ত্রার্থের সদুত্তর করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই অবস্থায় রহস্য দেখিবার জন্য গ্রন্থের চিরপ্রচলিত অর্থে দোষারোপ করতঃ একটী নবীন-ব্যাখ্যা সহসা এমনই সঙ্গত-ভাবে বিদ্বন্মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সেরূপ ব্যাখ্যায় পূর্ব্বপক্ষের আর উদ্ধার হইল না। সভা-ক্ষেত্রে সকল নৈয়ায়িক স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। উত্তরবাদী ওঝা মহাশয়ও সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক মানসিক উত্তেজনায় বলিয়া উঠিলেন "আপ্ বৃহস্পতি হ্যায়্।"

এইরূপে সর্ব্বদা অলৌকিক শাস্ত্রীয়-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় বয়স্যগণের একান্ত অনুরাগ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ কেহ তাঁহাকে কখনও পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না। হয় পূর্ব্ববাদী, নাহয় উত্তরবাদী, নাহয় মধ্যস্থ, এই তিন পক্ষের কোনও পক্ষে অবস্থান করতঃ, ছাত্রাবস্থা হইতে প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শত শত বিচার-সভায়, যিনি তার্কিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন তাঁহার বিদ্যাবত্তা

দুই চারিটী উদাহরণ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের বাক্যাবলী ভাষায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কাযেই ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের এই সকল বিচার-কাহিনী জ্ঞাত হওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। ইঁহাদের এই সকল বিচারের বৃত্তান্ত নানাস্থানের নৈয়ায়িকেরা জ্ঞাত আছেন। যে সকল পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রচলিত নাই, টীকাকার, পত্রিকাকার যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই, সেই সকল নূতন নূতন বিষয় বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত করিয়া তাহার সুমীমাংসা করিতে এবং বহু প্রচলিত মীমাংসার দোষোদ্ভাবন করতঃ সুষ্ঠুতর রূপে তাহার সমাধান করিতে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অসীম ক্ষমতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ন্যায়শাস্ত্রের কথা ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। এই সকল লৌকিক বর্ণনার দ্বারা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিচার-পাণ্ডিত্যের কিয়দংশও কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বন্ধুবান্ধবেরা এক এক সময় প্রচলিত গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অপ্রচলিত গ্রন্থের দুরূহ স্থল সকল অন্বেষণ করিয়া রাখিতেন, এবং সভাস্থলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট তাহা উত্থাপন করিতেন। নব্যাবস্থায় এক প্রবল সভায় মথুরানাথ-কৃত 'গুণ-গ্রন্থের' 'বিশেষগুণের' লক্ষণে দুঃসমাধেয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, কতিপয় বয়স্য এক প্রান্ত হইতে শ্লেষ-বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "ইহার উত্তর করা রাখালের কার্য্য নহে।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উত্তর মধ্যস্থগণ কর্ত্তৃক সদুত্তর বলিয়া স্বীকৃত হইলে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ও বলিলেন "আজ হইতে মনে রাখিবেন, আপনাদের মাথা নাড়া নিবৃত্তি করা, রাখালের যষ্টিরই কার্য্য।" ক্রীড়া-কৌতুকের ঘাত-প্রতিঘাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এরূপ রহস্য শুধু আনন্দেরই মাত্র অঙ্গ নহে, উত্তরোত্তর উত্তেজনারও উদ্দীপক। নবদ্বীপের ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, কুড়ুকদিহির ৺রামধন তর্কপঞ্চানন, বিল্বপুষ্করিণীর ৺প্রসন্ন চন্দ্র

ন্যায়রত্ন, বর্দ্ধমানের ৺ ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন, কোন্নগরের ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, গুপ্তিপাড়ার ৺ গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, বিক্রমপুরের ৺সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, দ্বারবঙ্গের ৺ বিশ্বনাথ ওঝা, মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতি নানা সমাজস্থ প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকগণ মিলিত হইয়া বৃহৎ সভা হইলে প্রায়ই ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের এইরূপ আনন্দ-ক্রীড়া চলিত।

পূর্ব্বে, বিদ্বৎসঙ্কুল সভা-ক্ষেত্রই পাণ্ডিত্য প্রচারের একমাত্র স্থল ছিল। সুতরাং ক্ষুদ্র ছাত্র হইতে সম্মানী অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন-মরণ সভাক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিত। এখন সভার বিচারে পণ্ডিতগণেরও তাদৃশ আগ্রহ নাই, বিষয়িলোকের মধ্যেও কোন' কোন' অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রীয় তর্ককে অসার কোলাহল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্বে, প্রত্যেক পণ্ডিতের চিত্তে বিচার সময়ে কি ঘোর উৎসাহ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইত, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা সহজে অনুভব করা যায়।

কোনও একটী সমাজের জনৈক অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রের হেত্বাভাস বিভাগে এতই শ্রম করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদাই গর্ব্ব রাখিতেন হেত্বাভাসের কোনও পদার্থ তাঁহার চিন্তার অবিষয়ীভূত হইতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয় পঠদ্দশায় যখন সভায় পূর্ব্বপক্ষ করিতেন, তখন তাঁহার সর্ব্বদা মনে হইত, ঐ মনীষীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি হেত্বাভাসেরই বিচার করিবেন। পরে উলোর অসামান্য-বিদ্যোৎসাহী ৺ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে স্নান-যাত্রার পর্ব্বোপলক্ষে উক্ত সুধী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় হেত্বাভাসের 'সব্যভিচার' গ্রন্থের পূর্ব্বপক্ষ করেন। তখন সব্যভিচার গ্রন্থ পর্য্যন্তই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাঠ হইয়াছিল। প্রথম

দিন বিচারে ঐ পূর্ব্বপক্ষের কোনও উত্তর না হওয়ায়, উক্ত অধ্যাপক চিন্তা করিবার জন্ম একদিন সময় গ্রহণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বিচারেও কোনরূপ সদুত্তর না হওয়ায়, উক্ত গুণগ্রাহী মহোদয় সর্ব্ব-সমক্ষে বলিলেন "আমি ঠেকিলাম।" পরে দেশে গিয়া বলিতে লাগিলেন "আমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। আমি ভাটপাড়ার একটী অল্পপাঠি-ছাত্রের নিকট হেত্বাভাসে ঠেকিয়া আসিয়াছি।" তাঁহার এই বাক্যে একদিকে যেমন বিদ্বৎ-হৃদয়ের লোকোত্তর গুণগ্রাহিতা প্রকাশ পাইতেছে, অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও সম্মানী ব্যক্তির জীবনান্ত করিয়া থাকে, অন্যদিকে অক্ষরে অক্ষরে মর্ম্মভেদি ভাষায় ইহা ব্যক্ত হইতেছে। সভাক্ষেত্রে একটী পূর্ব্বপক্ষের সদুত্তর করিতে না পারিয়া, পরাভব-বাণী নিজ মুখে সর্ব্ব-সমক্ষে ঘোষণা করেন, এরূপ মহাত্মা যদি কেহ জন্মিয়া থাকেন, তবে উক্ত মহাপুরুষই বুঝি জন্মিয়াছিলেন। কোনও দেবতা বোধ হয় পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন 'জীবনে তুমি যখন প্রথম লজ্জা পাইবে, তখনই তোমার আয়ুঃশেষ বুঝিবে।' ঐ শিষ্ট-ব্যক্তির বাক্য এতই সত্য হইল যে, সম্বৎসর না যাইতে যাইতে, পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রধান বিদ্বৎ-সমাজ শূন্য করিয়া তিনি স্বর্গ গমন করিলেন। প্রকৃতই, আয়ুঃশেষ হওয়ায় ঐ সজ্জন স্বর্গ গমন করেন ইহার সহিত লৌকিক কোনও ঘটনারই যোগ নাই। তথাপি উক্ত অধ্যাপকের কথায় ও কার্য্যে এমনই ঐক্য হইয়া গেল যে, শুনিবামাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে। যৎকালে শাস্ত্রীয় সভা সমূহ ঈদৃশ সুধীগণের এতাদৃশ উত্তেজনা-ভূমি ছিল, প্রাধান্য লাভার্থ তৎকালে যাঁহাদিগকে, সর্ব্বদা বিচার করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের প্রাধান্য, প্রকৃতই প্রাধান্য।

একদিকে, এইরূপে প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে, ছাত্রোপছাত্রগণের অধ্যাপন অধ্যাপনাদির দ্বারা, বঙ্গদেশের নানা স্থান ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায়ে পূর্ণ হইতে লাগিল। ভাটপাড়ার এক্ষণে যত নৈয়ায়িক আছেন অবচ্ছেদাবচ্ছেদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায়, অর্থাৎ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্র। এইরূপে শুধু ন্যায়রত্ন মহাশয় নহে, তাঁহার সম্প্রদায়ও নানা স্থানে বিদ্যা বিস্তার করিয়া নানারূপ কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যাপনাবস্থায় দাম্ভিক বলিয়া তৎকালের বিদ্বৎসমাজে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কিঞ্চিৎ দুর্নাম প্রকাশ হয়। কিন্তু প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই সে দুর্নাম তিরোহিত হইয়াছিল, এবং যে সকল বিদ্বান্ অধ্যাপক সর্ব্বদাই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতিপক্ষতাচরণ করিতেন, সকলের সহিতই তদবধি একান্ত সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

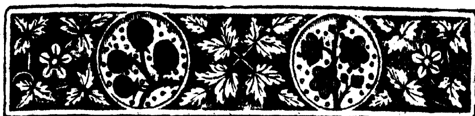
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৫০বৎসর রাজত্ব হইলে, যে সময় জুবিলি নামে রাজ্যোৎসব হয়, তৎকালে দেশীয় উচ্চ কল্পের অধ্যাপকগণের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি সৃষ্টি করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ বঙ্গদেশের ৮ জন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপককে, ঐ উপাধি দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে ভূষিত করেন। তদবধি অন্যান্য অধ্যাপকদিগকেও ঐ উপাধি যোগ্যতানুসারে মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথম মহামহোপাধ্যায়গণের মধ্যে সকলে এক্ষণে জীবিত নাই।

সজাতীয় সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন, বাল্যকাল হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইহা যেন বিধি-নির্ব্বন্ধ ছিল। তৎকালের চতুষ্পাঠীতে পাঠের আনন্দের ন্যায় অন্যান্য নানা রকমেও ছাত্রেরা আনন্দ করিতেন। পরস্পর চাঁদা তুলিয়া তাঁহারা প্রায়ই আনন্দ-

ভোজন করিতেন। সেই সকল আনন্দ-ভোজনাদির সুবন্দোবস্ত হইতে সহপাঠিগণের শাসন-প্রণালী পর্য্যন্ত. সকল ভারই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ক্রীড়া-কৌতুকে বল, যুক্তি-পরামর্শে বল, কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয়ে বল. কোনও গোলযোগ-দমনে বল, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকেই অধ্যক্ষ করিতেন। এইরূপ বাল্যকাল হইতে যে বিষয়েই দৃষ্টিপাত করা যায়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কর্তৃত্ব যেন অদৃষ্ট-লব্ধ ছিল। শেষে তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের আধিপত্য, মানব-জীবনের একটী প্রার্থনীয় সামগ্রী। ব্যবস্থাগ্রহণে, ধর্ম্মাধর্ম্মের শাস্ত্রীয়তা অশাস্ত্রীয়তা নিরূপণে, সামাজিক বিধি-বন্ধনে, সমগ্র হিন্দুসমাজ অধ্যাপক-মণ্ডলীরই চিরকাল অধীন। এই সকল বিষয়ে হিন্দু-সমাজে আভূপ-সাধারণের উপর অধ্যাপক-সম্প্রদায়েরই পূর্ণ রাজত্ব। সেই অধ্যাপককুলে যাঁহার প্রতাপ পরিব্যাপ্ত, নানা সময়ে হিন্দুরাজা এবং ভূম্যধিকারিগণকেও নানা বিষয়ের জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষা করিতে হয়। তাহার উপর ভট্টপল্লী নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজের সাম্প্রদায়িকতা বদ্ধমূল। একারণ এই সকল সমাজের প্রাধান্য-পদ, দেশবাসি-হিন্দুগণের অনন্ত আবেদন-অভিযোগে অহর্নিশ আচ্ছন্ন থাকে। এই জন্যই বলিয়াছি, সেই ভট্টপল্লী-সমাজে প্রাধান্য-পদে সমাসীন হইয়া ন্যায়রত্নমহাশয় যে আধিপত্য করিয়াছেন, তাহা মানব-জীবনের একটী প্রার্থনীয় সামগ্রী। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সন্তানগণের কি দুর্ভাগ্যেরই সময় পড়িয়াছে বলা যায় না। যেহেতু, এই দুর্ল্লভ মান্যতা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-জীবনের আয়ত্তাধীন হইলেও, শিখাবিলম্বিত মুণ্ডিত-মস্তকের পরিবর্ত্তে শ্রেণীবদ্ধ চিক্কণ কেশ-কলাপে মমতা, চন্দন-রেখাঙ্কিত ভালদেশে ঘৃণা, গুম্ফ-শ্মশ্রুমুণ্ডনে অপমান বোধ, অতি অল্প মূল্যের কোর্ট কামিজে গৌরব

জ্ঞান, চটীজুতার পরিবর্ত্তে বুটজুতার স্বর্গবোধ প্রভৃতি, সাংক্রামিকতা দোষে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সন্তানগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে। আমার বোধ হয়, এই সকল তুচ্ছ বিষয়ে গৌরব-বুদ্ধি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, অন্য কোনও গুরুতর লাভ না থাকিলেও, ঐ সকল নগণ্য পদার্থ ব্যবহার সুকর হইবে, এই অভিলাষেও অনেকে চিরমান্য আর্য্যশাস্ত্র-চর্চ্চা ও তাহার অবশ্যম্ভাবি-রাজমান্যতা উপেক্ষা করতঃ বাবুদলে প্রবিষ্ট হইতে স্পৃহাবান্ হয়েন। বেশ্যালয়ে, শালি-সমাজে ও ইয়ারের দলে কিছু উপেক্ষা আসিলে, ঐ সকল বেশভূষায়ও সহজেই উপেক্ষা আনা যায়। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত শিক্ষিত ও প্রকৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আড়ম্বরহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরিচ্ছদকে চিরকালই শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিয়া আসিয়াছেন। কতকগুলি অশিক্ষিত অসার ফোতোবাবুই কেবল চটীজুতা, শিখা ও চন্দন-রেখায় উপহাস করিয়া মনের সন্তোষলাভ করেন।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কবিতা ও সঙ্গীতে অনুরাগ। বাঙ্গালা রচনার নমুনা। সুহৃৎ প্রিয়তা। গুরুভক্তি। জ্ঞাতিবাৎসল্য।

ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক হইলেও, শুষ্ক দার্শনিক নহেন। কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি বাগ্‌দেবীর সুকোমল সামগ্রী সকলেরও তিনি অনেক সেবা করিয়াছেন। ছাত্র-জীবনে, দর্শনশাস্ত্রের কঠোর সমস্যা-সমূহের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক, রাত্রিকালে চতুষ্পাঠী হইতে যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, মানসিক-ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পথে উচ্চ-কণ্ঠে ভগবদ্‌গুণগান করিতে করিতে যাইতেন। তিনি এমনই সুকণ্ঠ যে, তাঁহার সেই গান শুনিবে বলিয়া পথি-পার্শ্বস্থ গৃহস্থেরা যত্ন পূর্ব্বক জাগিয়া থাকিত।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিজীবনের সাধনা অন্বেষণ করিলে, হৃদয়বান্ ভাবুকগণের কৌতূহলোদ্দীপক অনেক সামগ্রী পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সংস্কৃত কবিতা নহে, নব্যাবস্থায় তৎকালোপযোগী বাঙ্গালা রচনাও অবসর মতে ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনওরূপ সম্প্রদায়-সৃজনে অথবা প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজের কবি-জীবনকে নিয়োগ করেন নাই। এ বিষয়ে

তিনি এতই উদাস ছিলেন যে, সকল রচনা যত্ন সহ রক্ষিতও হয় নাই। তাঁহার সেই নব্যাবস্থার বাঙ্গালা রচনার লিপি, একখানিও আর পাওয়া যায় না সংস্কৃত রচনা-শক্তির সমালোচনার পূর্ব্বে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা রচনার ভঙ্গি কিরূপ ছিল, তাহার আদর্শ, 'আগমনী' নামক তাঁহার রচিত একখানি পাঁচালী হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রথমেই কৈলাস-বর্ণনা পূর্ব্বক উমাকে হিমালয়ে যাত্রা করান হইতেছে। যথা,

কৈলাস সর্ব্ব-প্রধান যথায় বিরাজমান
সহাসনে শঙ্কর শঙ্করী ;
স্বর্গ তো অতি সামান্য, ব্রহ্মলোক নহে মান্য,
গণ্য নহে গোলোক-নগরী।
যে স্থানের বিল্ববনে বিজনে একাগ্রমনে
যোগ-বাক্য বিরূপাক্ষ-মুখে,
শুনিয়া কাল-বারিণী মহাকাল কুটুম্বিনী
নিমগন অগণন সুখে।
সে বনে করিয়া বাস শুক পক্ষী যোগাভ্যাস
করে', ব্যাসালয়ে জন্ম ল'য়ে,—
শুকদেব নাম ধরি' হর্ষে হরি-ভক্তি-বারি
বর্ষিলেন মহর্ষি হইয়ে।
যে স্থানে শ্মশানক্ষেত্র জানিয়া অতি পবিত্র
যোগাভ্যাসে যোগী করে বাস,

স্বয়ং ব্রহ্ম গণপতি যে স্থান রক্ষায় ব্রতী
দ্বারি-ভাব ধরি' বার মাস ,
কৈলাসের কত ব্যাখ্যা ইহাতে কর পরীক্ষা
যে স্থানের পিশাচ প্রভৃতি.
অতি পূজ্য সর্ব্ব স্থলে যাহাদের না পূজিলে
পূজা নাহি লন ভগবতী।
পুরের চৌদিক ঘেরি' কল্প-বৃক্ষ সারি সারি
অমান্য সামান্য তরু-মত,
যে স্থানে করেন দান ভগবতী, ভগবান্,
চতুর্ব্বর্গ-ফল অবিরত।
যে স্থানের অণুমাত্র ছায়া বারাণসী-ক্ষেত্র
যা হ'তে পবিত্র স্থান নাই,
যে বারাণসী নগরে বাসেতে বাসনা করে
সুর-নর-কিন্নর সবাই।
এ হেন কৈলাস পুরী তাহে বাস পরিহরি'
কৃত্তিবাস সহ বাস ত্যজে'
নাশিতে জননী-ক্লেশ যাইতে জনক-দেশ
ব্রহ্মময়ী সাজিলেন নিজে।
আশুতোষে সন্তোষিয়ে শিবের অনুজ্ঞা ল'য়ে
শুভ-যাত্রা করে শিব-জায়া,

জয়া ও নন্দীরে যেতে নন্দনেও সঙ্গে ল'তে
আদেশ করেন মহামায়া।

* * * * *

পিত্রালয়ে যাইবার জন্য সতীর বেশ-বিন্যাস এইরূপ।

* * * * *

সাজায় সঙ্গিনী আসি ত্রিলোকেশী-কেশরাশি
মল্লিকা, বকুলে, চাঁপা ফুলে,
যতনে কোন' যোগিনী বিনায় ভবানী-বেণী
হেরে' লজ্জা ধরে ফণিকুলে।
সীঁথাতে সিন্দুর ধরে স্মিতমুখী সমাদরে,
মণি-মুক্তা-স্বর্ণ-অলঙ্কারে——
মায়ের সজ্জিত গাত্র কজ্জলে উজ্জ্বল নেত্র
বিল্বপত্র ধরে শিরোপরে।
নলক নাসাগ্র 'পরে ত্রিলোক-জননী পরে,
তিলক পরিল নাসা-মূলে ;
ত্রিপুরসুন্দরী-পা'য় নূপুর কেহ পরায়
শুভযাত্রা-কালে কুতুহলে।
যিনি মৃত্যুঞ্জয়-জায়া স্বয়ং যিনি যোগমায়া
দয়া হেতু সর্ব্বজীবোপরে

তিনি লোক-শিক্ষা জন্য সধবা-সৌভাগ্য-চিহ্ন
ধরিলেন লৌহ বামকরে।
রক্তপদ্ম-মাল্য গলে অলক্ত পদযুগলে
রক্তাম্বর পরি' শুভঙ্করী,
হরিষে হরিবাহন পৃষ্ঠোপরি আরোহণ
করে, করি-মুখে ক্রোড়ে করি'।



নন্দী একে পাগল, তাহাতে আবার ভাঙ্‌ খায়। তাহার গমন বর্ণনা ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপে করিয়াছিলেন।



অচলনন্দিনী-সঙ্গে যায় নন্দী রঙ্গে ভঙ্গে
আনন্দ-তরঙ্গে মগ্ন হ'য়ে ;
খেয়ে ভাঙ্‌ আঁখি ভঙ্গি, বাক্ ভঙ্গি, গতি ভঙ্গি
করে', চলে ত্রিশূল ধরিয়ে ॥
পার্ব্বতীর প্রিয়-ভৃত্য কখন' বা করে নৃত্য
কখনো বা দম্ফে লম্ফ দেয়,
কভু ধীরে ধীরে গতি কখনো বা পার্ব্বতী(র)
পদ ধরি' প্রণতি জানায় ॥

নন্দীর সৌভাগ্য চিন্তা করতঃ ভক্ত-কবির মনে হইয়াছিল,

কাল কি ইহার তুল্যকক্ষ,
কাল কে কি কেউ করে লক্ষ্য,
কাল-বারিণী আছেন যার পক্ষে,
নন্দীর অগণ্য পুণ্য
নন্দন-সমান গণ্য
চির দিন দীনতারা-সমক্ষে।

* * * * *

পথে যাইতে যাইতে নন্দী, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বড় আকুল হইয়া উঠিল। কবি বর্ণনা করিলেন।

* * * * *

হেন কালে নন্দী এসে আনন্দময়ীর পাশে
নিরানন্দে কহে মৃদুভাষে,
"মরি মা, তৃষ্ণায় মরি, ক্ষুধাতুর ও শঙ্করি,
কৃপা করি তৃপ্ত কর দাসে।"

* * * * *

ভগবতী ভক্তাধীনা। তিনি তখন কি করিলেন?

* * * * *

পূরাতে নন্দীর ইষ্ট, পরিহরি' সিংহ-পৃষ্ঠ
ভূমিষ্ঠ হ'লেন শুভঙ্করী,
হ'লে যাঁর অভিপ্রায় হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
মৃত্যুঞ্জয় যাঁর আজ্ঞাকারী।

সেই ভগবতীর অভিপ্রায় হইয়াছে, আর অভাব কিসের?

সুভক্ষ্য ফলের বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ
লক্ষিত হইল ইচ্ছা-মতে,
তারার আদেশ পেয়ে অতি ত্বরান্বিত হ'য়ে
জাহ্নবী এলেন জল দিতে।
ত্রিলোক ভোজন তরে, মা বলে' যদি কাতরে
ডাকে মাকে দুর্গমে পড়িয়ে,
দুর্গতি নাশিতে তার তখনি জগন্মাতার
অধিষ্ঠান হয় তদালয়ে।
নন্দী তো নিজের ভৃত্য হয়েছে অতি ক্ষুধার্ত্ত
শুনে তার কাতরতা-বাণী
আর কি মার সহ্য হয় লেহ্য-ভোজ্য সমুদয়
সে স্থানেই প্রস্তুত তখনি।

হসন্ত অক্ষরের ন্যায় যে অক্ষরের উচ্চারণ, পাঁচালীর রচনায় সকল সময়ে সে অক্ষরকে, পৃথক্ অক্ষর ধরা হয় না। এ কারণ অন্যান্য রচনার সহিত তুলনায় এই সকল রচনায় কোথায়ও কোথায়ও এক আধটি অক্ষরের ন্যূনাধিক্য পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

কয়েকটী গানের নমুনাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রথমটী উমার প্রতি জননী মেনকার উক্তি। দাশরথি রায় কৃত 'গোপিকার বস্ত্রহরণ' পালার "ছি ছি লাজে মরে' যাই, প্রেম কর্‌লি কার সনে। কি বোধ আছে, অবোধ নন্দের গোপাল, বনে চয়ায় গোপাল, সে কি পিরীতি জানে।" এই প্রসিদ্ধ গানের সুরে গানটী গাহিতে হয়।

ঝিঝিট—একতালা।

(আমার) শুনে প্রাণ জ্বলে, জল আঁখি-যুগলে।
ত্যজি' মণিময় হার,
নর-শিরোহার নাকি পর' মা গলে॥
সবার মুখে আবার একি শুন্‌তে পাই,
শবালয় ভিন্ন বাসস্থান শিবের নাই,
মাথে ছাই;
(আবার) পাগল পাগলিনী, ভব আর ভবানী,
সত্য বল কেন বলে সকলে॥
শুনি ত্রিশূলপাণির পরণে বাস নাই,
ভূতসনে বৃষাসনে বাসে বাসনাই—
শুন্‌তে পাই;
(তাই) ভাবি মা তোমার, তবে কবে আর,
শিব হ'তে শুভ হবে কপালে॥

নিম্ন-লিখিত গানটী শিব-নিন্দায় উমার উক্তি।

সুর বিভাস—তাল ঠেকা।

শুন গো মা, কি মহিমা, ধরেন তোমার ত্রিশূল-পাণি,
অহিতে বেষ্টিত অঙ্গ, অহিত কভু দেখিনি॥
নাহি মা অহিত হিত, সম গরল অমৃত,
অশেষ গৌরবান্বিত, পদাশ্রিত ঋষি-মুনি॥
আগুন কপালে জ্বলে, অগুণ নাই কোন' কালে,
ত্রিগুণ তাঁর বশীভূত, গুণাতীত তিনি;

ভূত মাত্র নয় আশ্রিত, বশীভূত সর্ব্বভূত,
অদ্ভুত চরিত মাতঃ, দুরিত-ঘাত-অশনি ॥
কত গুণ ধরেন ত্রিনেত্র, নাহি দেখেন পাত্রাপাত্র,
পেলে বিল্বপত্র মাত্র, সন্তোষ অমনি ;
অমর কিন্নর নরে, যে ফল বাসনা করে'
জানায় মা সে যোগিবরে, সেই ফল ফলে তখনি ॥

নিম্নে একটী শ্যামা-বিষয়ক গান প্রদত্ত হইল। দাশরথি কৃত "রামচন্দ্রের দেশে আগমন" নামক পালার "কা'র প্রাণ-নাশন, করবি রে ভাই শোন, মিতার আমার কোন' অপরাধ নাই" এই গানের সুরে নিম্ন-লিখিত গানটী গাহিতে হয়।

ললিত ঝিঝিট— একতালা।

বিচারিয়ে মন, লও রে শরণ,
কল্যাণ-কারিণী কালী-চরণে।
বৃথা গেল কাল, কালী কালী বল,
কালের বন্ধন নইলে কাটবি কেমনে ॥
অন্য সুরের কৃপা শুদ্ধাচারী পান,
সুরাপান শুদ্ধাচার দুই সমান,
বাঞ্ছাকল্পতরু কালী-সন্নিধান
ভেদ নাই রে ;
কৃপাদানে কৃপণতা নাই কোন' জনে ॥
শুচি-স্থানে অন্যের পূজায় অধিকার,
শৌচা শৌচ কালী-পূজায় নাই বিচার,

যথায় ইচ্ছা হয়, পূজলে কালিকায়
কৃপা পায় রে ;
বসে' বিল্বতরু-মূলে কিম্বা শ্মশানে ॥

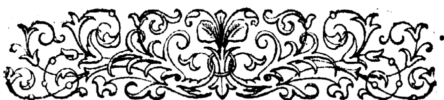
ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপ হৃদয়বান্ ভাবুক, ভট্টপল্লীর উর্ব্বর ভূমিতে তাঁহার সেইরূপ সহৃদয় সঙ্গি সমূহেরও অভাব হয় নাই। এই সকল রচনা লইয়া সেই সুরসিক বন্ধুগণের ভিতর অনধ্যায়-দিনে আনন্দের সীমা থাকিত না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন প্রকৃত কবিত্বামোদী। ব্যাস-বাল্মীকির বিভু-বর্ণনা হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-সম্মিলন পর্য্যন্ত, যেথানেই তিনি কবিতা-সুন্দরীর সুকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়াছেন, সেইখানেই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। গুণবানের গুণের অবমাননা তিনি কখনই করেন নাই। দাশরথির তিনকড়ি রায়ের ন্যায়, গোপাল উড়ের ভুলোও, নিজ কণ্ঠের পরিচয় দিয়া, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা সমাদর পাইয়াছে। তিনি সঙ্গীত ও কবিত্বের এতই উৎসাহদাতা যে, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পাঁচালীকার, যত প্রধান প্রধান যাত্রাকর, দেশে সকলেই তাঁহার একান্ত অনুগত ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় শুনিতে ইচ্ছা করিলে. বিনা পারিশ্রমিকে আসিয়া সকলেই গাহিয়া যাইতেন। এইরূপে উত্তম উত্তম পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি লইয়া ভাটপাড়ায় তিনি সর্ব্বদাই আনন্দ করিতেন। এই সকল আনন্দ উপভোগের সময় প্রাচীনাবস্থাতেও বাল্যকালের সেই সুরসিক সঙ্গীগুলি পার্শ্বে না থাকিলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিতেন। তিনি যাহাদিগকে ভালবাসেন, সকল কার্য্যেই তাঁহাদিগকে চাই। তাঁহার ভালবাসা এমনই নিষ্কৃত্রিম।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্ঞাতি-প্রিয়তাও অসাধারণ। তিনি ভট্টপল্লীতে বিপুল জ্ঞাতিমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া পূজনীয় ব্যক্তিগণের চিরকাল অনুগত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। গুরুতর সম্পর্কীয়গণের নিকট চাপল্যপ্রকাশ জন্মাবধি করেন নাই। পূজ্য-ব্যক্তিগণ কোনও আজ্ঞা করিলে, চিরকাল কৃতার্থ হইয়া তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূজার্হগণকে প্রণাম করিবার জন্য প্রতি বৎসর বিজয়া-দশমী দিনে তাঁহাদের গৃহে গৃহে একান্ত ভক্তি সহকারে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে চিরদিন অকপট-চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তবে, দোষই হোক অথবা গুণই হোক, একটী বিষয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লঘু গুরু জ্ঞান থাকিত না। তিনি একান্ত পিতৃ ভক্ত। কেহ বিদ্বেষ বশতঃ সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের কোনও নিন্দা করিলে, তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীতে সমসম্পর্কীয়গণকে সুমধুর ভ্রাতৃ-সম্বোধনে সর্ব্বদা সম্বোধিত করিতেন। তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান কালে আনন্দের সীমা থাকিত না। গ্রামের কোনও শিব-মন্দিরে পূর্ব্বে বহুতর জ্ঞাতি অপরাহ্ণ কালে সমবেত হইতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও নিয়মিত রূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সকল আত্মজনের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, তিনি তাঁহার পার্শ্বে গিয়া পীড়াদির উপশম করে বন্ধুবান্ধব সহ সৎপরামর্শ করিতেন। কোনও রূপ বিবাদ বিসম্বাদে যাহাতে আত্ম-বিরোধ না হয়, সে কারণ অনেক সময় মধ্যস্থতার দ্বারা তাহা নিবারণ করিতেন বালকগণের মধ্যে কেহ চাপল্য বশতঃ কোনও অকার্য্য করিয়া ফেলিলে, রাজদ্বারে যাহাতে বংশের কলঙ্ক প্রকাশ না পায়, তদ্বিষয়ে

চেষ্টা করিতেন। এইরূপ যথাসাধ্য হিতকার্য্য করা ব্যতীত, ন্যায়রত্ন মহাশয় জীবনে একদিনও কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টা করেন নাই। কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা, মনেও কখন' স্থান দেন নাই। বহুসংখ্যক জ্ঞাতিমণ্ডলীর মধ্যে, কাহারও সহিত ঘটনাচক্রে ক্ষণিক বিরোধ মাত্র যদি দৈবাৎ সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কারণ, কোন' ঘটনায়ই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর কাহারও কিছুমাত্র অনুরাগের ক্রটী হয় নাই। জ্ঞাতি-মণ্ডলীর নিকটেও এইরূপ আদর-লাভ জীবনের একটী অল্প আনন্দের সামগ্রী নহে।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



কাশীবাসের প্ররোচনা। হাতুয়া-মহারাজের বৃত্তি। ভট্টপল্লীত্যাগ। বঙ্গভূমির নিকট বিদায়-প্রার্থনা। পণ্ডিতগণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা।

এই সকল আনন্দে প্রাচীনাবস্থায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্ত আর আবদ্ধ রহিল না। বিশ্বনাথের আরতির বেদধ্বনির সহিত প্রাচীন কালে সকল আনন্দকে তিনি বিলীন করিবেন, দিগন্তব্যাপিনী সহস্র-মুখী নদীর স্রোত' মহাসাগরে মিলাইবেন, বহুদিন হইতেই তাঁহার চিত্তে এই বাসনা ছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ সেই প্রাচীনাবস্থা উপস্থিত হইতে লাগিল। কঠিন মহাকালও এই সময় তাঁহার চোখের সম্মুখে পার্থিব আনন্দের নশ্বরতা দেখাইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতাগুলি, সকলেই একে একে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যেও কোন্নগরে মহামহো-পাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। আর সকলেই গতাসু হইলেন। কুড়ুম্বিদিহির ৺রামধন তর্কপঞ্চানন, বিল্বপুষ্করিণীর ৺প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, নবদ্বীপের ৺ভুবন মোহন বিদ্যা-রত্ন প্রভৃতি পরম প্রীতিভাজন বয়স্য অধ্যাপকগণ একে একে

৮

লোকান্তরিত হওয়ায়, সভার আমোদ তিরোহিত হইল। এই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্ত অত্যন্ত উদাস ভাব ধারণ করে। একদা জয়পুরের মহারাজের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, শ্রীশ্রী৺-কাশীধামে নামিয়া বিশ্বনাথের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন, "বাবা কতদিনে তোমার নিকট আশ্রয় দিবে? পিতামাতার ক্রোড়ে বাল্যকালে যাহাদের সহিত লালিত হইয়াছিলাম, প্রাণসম সেই সকল কনিষ্ঠ ভ্রাতারা লোকান্তরিত হইল। বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া যশোলিপ্সার কৌমার-অবস্থা হইতে, এই প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রতিসভায় সর্ব্ববিষয়ে সঙ্গী ছিলেন, সেই সকল পণ্ডিতেরা একে একে কাল-কবলে পতিত হইতে লাগিলেন। বাবা আর কি লইয়া আমি বঙ্গদেশে থাকিব?"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রার্থনা বিশ্বনাথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইতে না হইতে, হিন্দু-চূড়ামণি বিদ্যোৎসাহী হাতুয়ার মহারাজ ৺কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী আহ্বান করিবার জন্য উপর্য্যুপরি তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, নানা সম্ভাষণের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি কাশীবাস করিতে ইচ্ছা হয়? ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন "আমার কাশীবাস করিতে একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না।"

রাজা। ঘটিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক কি?

ন্যায়রত্ন মহাশয়। মহারাজ! প্রাচীনাবস্থায় কাশীবাস করিয়া যদি উদরান্নের জন্য কাশীতে প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা।

রাজা। ন্যায়রত্নমহাশয়! পূর্ব্বকৃত কোনরূপ বন্দোবস্তের দ্বারা আপনি তথায় প্রতিগ্রহ অনায়াসেই তো নিবারণ করিতে পারেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়। মহারাজ! সেরূপ বন্দোবস্ত আমার কিছুই নাই। কারণ মহিষাদল-রাজবাটী অথবা অন্যান্য স্থানে পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত সেরূপ বৃত্তি যাহা আমার আছে, তাহা যৎসামান্য। তদ্দ্বারা কাশী-বাস চলে না। শিষ্যগণ যাহা কিছু সাহায্য করেন, তাহাও গ্রহণ করিব। কিন্তু তথাপি আমার কাশীবাসের ব্যয় সঙ্কুলন হইবে না।

রাজা। শিষ্য-শাখা, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা আপনার বার্ষিক যে আয় আছে, তদতিরিক্ত আর কত টাকা সালিয়ানা হইলে, আপনার কাশীবাস চলিতে পারে?

ন্যায়রত্ন মহাশয়। আর ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাত্র মাসিক সংস্থান হইলে, আমার কাশীবাস-বাসনা পূর্ণ হয়।

রাজা। ন্যায়রত্ন মহাশয়! কাশীতে যাহাতে আপনাকে প্রতিগ্রহ না করিতে হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ৬০০৲ ছয় শত টাকা সালিয়ানার নির্ব্বন্ধ আমিই আপনার জন্য করিলাম।

বিশ্বনাথের দয়া বিচিত্র। তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় অব্যবহিত পূর্ব্বে কাশী হইতে জানাইয়া আসিয়াছিলেন। ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইবা মাত্র, একজন ব্রাহ্মণ নরপতি, অযাচিত-ভাবে আহ্বান করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইরূপ বহুতর ক্ষেত্রেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর দেবদয়ার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সকল দৃষ্ট হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সময় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করেন। মহারাজের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং আত্মমোচনে তীব্র ইচ্ছা উভয়ই কবিতাটীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে।

আসৃষ্টেঃ শমনস্য দৃষ্টিদহনৈর্দগ্ধস্য দাহোদ্ভবা
যস্য ক্লেশহরং বদন্তি বিবুধা যং বৈদ্যনাথং বিভুম্।
তৎ বিশ্বেশ্বর সন্নিধিং নয়সি মাং যত্ত্বং দয়াবত্তয়া
ভূজানি জনকস্তু পূর্ব্বজননি জানে ভবানেব তৎ॥

মর্ম্মার্থ।

সুত দগ্ধ হ'লে দাহে পিতা ক্লেশ পেয়ে তাহে
ল'য়ে যান বৈদ্যের সকাশে,
সৃষ্টি হ'তে সুদুঃসহ শমনের দৃষ্টি-দাহ
সহ্য করে' থাকি আমি ক্লেশে।
সে ক্লেশে পতিত সবে বুধ জনা যাহে ভবে
"ক্লেশহর বৈদ্যনাথ" যাঁরে,
পাঠাইয়া কাশীবাসে সেই বৈদ্যনাথ পাশে
নরনাথ! রাখিছ আমারে।
বুঝে মোর ক্লেশ-কথা বুঝি বা তুমিও ব্যথা
পাইয়াছ কোমল অন্তরে,
হে ভূপাল মনে ধরে পিতা ছিলে জন্মান্তরে,
এত দয়া সে পূর্ব্ব সংস্কারে।

এইরূপে, একটী আদর্শ বিদ্যোৎসাহী ভূপতি বঙ্গদেশ হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংসার উঠাইয়া বিনা প্রতিগ্রহে কাশীবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যাঁহার কৃপায় ন্যায়রত্ন মহাশয় পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করতঃ, অনন্ত বিদ্যা, অসীম প্রতিষ্ঠা ও অসামান্য সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া ইহকাল অতিবাহিত করিলেন, তিনিই যে আবার তাঁহার পারলৌকিক সৌভাগ্যের পূর্ণতার বিষয় চিন্তা

করিতেছেন, ইহাই এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। ইহারই অব্যবহিত পরে পুত্রের বিবাহ দিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাসে যাত্রা করেন।

জন্মভূমির মমতা বড়ই দুশ্ছেদ্য সামগ্রী। যেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃ-স্তন্য পান করিতে হইয়াছে, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় যে ভূমিতে যাপিত হইয়াছে, জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিবেষ্টিত সেই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' ভূমি পরিত্যাগের সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও চিত্ত আবেগ-পূর্ণ হইয়াছিল। সেই আবেগ-মিশ্রিত বহুতর মর্ম্মভেদি সংস্কৃত-কবিতা সেই সময় রচনা করেন। তাহার অনেকগুলি এড়ুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদায়-কালে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটীর দ্বারা ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গভূমির নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করেন।

আবাল্যং জননীব জীবয়সি মামারোপ্য হৃৎপঞ্জরং
সচ্ছন্দং বশবর্ত্তিনীব মধুরৈ র্মূলৈঃ পয়োভিঃ ফলৈঃ।
বিন্মূত্রাদি পরিগ্রহেণ চ কদা বাধাপি জাতা ন তে
ক্রোড়ে ক্রীড়নমদ্য বঙ্গবসুধে মুঞ্চাম্যনুজ্ঞায়তাম্॥

মর্ম্মার্থ।

বাল্য হ'তে দাসে তুমি পালিতেছ বঙ্গভূমি
স্নেহময়ী জননীর প্রায়,
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখ, সদা যেন বশে থাক,
তব ঋণ শোধা কি মা যায়।
দিয়াছ মা অনিবার ফল-মূল-পয়োধার
হ'লে আমি ক্ষুধায় কাতর,

মাগো ওই কোলে কত মল-মূত্র অবিরত
চালিয়াছি, বাধা নাই তোর।
আজি হ'তে তোর ছেলে স্নেহময়ি, তোর কোলে
ধূলা-খেলা করে সমাপন,
সন্তানেরে ওমা তুমি আজ্ঞা দাও বঙ্গভূমি
কাশীবাসে চলেছি এখন ॥

শাস্ত্রীয় কথা লইয়া সভা-ক্ষেত্রে অনেক সময়ে পণ্ডিতগণের সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তর্ক-বিতর্ক করিতে হইয়াছে। কোনরূপ অপরাধ পাইয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অসন্তুষ্ট থাকা বিচিত্র নহে। স্বদেশ পরিত্যাগ কালে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়া, তিনি কাতর-ভাবে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গাবাসমপাস্য বাসজনয়ে যাস্যামি কাশ্যামহং
মদ্দোষাদিহ কোঽপি সন্তি বিদুষাং মধ্যে চ মদ্দ্বেষিণঃ।
অদ্বেষেণ ভজন্তু তোষমধুনা সাধুষ্বিমাং প্রার্থনাং
কুর্ব্বেঽহং বিহিতাঞ্জলিঃ সবিনয়ং রাখাল দাসঃ স্বয়ম্ ॥

মর্ম্মার্থ।

কাশীবাস করিবারে দীন-হীন যাত্রা করে,
উঠিবে গো বঙ্গের বসতি,
যদি এই বঙ্গস্থলে, থাকেন পণ্ডিতকুলে,
মোর দোষে কেহ রুষ্টমতি,
আজি সব সাধুকুলে সমুদয় দ্বেষ ভুলে
তুষ্ট হোন অধীনের প্রতি,
গল-লগ্নী কৃত-বাস করিছে রাখাল দাস
করযোড়ে সবারে মিনতি ॥

এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত *কবিতাগুলির অনুবাদ প্রকাশ না করিয়া আমরা মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতেছি। তাহার হেতু এই যে, এক ভাষার রস ভাষান্তরে* প্রকাশ করা অতি দুরূহ। তদুপরি মাত্র প্রতিশব্দ ব্যবহার করতঃ অনুবাদ করিয়া গেলে বঙ্গভাষার পাঠকেরা মূল কবিতার রস কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। হেতুগর্ভ একটী ক্ষুদ্র বিশেষণে সংস্কৃত ভাষার যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, ক্রিয়াকর্তৃকর্ম্ম-সমন্বিত হেতুগর্ভ বাক্য রচনা না করিলে বঙ্গভাষায় অনেক স্থলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বহু বিশেষণের শ্রেণী, বহু সমাসের শ্রেণী সংস্কৃত ভাষায় যে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে, সমাস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বিশেষণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অন্য প্রকারে ভাব প্রকাশ না করিলে বঙ্গ ভাষায় সে সৌন্দর্য্য অনেক স্থলে প্রকাশিত হইতে পারে না। যে আভাস, যে আশয়, সংস্কৃত কবিতায় খুলিয়া দিবার নিয়ম নাই, বঙ্গ ভাষায় অনেক স্থলে সেগুলি খুলিয়া দেওয়াই রসোদ্দীপক। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিতা সমূহ পাঠকের চিত্তে যে ভাবোদ্রেক করিয়া থাকে, তাহাই বঙ্গভাষায় পাঠকগণকে বুঝান আমাদের উদ্দেশ্য। শব্দান্তর ব্যবহার করতঃ যথাযথ অনুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।



কাশীবাস। প্রিয়বস্তু পরিত্যাগকালে আত্মসান্ত্বনা।
দেব দেবীর স্তব রচনা। মোক্ষ কামনা।
গঙ্গাভক্তি। কাশীভক্তি। শাস্ত্রানুরাগ।
পরিচ্ছদ। আকৃতি।

এইরূপে ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া সন ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাসার্থ যাত্রা করেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে অবস্থায় কাশীবাস করিলেন, সে অবস্থায় সকল লোকে সহজে কাশীবাস করিতে পারে না। তিনি বঙ্গদেশে একপত্রী। দেশ-দেশান্তর হইতে পরম শ্রদ্ধা সহকারে আহ্বান করিয়া, সকল অধ্যাপকের অগ্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজার দ্বারা দেশবাসীরা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক একজনও জীবিত ছিলেন না। সর্ব্ব-সাধারণেরই তাঁহার উপর একান্ত ভক্তি। যেখানে দেশ-বাসীর ধর্ম্ম-সংশয় নিরাকৃত হইল না, সেই খানেই ন্যায়রত্ন মহাশয়; যে কোনও শাস্ত্রের যে কোনও বিচারে মধ্যস্থ ন্যায়রত্ন মহাশয়; শাস্ত্রীয় ব্যাপারে কুতর্ক ও কুফল লইয়া কোনও অধ্যাপক স্বেচ্ছাচারিতা করিলে

শাস্ত্রবিদ্গণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট পরিচয় দিতেছেন; কেহ অযথা শাস্ত্রীয় তর্ক করিয়া সভায় দাম্ভিকতা করিলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় চোখ্ রাঙাইতেছেন; ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আধিপত্যে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। এই সকল সম্ভ্রম উপেক্ষা করিয়া সকল অধ্যাপকে কাশীবাস করেন না। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য প্রলোভনের সামগ্রীও ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর যে বংশের শোভাস্বরূপ, সেই বংশের গুরুতা দেশ-প্রসিদ্ধ। নানাস্থান হইতে পবিত্র ব্রাহ্মণগণ দীক্ষা-ভিলাষী হইয়া ব্যাকুলান্তরে এই বংশ হইতে সুযোগ্য গুরুর অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সময় কাশীবাস করেন, তিনি এই বংশে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ পুরুষ, এবং তাঁহার উপর নানা দেশস্থ লোকের একান্ত ভক্তি। তিনি এই সময় ভট্টপল্লীতে থাকিলে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা আরও বহুতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। তদ্দ্বারা তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির বিশেষ উপকার হইতে পারিত। কিন্তু মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বীয় মোচনোপায় উদ্ভাবনকেই চরম-পুরুষকার জ্ঞান করিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে, আমরা তিনটি বিষয় দেখিতে পাই। কবি-জীবনে সুললিত-কবিতাচ্ছলে নানাবিধ উপদেশ-প্রকাশ; অধ্যাপক-জীবনে, বঙ্গীয়-বিদ্বৎসমাজে প্রবল আধিপত্য; ঋষি-জীবনে সকল আধি-পত্যে উপেক্ষা; ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বদেশ-ত্যাগকালীন রচিত কবিতা সকল অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, দেশে তাঁহার যে সকল প্রিয়-সামগ্রী ও মমতার বস্তু আছে, জন্মভূমি ত্যাগের সময় সকলগুলি চিত্তে যুগপৎ উদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহ-পরকালের বন্ধুর আশ্রয় লইতে চলিয়াছেন, কি ঐহিক, কি পারত্রিক সকল অবস্থার শুভচিন্তা তিনিই করিবেন, এই বিবেক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সকল মায়া-ডোর

বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ সময়ের রচিত দুই একটি কবিতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বঙ্গস্থলস্থৈঃ সমমৈহিকানি
বন্ধুত্ব-পাশৈঃ সুখ-বন্ধনানি।
ছিত্বাদ্য বিশ্বেশ্বরমাশ্রয়ে ত্বাং
যস্মাত্ত্বমেবাত্র পরত্র বন্ধুঃ॥

মর্ম্মার্থ।

বন্ধুত্ব-বন্ধনে আছি বঙ্গবাসী সনে
আশৈশব বদ্ধ আমি ঐহিক-জীবনে।
ছিন্ন করি' বিশ্বনাথ সে সুখ-বন্ধন,
সকল মমতা মায়া দিয়া বিসর্জ্জন,
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-হীন চলে,
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ পরকালে।

তৃণায় মত্বা বহুবঙ্গকীর্ত্তিং
বিদ্যার্জ্জিতাং বিত্তচয়াগ্যবৃত্তিম্॥
বিসৃজ্য বিশ্বেশ্বর মাশ্রয়ে ত্বাং
যস্মাত্ত্বমেবাত্র পরত্র বন্ধুঃ॥

মর্ম্মার্থ।

চলিতেছি বিশ্বনাথ তব সন্নিধান
বঙ্গের বিপুল কীর্ত্তি করি' তৃণ-জ্ঞান,
সযতনে বিদ্যা-চর্চ্চা করেছি শৈশবে,
বিনা ক্লেশে অর্থাগম হয় কত ভাবে,

ওহে বিশ্বনাথ আজি সব পরিহরি'
সকল মমতা-মায়া চিরতরে ছাড়ি'
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-হীন চলে
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥

সপিণ্ড-বর্গং চ বিহায় মায়াং
সুতাত্মজাদীং চ নিজাত্মজায়াম্।
চিরায় বিশ্বেশ্বরমাশ্রয়ে ত্বাং
যস্মাত্ত্বমেবাত্র পরত্র বন্ধুঃ ॥

মর্ম্মার্থ।

চারিধারে স্নেহশীল জ্ঞাতি-পরিজন,
কন্যা দৌহিত্রাদি কত মমতার ধন,
ওহে বিশ্বনাথ, আজি সব পরিহরি'
সকল মমতা মায়া চিরতরে ছাড়ি'
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-হীন চলে
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥

প্রায়ো ধনায়ন্তু বিনা প্রয়াসং
প্রয়াস্তবাসে চ নবে নিবাসম্।
উপেক্ষ্য মোক্ষপ্রদ মাশ্রয়ে ত্বাং
যস্মাত্ত্ব মেবাত্র পরত্র বন্ধুঃ ॥

মর্ম্মার্থ।

স্বজন-পোষণ তরে যত অর্থ চাই
বিদ্যা এনে দেয় তাহা কোন' চেষ্টা নাই।
অতি যত্নে করিয়াছি নবীন ভবন,
কি আনন্দে বাস তাহে করি অনুক্ষণ।

ওহে বিশ্বনাথ! আজি সমুদয় ছেড়ে
তোমার আশ্রয়ে চলি, স্মরিয়া তোমারে।
তুমি নাথ মোক্ষদাতা জীবনান্ত হ'লে,
জীবের তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে॥

ন্যায়রত্ন মহাশয় আপন শিষ্যগণকে একান্ত ভালবাসিয়া থাকেন। কাশীধাম গমনকালে তাঁহাদের স্মৃতিও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ব্যথিত করিয়াছিল, ইহা নিম্নলিখিত কবিতা দৃষ্টে অনুভব করা যায়।

सुतोपमं मामक-शिष्य-जातं
सदाहृजस्रेऽमरभोग्यमातम् ।
विमोक्ष्य तस्मात्पदमाश्रये त्वां
यस्मात्त्वमेवात्र परत्र बन्धुः ॥

মর্ম্মার্থ।

বঙ্গদেশে শিষ্যগণ র'ল পড়ে' হায়,
স্নেহ করিয়াছি কত সন্তানের প্রায়।
আমারে সকলে তা'রা দেবতা ভাবিত,
মর্ত্ত্যে দেবভোগ্য সুখে নরেরে রাখিত।
চলিলাম আজি আমি এ সকলি ফেলে,
মোক্ষপ্রদ তব পাশে মোক্ষ ল'ব ব'লে।
ঐহিকের তরে হ'ব কেন ম্রিয়মাণ,
ইহ পরকালে বন্ধু তুমি বিদ্যমান॥

ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাস করিয়া দেবস্থান দর্শন করতঃ ঢুণ্ঢি-গণেশ, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর নানাবিধ স্তব রচনা

করিতে লাগিলেন। সেই সকল স্তব রচনা কালে সর্ব্ব প্রথমে লিখিলেন,

स्थिता व्यर्थालापैः परम-रसहीनैव रसना
यदा शक्ति र्जाता वचन-रचनायां तदवधि ।
पितः शम्भो मातर्नगपतिसुते भो गणपते
कुरुध्वं मत्पद्यैः स्तुतिनतिपरैस्तां रसयुताम् ॥

মর্ম্মার্থ।

যে দিন জনমি' হেথা শৈশবে ফুটিল কথা
তদবধি এ সুদীর্ঘকাল,
নিত্য ব্যর্থ-আলপনে সার-শূন্য সম্ভাষণে
নিয়োজিত ছিল বাক্য-জাল।
নিদারুণ মোহবশে মজেনি পরম-রসে
এক দিন(ও) রসনা আমার,
হে গিরিশ! গিরিসুতে! হে কৃপালো গণপতে!
রাখ ভিক্ষা আজি একবার,
স্তুতি-নতি-গুণ-গানে পারি যাহে এত দিনে
রসনারে করিতে সরস,
সেই শক্তি বিতরণ ভগবতি! ভগবন্!
কর' দাসে হ'য়ে কৃপাবশ॥

কাশীবাস করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সকল স্তব-কবিতা রচনা করেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই নিজের ভবমোচন-কামনা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথের স্তবে কোথাও লিখিয়াছেন,

সংসার-বারাংনিধিমাশু তর্ত্তুং
বার্দ্ধক্য-কালস্য সুখেন হর্ত্তুম্।
ত্বদঙ্ঘ্রি-যুগ্মেন জগদ্বিধাত্রীং
সমাশ্রয়ে মাতরমন্নদাত্রীম্॥

মর্ম্মার্থ।

ভব-সিন্ধু তরিবারে আর সুখে হরিবারে
অন্তিমে এ বার্দ্ধক্য-সময়
শরণ করেছি সার তব পদ-তরী আর
তারিণীর চরণ অভয়।

অন্য স্তবেও এইরূপে পুনঃ পুনঃ চাহিয়াছেন,

স্থানং দেহি বিধেহি দেহবিরতিং ভো বিশ্বনাথ প্রভো॥

মর্ম্মার্থ।

বিশ্বনাথ! স্থান দিও চরণে তোমার,
নাহি হয় যেন দেহ ধরিতে আবার।

নিজের সেই অভিলাষ-পূরণের জন্য কোথায়ও বা অন্নপূর্ণার স্তবে বলিয়াছেন,

কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণাং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

মর্ম্মার্থ।

কৃপাময়ি! ত্রিজগতে তুমি মা শরণ
বাঞ্ছা মম কৃপা করি' করিও পূরণ।

আবার এই ভাবে কামনা করিয়া কখনও বা মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সেকালে লিখিয়াছেন,

বাধা-বেদনমিব কর্ত্তুমুচিতং ভৃত্যস্য ভর্ত্তুঃ পদে
স্তোকস্যাপিচ কস্যচিচ্ছুভফলস্যানীপ্সিতী প্রার্থনা।
লুব্ধত্বাদিক-দোষ-দূষিততয়া যৎ প্রার্থিতং ভো প্রভো
ক্ষাম্যৈতৎ পরমাপরাধমধমে কৃত্বা কৃপালোকনম্॥

মর্ম্মার্থ।

আছে যাহা ব্যথা সে দুখের কথা
প্রভুর চরণ তলে
দাসের উচিত করিতে বিদিত
শুধু নিবেদন-ছলে।
"প্রভো দাও" বলে' মনোমত ফলে
কামনা উচিত নয়,
বাধা নিবেদিব পেতে হয় পাব
দাস র'ব তাঁরি পা'য়।
আমি লোভ-ভরে "দাও দাও" করে'
কতগো কামনা করি,
সে ভীষণ দোষ ক্ষম' আশুতোষ
করুণা-নয়নে হেরি'॥

কাশী গিয়া দেব-স্থান দর্শন করতঃ এইরূপ নানাবিধ স্তব রচনা করিতে লাগিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় আজীবন গঙ্গাতীর-বাসী। তিনি কাশীবাস করিলে পর কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুনা গিয়াছিল, গঙ্গামাহাত্ম্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিশ্বাস বুঝি কম।

ন্যায়রত্ন মহাশয় গঙ্গামাহাত্ম্যে কিরূপ বিশ্বাসী, তাহা তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। সকল দেব দেবীর দয়া অপেক্ষা গঙ্গার দয়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয় চিরকাল অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত গঙ্গাস্তব সমূহেও সেই বিশ্বাস পূর্ণ ভাবে প্রকটিত। স্তুতি-মালার একস্থানে পার্ব্বতীর সহিত তুলনা করিয়া গঙ্গার দয়া এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,

সগর্ব্বা সর্ব্বাণী ভব-হৃদয়বাসাৎ বসুধাং
যৈষা নো পশ্যেৎ পতিতমিতি মাত স্তব পদে।
প্রপন্নোঽহং যত্ত্বং হরশিরসি বাসেঽপি বরদে
জগন্নিস্তারার্থং ভ্রমসি বসুমত্যাং দিশি দিশি॥

মর্ম্মার্থ।

ওমা গঙ্গে বল সতি পার্ব্বতীর একি রীতি
নিজ গর্ব্বে সদা গরবিণী,
সন্তান পতিত হায় তারে না উঠাতে চায়
মৃত্তিকায় নামে না ভবানী।
আছে সে, শিবের বুকে এত গর্ব্বে তাই থাকে
ধরাতলে পড়ে না নয়ন.
যবে তোমা পানে চাই মহিমার সীমা নাই
ওমা গঙ্গে করি বিলোকন।
মস্তকে রাখেন ভব গর্ব্ব তবু নাই তব,
নিস্তারিতে পতিত-সন্তানে—
ধরণীর চারিধার ঘুরিতেছে অনিবার
আশ্রিত মা এ দাস চরণে॥

যে সুরধুনীর জলে "মৌসল-স্নানও" মহাপাতক নাশ করে, তাহার তুল্য তীর্থ অন্য কুত্রাপি সম্ভবে না, এ বিশ্বাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বদ্ধমূল। তাই ভক্ত মায়ের নিকট বলিতেছেন,

भवत्सेवां गङ्गे त्रिजगदघभङ्गेऽति सुकरां
विमुञ्चन् यो लब्धुं फलमपरतीर्थान्यनुसरेत् ।
ध्रुवं किं नो तस्याखिल सुफलदातुः सुरतरो
स्थलं त्यक्त्वासक्ति विटपिनिचये कण्टकमये ॥

মর্ম্মার্থ।

স্নান কর' ক্লান্ত হ'লে সুশীতল গঙ্গা-জলে
পিপাসায় পান কর' বারি
এ হ'তে সুখের কিবা বিনা ক্লেশে তোর সেবা
হ'তে পারে হে জহ্নু-কুমারি।
হেন সেবা যদি নরে চতুর্ব্বর্গ দিতে পারে
অন্য তীর্থে ক্লেশ যা'রা চায়
তারা কল্পতরু ছেড়ে ঘোরে না কি ফল-তরে
কণ্টকিত তরুর তলায়?

ন্যায়রত্ন মহাশয় গঙ্গার একান্ত অনুরাগী। কাশীতে যে স্থানেই মৃত্যু হোক, শাস্ত্রমতে মোক্ষ-ফল অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সেখানেও অনুরাগ-ভরে ন্যায়রত্ন মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরস্থ করাইবার জন্য সকলকে উপদেশ করেন। কাশীবাসের পর তাঁহার কতিপয় আশ্রিত-জনের কাশী-লাভ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে তীরস্থ করিয়াছিলেন। নিজের বিষয়েও লিখিয়াছেন,

কদাবাসং কুর্ব্বে জননি তব গর্ভে ত্রিপথগে
যতো গর্ভে বাসো ন ভবতি পুনঃ শম্ভু-সুভগে।
যতো জীবন্ ভোজ্যেঽমৃতমপি মৃতো প্রাপ্যমমৃতং
মথিত্বা ক্ষীরাব্ধিং ন যদমরবর্গৈ রধিগতম্॥

মর্ম্মার্থ।

ত্রিপথ-গামিনি গঙ্গে হ'বে বাস ভবে রঙ্গে
তোর গর্ভে কবে নিস্তারিণি,
ক'রে তোর গর্ভে বাস ঘুচে যাবে গর্ভে বাস
কত দিনে শম্ভু-সোহাগিনি।
যতেক চৈতন্য রয় সলিল অমৃতময়
অধরেতে দিবে বন্ধুজন,
চৈতন্য হইলে গত পা'ব মোক্ষ কি অমৃত,
ভবে আসা হ'বে বিসর্জ্জন।
অমৃত লাভের তরে অমর যতন করে'
ক্ষীর-সিন্ধু করিল মন্থন,
লাগে যে অমৃত পাবে কভু না দেবতা সবে
অমৃত না পেয়েছে তেমন।

গঙ্গাতীরবাসীদের জন্য শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে "গঙ্গাতীরং পরিত্যজ্য যেঽন্যতীর্থাভিলাষিণঃ। ব্রহ্মহত্যা ফলং তস্য সততং সংশয়াত্মনাম্॥" অর্থাৎ গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া যে সকল সন্দিগ্ধ ব্যক্তি অন্য তীর্থ বাস অভিলাষ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মহত্যার ফলভাগী হন। গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে হয় না বলিয়াই গঙ্গাতীর-বাসীরা কাশীবাস করিয়া থাকেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও সেই হেতুই কাশীবাস

করিয়াছেন, মায়ের নিকট কুণ্ঠিতভাবে পুনঃপুনঃই ইহা নিবেদন করিয়াছেন দেখা যায়। স্তবের মধ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন,

चिरं भृत्यो भूत्वा जननि तव सेवामनुदिनं
मुदाकार्षं बाल्यावधि विबुधसिन्धो तव यदि ।
स्थितिर्नासीदस्यामवसमिह काश्यां नहि तदा
पराधः क्षाम्यस्त्वम्मयि सविनये जह्नुतनये ॥

মর্ম্মার্থ।

জনমিয়া এই ভবে চিরকাল ভৃত্য-ভাবে
তব সেবা করেছি জননি,
বাল্যাবধি সেবা করে' ছিনু কি আনন্দ-ভরে
ওমা গঙ্গে পতিত-পাবনি।
কভু মা তোমার দাস করিত না কাশীবাস
তব স্থিতি না হ'লে হেথায়
অতএব সুরধুনি শুন মা বিনয়-বাণী
অপরাধে ক্ষমিও আমায়।

ন্যায়রত্ন মহাশয় মায়ের নিকট কুণ্ঠিত ভাবে নিজের কাশীবাসের হেতু আরো এক স্থানে এইরূপে জানাইয়াছেন,

कृतं काशीक्षेत्रं त्रिपुररिपुणा त्वत्प्रणयिना
वितन्तुं कीटायाप्यमृतमयमिष्टं कृतवते ।
तदस्मिन् हे मातः पतितजनतया त्वत्वमपि ते
परप्रीतिस्थानं तदिदमिति मत्वा समगमम् ॥

মর্ম্মার্থ।

আসি মা কাশীতে আমি যেহেতু তোমারি স্বামী
কীটেরেও মোক্ষফল দিতে
করেছেন এই পুরী তুমি সীমন্তিনী তাঁরি,
স্বত্ব তব আছে মা কাশীতে।
হেন বারাণসী 'পরে ওমা গঙ্গে হ'তে পারে
কখন' কি অপ্রীতি তোমার,
আগে সব চিন্তা করে' পরে কাশীবাস তরে
নিস্তারিণি এসেছে কিঙ্কর।

"অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ং। কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনং॥" অর্থাৎ এই অসার সংসার. ইহাতে কাশীবাস, সৎসঙ্গ, গঙ্গাজল ও শম্ভুর সেবা এই চারিটী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাদিগের সার পদার্থ। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শেষ জীবনে চারিটীরই সংঘটন হইয়াছে। কাশীতে তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। কাশীর মৃত্তিকাতে তিনি অনন্য-সাধারণ ভক্তি করিয়া থাকেন। পথ চলিয়া আসিয়া আহার কিম্বা পূজা করিতে হইলে. তিনি কাশীতে পদধৌত করেন না। পূজা সন্ধ্যা করিবার সময় মুক্তিক্ষেত্রের ভূমি জল দ্বারা ধৌত করিয়া লন না। পাছে কাশীতে কোনও অপরাধ হয়. সেই ভয় তাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা জাগরূক। দেবস্থানে শিবদর্শন করিতে গেলেই বিহ্বল হইয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করতঃ পাঠ করেন,

वैकुण्ठादपि वेधसोऽपि नगरात् पुना मघोनः पुरात्
काशीयं तव देवदेव विवुधै र्यत्र स्थितिः प्रार्थ्यते।
वैधावैध मजानतोऽत्र वसतो दासस्य दोषः प्रभो
क्षन्तव्यः कृपया निवेदनमिदं शम्भो पदाम्भोरुहे॥

মর্ম্মার্থ।

বিষ্ণুপুরী ব্রহ্মপুরী ইন্দ্রপুরী কিবা
পবিত্র কাশীর মত ত্রিভুবনে কেবা!
হেন মোক্ষভূমি পা'বে অন্যত্র কোথায়
মুক্তি তরে কাশী তাই দেবতাও চায়।
তুমি গো দেবের দেব, তব এই পুরে
তোমার এ দাস-দাস, এসে বাস করে।
কিবা বৈধ কি অবৈধ নাহি তার জ্ঞান,
দাস বলে' ক্ষমা কর' করুণা-নিধান॥

যেরূপ কাশীভক্তি সেইরূপ শিব-প্রেমের সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস আরব্ধ হইল। সেই শিব-প্রিয় ভূমিতে শিব-প্রীতি কামনা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম-কার্য্য তাঁহার নাই। পুণ্যতিথিতে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে সংকল্পে শিব-প্রীতি কামনা, দুর্গোৎসবের সংকল্পে শিব-প্রীতি কামনা, শ্যামাপূজার সংকল্পে শিবপ্রীতি কামনা, রাস রথে বিষ্ণুপূজা করিতে হইলে শিব-প্রীতি কামনা, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে পূর্ব্বপুরুষগণের উপর শিব-প্রীতি কামনা, আবার পুণ্যকার্য্য সকল সমাপন করিয়া তাহার ফল মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবোদ্দেশে সমর্পণ। এইরূপ শিব-প্রীতির সহিত শিব-প্রিয় ভূমিতে বসিয়া শিব-প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় সকল জীবকে শিব-মাহাত্ম্য বুঝাইতেছেন,

बालं व्याल-जलानलादि-भयतस्त्रातः शिवस्त्रायते
दुग्धस्यापि शिशु-प्रसू-स्तनयुगे सृष्टा शिवो रक्षति।
हन्ति श्रीशिव एव सर्व्व समये भक्तस्य सर्व्वापदं
तद् भोजीवशिवःशिवः शिव इति ध्याने धरा पूर्य्यतां॥

মর্ম্মার্থ।

ওহে জীব শিশুকালে যখন অবোধ ছেলে
নাহি চেনে অগ্নি-সর্প-জল,
কতই ভয়ের কথা, কৃপালু জগৎপিতা
শিব তারে বাঁচান কেবল।
শৈশবে পালন তরে শিশু-মাতৃ-পয়োধরে
দুগ্ধ-ধারা রক্ষা করে শিব,
ভক্তের বিপদ্ যত সেই শিব অবিরত
নাশিছেন শুন ওহে জীব!
কৃপা কি কহিব তাঁর মূর্ত্তি তিনি করুণার
বিশ্বে আর তুলা নাহি মেলে,
ওহে জীব উচ্চৈঃস্বরে শিব শিব ধ্বনি করে'
ধরাধাম পূরাও সকলে॥

श्रौतैः शोधितचेतसामिव सुरापाणां सुरद्वेषिणां
निस्ताराय परां पुरीं व्यरचयत् काशीं पुरारिः पुरा।
तस्मान्मित्र परत्रचापि परमं मित्रं शरण्यं शिवं
ज्ञात्वा नित्यशिवार्चनैः शिव शिवध्याने दिनं याप्यतां

মর্ম্মার্থ।

কি অদ্ভুত কৃপারাশি, সুরাপায়ী, সুরদ্বেষী,
না গণিয়া অধার্ম্মিক জীব,
অতি ধার্ম্মিকের প্রায় মুক্তি দিতে সে সবায়
বারাণসী রচিলেন শিব।
অতএব শুন মিত্র কিবা ইহ কি পরত্র
একমাত্র বন্ধু জেনে শিবে,

নিত্য শিব আরাধিয়ে শিব শিব উচ্চারিয়ে
দিন যাপ' অনিত্য এ ভবে ॥

व्यर्थं बन्धुजनेन कालहरणं व्यर्थश्च वित्तार्ज्जनं
व्यर्थश्चापवनं विचित्रभवनं सीमन्तिनोसेवनम्।
गत्वातः शिवभक्तसाधुसविधं धृत्वा तदीयं पदं
श्रुत्वा तद्वदनात् सुधासमशिवाख्यानं दिनं यापय ॥

মর্ম্মার্থ।

বৃথায় বান্ধব সহ কাল যাপ' অহরহ
ব্যর্থ তব অর্থ উপার্জ্জন,
ভবন কি উপবনে কিম্বা সীমন্তিনীগণে
চিন্তা সদা কর অকারণ।
শুন মিত্র মোর কথা শিবভক্ত-সাধু যথা
গিয়া তথা, ধরে' তাঁর পায়,
সাধুমুখ-বিগলিত শিবের চরিতামৃত
শুনে দিন যাপহ ধরায় ॥

प्रीतिः पुत्र कलत्र मित्र निकरैर्वित्तागमैः कर्हिचित्
क्लेशः कर्हि धनक्षयाच्च निधनाद् रोगादि भोगात्तथा।
इत्थं जागतिकी गतिर्वसुमतीजातेषु जागर्ति तन्
नित्यं सस्वर चित्त चिन्मय-भवे ज्ञानार्णवे मज्जितुम् ॥

মর্ম্মার্থ।

পত্নী পুত্র মিত্র ল'য়ে আছি আনন্দিত হ'য়ে
বিত্তাগমে নাহি ধরে প্রীতি,

পীড়া মৃত্যু সে সবার তুলে দিল হাহাকার
অকস্মাৎ হ'ল বিত্ত-ক্ষতি।
এই আনন্দের শেষ এখনি দারুণ ক্লেশ
স্থির কিছু নহে এই ভবে,
জ্ঞানদাতা জেনে তাঁরে চিন্ত' রে চিন্ময় হরে
মগ্ন যদি হ'বে জ্ঞানার্ণবে ॥

ভগবানের অন্যমূর্ত্তির বিদ্বেষ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় শিবনাম করিতে বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন,

भूतं भावि च वर्त्तमानमपि यस्योत्पादनं पालनं
तत् सर्व्वस्य शिवेन जात्वपि शिवाद् विश्वस्य विध्वंसनम्।
तन्मूर्त्तित्रितये विराजित-शिवस्याख्यां विमोक्षप्रदां
बम् बम् बम् रुचिरामुच्चैः समुच्चारय ॥

মর্ম্মার্থ।

সৃজন পালন লয় শিব হ'তে সবি হয়
বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যতে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শিব (ই) সে ত্রিমূর্ত্তিধর
এ বিশ্বাস সদা রেখে চিতে,
উকার অকার আর মকারে গঠিত তাঁর
মোক্ষকর সুপবিত্র নাম
কভু বল বম্ বম্ কখন' বলরে ওম্
পূর্ণ হোক্ নামে ধরাধাম ॥

ভক্ত মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি প্রার্থনীয় সামগ্রী। মুক্তি ভক্তির দাসীমাত্র। নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিরসে আপ্লুত

থাকিতে পাইলে, ভক্ত পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি সুতরাং ঘটিয়া থাকে। ন্যায়রত্ন মহাশয় মুক্তিতে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াও কোন' কোন' সময় ভক্তিরই কামনা করিয়াছেন দেখা যায়। যথা,

ন জ্ঞানং ন ধনং নবা প্রিয়জনপ্রীত্যৈ দিনক্ষেপণং
শোকাগ্নিঃ সততং গতং চিরমহ ক্লেশেন মজ্জীবনম্।
তস্মাত্তারয় মাং প্রদায় পরমাং ভক্তিং পরিং প্রভো
যত্ত্বদ্ভক্তিমৃতে পিতঃ পশুপতে শ্রেয়োঽপি নো মে প্রিয়ং॥

মর্ম্মার্থ।

না হইল জ্ঞান-লাভ, না লভিনু ধন,
সন্তোষিতে না পারিনু প্রিয় পরিজন।
সদা শোক তাপ প্রাণে সহি' অনিবার,
ক্লেশেতেই কেটে গেল জীবন আমার।
ও চরণে ওহে প্রভো, ওহে সারাৎসার,
ভক্তি দিয়া দুঃখ যত ঘুচাও আমার।
ভক্তি ভিন্ন অভিলাষ কিছু নাহি চিতে,
মুক্তি নাহি চাই আমি পিতঃ পশুপতে॥

প্রাচীন মহর্ষিগণের কবিতা সকল অন্বেষণ করিলেও, এমন সরল পবিত্র ভাষায় একাগ্র ভক্তি প্রকাশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ ঋষিকল্প ব্যক্তির চিত্তে যে সাহস থাকা সম্ভব, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তাহা পূর্ণ মাত্রায়ই আছে দেখা যায়। তিনি দম্ভের সহিতই লিখিয়াছেন,

তস্মাদহম্মনুদিনং শিবশঙ্করেতি
গৌরীশ্বরেতি ভবভীতিহরং হরেতি।
অর্চ্চামি নৌমি চ ভবং প্রণমামি নিত্যং
ভীতিস্তমাস্থি যমনামমনাগপীতি॥

মর্ম্মার্থ।

শিবনাম প্রতিদিন করি উচ্চারণ,
শঙ্কর শঙ্কর করি করিয়া যতন,
ডাকি ভব-ভীতি-হরে
নিত্য হর হর করে'
গৌরীশ্বর নাম করি প্রত্যহ গ্রহণ,
নিত্য পূজা করি শিবে,
স্তব করি ভক্তি ভাবে,
প্রত্যহ প্রণাম করি স্মরিয়া চরণ,
কিবা ভয়, কি করিবে আমারে শমন॥

যেখানে বিদ্যার আদর, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা, সেইখানেই ন্যায়-রত্ন মহাশয় পণ্ডিতগণের চিত্তে চিত্তে উজ্জ্বল-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান। তাঁহার কাশীবাসে কাশীবাসী সকল ভদ্রলোক আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তৈলঙ্গীয়, মহারাষ্ট্রীয়, মিথিলাদেশীয়, বঙ্গদেশীয় যত অধ্যাপক কাশীতে আছেন সকলেই একান্ত শ্রদ্ধা সহ সম্মান করিলেন। ৺বিশুদ্ধা-নন্দ প্রমুখ বিদ্বান্ সাধুগণ, কাহারও নিকট পরিচয় দিতে হইলে "গৌতম কণাদ কী মূর্ত্তি" এই সকল মধুর বাক্যে পরিচয় দিয়া এবং নানা রকমে আদর করিয়া ক্রমশঃ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বদেশ-মমতা লাঘব করাইতে লাগিলেন। যে শ্রদ্ধা বাঙ্গালীর হৃদয়ে হৃদয়ে ন্যায়রত্ন

মহাশয় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহার উপর সেই শ্রদ্ধা যে বিশ্বজনীন ইহাই নিরবধি অনুভব করাইবার জন্য যেন শ্রীশ্রী৺ বিশ্বনাথ তাঁহাকে কাশীবাস করাইলেন। কাশী হইতে পণ্ডিতগণের কোন' মতামত প্রকাশিত হইলে অগ্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম, কাশীর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় অগ্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বাক্ষর, কাশীর হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী-সাধারণ শাস্ত্রীয় সভায় ন্যায়রত্ন মহাশয় সভাপতি, রাজা মহারাজগণের নিকট কোনও উৎসবোপহার প্রেরণ করিতে হইলে অগ্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিতা। কাশী-সমাজ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্ভ্রমে পূরিয়া গেল। তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ নহে। সূর্য্যাস্ত হইলে সূর্য্যের দ্যুতির হ্রাস হয় না। জগতের এক ভাগে অন্ধকার হইয়া অন্য ভাগ আলোকিত হয় মাত্র। ছাত্রবৃন্দের বিদ্যা-চর্চ্চায়, ক্রিয়াকর্ম্মের সমারোহে, নানাস্থান হইতে গুরুদর্শনাভিলাষী শিষ্যশাখার গতায়াতে, সংস্কৃত উপাধিপ্রার্থী সুশিক্ষিত যুবকগণের সদালাপে, ব্যবস্থা-জিজ্ঞাসু ভদ্রসন্তানগণের সমাগমে, তাঁহার গৃহে কাশীতেও নিত্যোৎসব। সেখানেও বলিষ্ঠ যুবকের সামর্থ্য অবলম্বন করিয়া রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত ছাত্র লইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সমানে পরিশ্রম করিতে হয়। তিনি ঐ কার্য্যকে চিরদিনই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ করেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেকগুলি পুত্রকন্যাবিয়োগ ও পত্নী-বিয়োগ নিবন্ধন অনেক সময় শোক পাইয়াছেন। নূতন শোক পাইলে মনুষ্যকে বিকল করে ও মানসিক তেজঃ তৎকালে হ্রাস হয়। অধ্যাপনা ও অন্যান্য কার্য্য সকল তখন লোকের ভাল লাগে না। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিয়ম স্বতন্ত্র। তিনি যখনই শোক পাইয়াছেন, বলিয়াছেন "আমি আজীবন সরস্বতীর সেবা করিতেছি,

শোক-চিন্তা অপেক্ষা শাস্ত্র-চিন্তা করিবার যদি আমার অধিক ক্ষমতা থাকে, তবে শোক-চিন্তা নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।” এই বলিয়া সেই সকল সময়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যাপনা করিয়াছেন ও সকল শোক পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রোগের যন্ত্রণায় আকুল আছেন এমন সময়ে নিকটে ছাত্র দেখিতে আসিলে ন্যায়শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়া ন্যায়রত্নমহাশয় তর্ক করিয়াছেন বহু সময়ে দেখা গিয়াছে। ভট্টপল্লীতে থাকিতে যশোহর জেলান্তর্গত ইতিনা নামক কোনও স্থানে আহূত হইয়া একটী সভা উপলক্ষে কোনও সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় গমন করেন। কিন্তু সেখানে গিয়া এতই পীড়িত হন যে, সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সভায় তাঁহার এক ছাত্র উপস্থিত হন, এবং সেই ছাত্রের সহিত সভা-ক্ষেত্রে শক্তিবাদের ‘সর্ব্ব’শক্তি বিচার-প্রকরণে পণ্ডিত-গণের এক বিচার হয়। সে সভায় বহুতর বিদ্বান্ অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রার্থটীর ভালরূপ মীমাংসা হইল না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্রটী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সভার সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়া দেখিলেন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখ রক্তবর্ণ, সময়ে সময়ে প্রলাপ বকিতেছেন। তখন তাঁহার ১০৫॥ ডিগ্রী জ্বর। সেই অবস্থাতেও তিনি সভার কথা, শাস্ত্রার্থের কথা, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সভায় সদুত্তর হয় নাই শুনিয়া সেই বিকারাবস্থায় চিন্তা করতঃ শাস্ত্রার্থের মীমাংসা করিলেন। ইতিনায় সমাগত পণ্ডিতেরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্রের নিকট ঐ উত্তরটী শ্রবণ করিয়া, সকলেই সদুত্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিপদ্, আপদ্, আধি, ব্যাধি, সকল সময়েই ন্যায়রত্নমহাশয়ের শাস্ত্রচর্চ্চায় উৎসাহ দেখা যায়।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপ গৌরবে গৌরবান্বিত তাঁহার শরীরও তদনুযায়ী মহাপুরুষোচিত। পরিচ্ছদ-আড়ম্বর তাঁহার কিছুমাত্র নাই। সাদা ধুতি-চাদর ও কটকি-জুতা তাঁহার সর্ব্বদা ব্যবহারের সামগ্রী। কখনও কখনও গরদের বস্ত্র ও গরদের উত্তরীয় বা নামাবলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত, শীতকালে একখানি কাশ্মীরি-শাল অথবা আলোয়ান গাত্রে থাকে। কিন্তু এই গুলি এবং ব্যবহৃত যজ্ঞোপবীতটী সর্ব্বদাই নিতান্ত পরিষ্কার চাই। তাঁহার পরিচ্ছদাড়ম্বর না থাকিলেও শরীরের মধ্যে এমনই প্রচ্ছন্ন জ্যোতিঃ ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার স্ফুরণ আছে যে, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন মহা আড়ম্বরে বসিয়া আছেন। তাঁহার চন্দন-রেখাঙ্কিত পবিত্র ভাল-দেশ দর্শন করিলে ব্রহ্মণ্যদেবের লীলা-ভূমি বলিয়া অনুমিত হয়। সুদীর্ঘ অবয়ব, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, বিশাল বক্ষঃ ও আজানুলম্বিত ভুজ তাঁহাকে কলির মনুষ্য বলিয়া বোধ করিতে দেয় না। তাঁহার অবয়বে মহাপুরুষের উপাদান এরূপ বিরাজিত যে, বহুলোকের সহিত গমন করিলেও যে কোনও ব্যক্তির দৃষ্টি তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইবে, এবং কোনও সভায় উপবেশন করিলে তাঁহার সহিত অপরিচিত ব্যক্তিগণও নিঃসন্দেহে বলিবে "সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ঐ বসিয়া আছেন!" সমাগত কোনও ব্যক্তিকেই ন্যায়রত্ন মহাশয় অপ্রিয়-বাক্যে অনাদর করেন না। তথাপি তাঁহার শরীরের মধ্যে এমন একটী গাম্ভীর্য্য ও তেজস্বিতা বিদ্যমান যে, কপট, প্রতারক, পাপিষ্ঠ ও নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ কস্মিন্‌-কালে তাঁহার পার্শ্বে দুই দণ্ডকাল উপবেশন করিতে সাহস করেনা। তিনি ঘোর চিন্তাশীল হইলেও, চিন্তাশক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার অধীনে কার্য্য করে। এক বিষয়ের চিন্তাস্রোতে পড়িয়া, অন্য বিষয়ের নাশ তাঁহার হস্তে কস্মিন্‌ কালে হইতে পায় নাই। অতি ক্ষুদ্র কার্য্যেও

তাঁহার অন্যমনস্কতা বা অনবধানতা নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষতঃ প্রবল নৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রত্যেক কার্য্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় অক্ষুব বা অবধান আর কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না।





অষ্টম পরিচ্ছেদ।



অভেদ বুদ্ধিতে উপাসনা। দীক্ষার প্রয়ো-
জনীয়তা। তন্ত্রদ্বেষিগণের প্রতি উপদেশ।
তন্ত্রের মীমাংসা ও বীরাচারে
দোষশ্রুতি।

ভগবানের সকল মূর্ত্তিকেই ন্যায়রত্ন মহাশয় সমান শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু, শক্তি, শিব প্রভৃতিতে ভেদ-বুদ্ধি করিলে শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মহানি হয়। শিবদ্বেষী বৈষ্ণব, বিষ্ণুদ্বেষী শাক্ত, শক্তিদ্বেষী বৈষ্ণব প্রভৃতিকে ন্যায়রত্ন মহাশয় উপদেশ দিতেছেন,

विष्णोरर्च्चं समाचरन्नपि चिरं विद्विष्य विश्वेश्वरं
यो द्विष्टापि च दुष्टचेतनदुराचारो जगन्मातरम् ।
मल्लाघातमतं विधाय दशनैर्दंष्ट्रा पुनश्चन्दने
रालेपादिकतुल्यमस्य किमुतस्यावैधमाराधनम् ॥

মর্ম্মার্থ।

শিবেরে বিদ্বেষ করে', দ্বেষ করে' কালিকায়,
অবিবেকী যে পামর বিষ্ণু আরাধিতে চায়,

নরাধম সে মানব, অতিশয় দুরাচার,
আরাধনা বৈধ নয়, শাস্ত্রমতে কভু তা'র।
হরি হর শক্তি কিবা, কিছুই বিভিন্ন নয়,
এক সে ব্রহ্মের মূর্ত্তি, সবি বপুঃ ব্রহ্মময়।
শত শত অস্ত্রে হেনে, দহনে জ্বালায়ে কায়,
চন্দনের আলেপন, যতনে করিলে তায়,
যেই প্রীতি হ'তে পারে, সেই প্রীতি ভগবান্,
শক্তি শিবে দ্বেষ করি', বিষ্ণু আরাধিলে পান ॥

দীক্ষা হিন্দুসন্তানের অতি আবশ্যকীয় সামগ্রী। এ বিষয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপদেশ সকল বিশেষ উপকারী বিবেচনায় দীক্ষা বিষয়ে এস্থলে কিছু আলোচিত হইতেছে। সাধারণতঃ দীক্ষা দুই প্রকার। বৈদিক ও তান্ত্রিক। শূদ্র এবং স্ত্রীলোক হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত যাবতীয় হিন্দু, শাস্ত্রানুসারে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য। অদীক্ষিত হিন্দুসন্তানকে, মৃত্যু হইলে রৌরব নরকে গমন করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রের আদেশ। এজন্য অদীক্ষিত ব্যক্তির মৃত্যু-সম্ভাবনা ঘটিলে, অন্ততঃ মুমূর্ষু অবস্থায়ও তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। অদীক্ষিতা স্ত্রীলোক ব্রত-নিয়ম-শ্রাদ্ধাদি কিছুতেই শাস্ত্রানুসারে অধিকারিণী নহেন। অদীক্ষিতা নারী, দেবতা ব্রাহ্মণের অন্ন রন্ধন বা স্পর্শ করিলে পাপভাগিনী হন। এতদ্ব্যতীত বৈদিক দীক্ষাও স্ত্রী-শূদ্র ব্যতীত অন্যান্য জাতিকে গ্রহণ করিতে হয়। এক্ষণে কাল-মাহাত্ম্যে ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ লোকের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইতেছে। সামাজিক বন্ধন বশতঃই মাত্র বৈদিক দীক্ষাটী ব্রাহ্মণ-সাধারণের আজও সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিক্ষা ও কালজনিত উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিসমূহ চিত্তে উদ্দীপ্ত হইবার পূর্ব্বে বাল্যকালেই উপনয়ন সম্পন্ন

হইয়া যায় বলিয়াই, বোধ হয় বালকগণের মুখে কোনও রূপ স্বাধীনতা-পূর্ণ বিতণ্ডা ঐ কার্য্যে শুনা যায় না। কিন্তু যৌবনোদ্গমে বুদ্ধিবৃত্তি ও তর্কানুসন্ধান যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন কাহাকে কাহাকেও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। অপর কেহ কেহ যজ্ঞোপবীতটী রাখিয়া তান্ত্রিক দীক্ষাটীর উপর পরাক্রম প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে এই দাঁড়ায়, হিন্দু-শাস্ত্রের বেদ নামক সামগ্রীটা পুরাতন, তন্ত্রটা আধুনিক। পিতা পিতামহের আচরণ, সকল সময়ের মহাজনগণের আচরণ, স্বদেশের চিরানুষ্ঠিত আচরণ পরিত্যাগে তাঁহাদের সাহসও ধন্য, আর সকল সময়ের সকল বুদ্ধিমান্ অপেক্ষা তাঁহারা অধিক বুদ্ধিমান্, এ অভিমানও ধন্য!! আমি বা একটু সংস্কৃতানুশীলন করিয়াছি, তুমি বা একটু ইংরাজি পড়িয়াছ; লৌকিক বিষয়ে দু'টো যুক্তির কথা বলিবার তোমার আমার কিছু সামর্থ্য হইয়াছে, তাই বলিয়া, আগম নিগমে কোনও মতামত প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বন্ধুভাবে আমাদিগকে বুঝাইতেছেন,

कृत्ये पूर्व्व-परम्परा-प्रचलिते श्रद्धां परामाश्रयन्
श्रौतं तन्त्रगतं समाचर समौ विज्ञाय वेदागमौ ।
तत्त्वातत्त्वनिरूपणं जड़मते शास्त्रे न ते शोभते
रूपं तव परत्र नेति च सर्व्वं नान्येन सन्धीयते ॥

মর্ম্মার্থ।

আগম নিগমে উক্ত অনুষ্ঠান যত
পিতা পিতামহ শ্রদ্ধা করিতেন কত।

পূর্ব্ব-পুরুষের পূত পদচিহ্ন ধরি'
চলিও জীবন-পথে দিবস-শর্ব্বরী।
শ্রদ্ধা কর' তুল্যভাবে কি আগম বেদ,
জড়বুদ্ধি অনুসারে করিও না ভেদ।
সুকঠিন তত্ত্বাতত্ত্ব নিরূপণে তব,
হে সুহৃদ্! নাহি শোভে যুক্তি অভিনব।
এ জনার আছে রূপ, ও' জনার নাই,
অন্ধে কি সন্ধান তার পেতে পারে ভাই?

ধর্ম্মকার্য্যে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য কি মধুর উপদেশ! বেদের আদেশ, শিবের আদেশ, ঋষির আদেশ, সকলই হিন্দুসন্তানের প্রতিপাল্য শাস্ত্র। কেবল পরস্পরের বিরোধি অংশ দৃষ্টি করিলে সঙ্কোচাদির দ্বারা সেই বেদ পুরাণ তন্ত্রের এরূপ মীমাংসা করিতে হয়, যাহাতে কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসারে হিন্দুসন্তান পাপভাগী না হন। এইরূপ মীমাংসা ও শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে পঞ্চ 'মকার' সেবারূপ কএকটী অতি অকার্য্য অনেক স্থানে হিন্দু সন্তানের মধ্যে গুপ্ত ভাবে প্রচলিত আছে। ইহাতে যে শুধু তাঁহাদেরই অনিষ্ট হইতেছে, এমন নহে। পূর্ব্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করিবার অভিলাষে যদি অধস্তন বংশধরেরাও ঐরূপ ক্রিয়া করিতে থাকেন, তবে দশ পনর পুরুষ নিয়ে এক এক জনের অপরাধে দুই দুইশতের অধিক সন্তান সেই কার্য্যে লিপ্ত হইবেন। এখনও এমন বংশ আছে, যাহাতে কুলাচার বলিয়া বংশাবচ্ছেদে ঐ কার্য্য চলিত। এক একজন পূর্ব্বপুরুষের আচার হইতে এইরূপ কত শত বিস্তৃত বংশে যে ঐরূপ কুলাচার গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। কাল-মাহাত্ম্যে মদ্য-মাংস-মৈথুনাদিতে স্বতঃই যাঁহাদের চিত্ত ধাবিত হইবার

কথা, তাঁহারা যদি কোনও রকমে শাস্ত্র সাধক দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল ভাব দমন করা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং শত শত স্থানের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, মীমাংসকগণের মীমাংসা অগ্রাহ্য করিয়া, আত্মকার্য্যের পোষক শাস্ত্রার্থ করিতে চিত্ত স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তন্ত্রের বিশেষ বচন সকল উপেক্ষা করিয়া, শ্রুতি স্মৃতি উপেক্ষা করিয়া, যেভাবে পঞ্চ 'মকার' সেবা হইয়া থাকে, তাহা ঘোর অবৈধ। কৃষ্ণানন্দ-ধৃত শ্রীক্রমীয় বচনে দেখা যায় "ন দত্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। বামকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥" কুলচূড়ামণিতে দেখা যায় "যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ। গুড়ার্দ্রকং তদা দদ্যাৎ তাম্রেবাপি সৃজেন্মধু॥" কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে "আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ। চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্য-মহোদয়। ব্যোম-পঙ্কজ-নিস্যন্দ-সুধাপান-রতোনরঃ। মধুপানমিদং দেবি চেতরং মদ্যপানকং। পুণ্যাপুণ্যং পশুং হত্বা জ্ঞান-খড়্গেন যোগবিৎ। পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশীতি নিগদ্যতে। মানসাদীন্দ্রিয়-গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ। মাংসাশী স ভবেদ্দেবি ইতরে প্রাণঘাতকাঃ। পরশক্ত্যাত্মমিথুন-সংযোগানন্দ-নির্ভরাঃ। মুক্তাস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥" কালীবিলাস তন্ত্রে ষষ্ঠ পটলে উক্ত হইয়াছে "সিধ্যন্তি পশুভাবে চ উগ্রসেনাদয়শ্চ যে। কংসশ্চ বসুদেবশ্চ পশুভাবে চ তৌ প্রিয়ে। অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ যুধিষ্ঠিরশ্চ তে প্রিয়ে। পশুভাবে সদা সিদ্ধা ন বীরদিব্যভাবয়োঃ। রুক্মিণী সত্যভামাচ দ্রৌপদী দেবকী তথা। দ্রোণাচার্য্যঃ কৃপাচার্য্যশ্চাশ্বত্থামা তথৈব চ। পশুভাবপরাস্তেতে সিদ্ধাঃ সিদ্ধা ভবন্তি চ। মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ। শ্মশান সাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেবচ। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং দিব্যবীরমতং প্রিয়ে। দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে। কলৌ পশুমতং

শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥” সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে “ন বিন্দোঃ পাতনং কার্য্যং কৃতে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥” দশম পটলে উক্ত হইয়াছে “ন মদ্যং প্রপিবেদ্ দেবি কলিকালে কদাচন। পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে। সত্যত্রেতাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং। ন কলৌ শোধনং মদ্যং নাস্তি নাস্তি বরাননে।” তন্ত্রের এই সকল বিশেষ বচনের মীমাংসা না করিয়া অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই মাত্র মদ্য-মাংস-মৈথুনে অনুরক্ত হন। রঘুনন্দন-প্রমুখ ধর্ম্ম-মীমাংসকেরা নানা প্রমাণাদি দর্শন করিয়া দীক্ষা-প্রকরণে সিদ্ধান্ত করিলেন “তস্মাৎ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধে বর্ত্মনি পদং ন ন্যস্তব্যং।” শ্রুতি রহিয়াছে “মদ্যমপেয় মদেয়মনিগ্রাহ্যং।” স্মৃতি বলিতেছেন “কামতস্তু সুরাং জগ্ধ্বা অগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ। তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥” মহাপাতকের মধ্যে উক্ত হইয়াছে “ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহু স্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥” মহর্ষিগণ, আপনারা যে আচারে চলিতেন, যাহা লোকের হিতকর, যাহা শাস্ত্রের মীমাংসা, সেই সমুদয়ই সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ঋষিগুণটি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনেও আমরা বিশেষ পরিমাণে দেখিতে-পাই। কোন্ আচারে চলা উচিত, প্রচলিত কোন্ বিষয় বা দোষকর, ন্যায়রত্ন মহাশয়ও বিপুল পরিমাণে সে সমুদয় কারিকাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে ঋষি-বচন স্বতঃকার্য্যকারী। ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজের বচনকে কার্য্যকারী করিবার অভিলাষে কোথাও সদৃষ্টান্ত, কোথাও যুক্তি, কোথাও বিদ্রূপের কঠোর কশাঘাত প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই তুল্য। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত বীরাচার-বিরোধী কতিপয় শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

धर्म्मश्चेत् परदारसङ्गकरणाद् धर्म्मः सुरासेवनात्
संपुष्ट्यै पशुमांसमत्स्य निकराहाराच्च हे वीर ते ।
हत्वा प्राणिचयस्य चेत् तव भवेत् स्वर्गापवर्गाप्तये
कोऽसत्कर्म्मतया तदा परिचितः स्यान्नेति जानीमहे ॥

মর্ম্মার্থ।

ধর্ম্ম যদি সঙ্গ করে' পর-পত্নী সনে,
ধর্ম্ম করা যায় লাভ যদি সুরাপানে,
মৎস্য-মাংস খেয়ে সদা দেহ-পুষ্টি করে'
তোমার জীবাত্মা যদি ধর্ম্ম লাভ করে,
জীব জন্তু হত্যা করে' যদি ওহে বীর
মোক্ষ কিম্বা স্বর্গ পা'বে জান তুমি স্থির,
না পাই খুঁজিয়া আর কোন্ কার্য্য তবে
অকার্য্য নামেতে আছে পরিচিত ভবে ॥

या योगीन्द्रहृदिस्थिता त्रिजगतां माता कृपैकवृता
सा तुष्येत्श्वपचीव किं पशुवधैर्मांसासवैत् सज्जनैः ।
तस्माद्वीरवरावधारय तदाचारस्य यद्बोधकं
रक्षोभिर्विरचय्य तच्च वचनं तन्त्रे प्रविष्टीकृतम् ॥

মর্ম্মার্থ।

বিশ্বমাতা নহে কভু চণ্ডালের নারী,
পশু, পক্ষী, কীট, নর সন্তান তাঁহারি।
সকল সন্তানে মা'র করুণা সমান,
পশুবধে তুষ্ট কভু নহে মাতৃ-প্রাণ।

যোগীন্দ্র-হৃদয় যাঁর প্রিয়তম স্থান,
হিংসা, দ্বেষ, তম কভু তিনি নাহি চান।
সেই সত্ত্বময়ী মায়ে ঘোর তমোভাবে
জীবহত্যা মন্ত্রে আর কেমনে তুষিবে!
সর্ব্বশাস্ত্র ঐক্য করে' বুঝ বিচক্ষণ,
নানা শাস্ত্রে নানা রূপ বেড়েছে বচন।
রাক্ষসেরা বুঝি কভু হ'য়ে বলবান্
তাদের আচারে দিতে শাস্ত্রের প্রমাণ,
পঞ্চ মকারের সেবা তন্ত্রে গেছে লিখে
শিব-বাক্য ভাবিও না তন্ত্রে লেখা দেখে॥

নো জ্ঞাত স্তপসি নবাজনি নতুর্নান্যোপকারায় বা
কিন্তু ত্বদ্‌ব্যসনায় কেবলমসৌ স্বর্থং সদা বর্ত্ততে।
তন্মাস্মৃন্ময়পিণ্ডবর্দ্ধিতনো: সংপুষ্টয়ে শ্বাদিবৎ
লব্ধ্বাচ্ছাগ মৃগাদি মাংসনিকরং মাস্নোদরং পূরয়॥

মর্ম্মার্থ।

না জানি কি কাজ তব দেহ পুষ্টি করে'
না কর সাধনা নাহি আস উপকারে।
শুধুই মিটাতে তব ব্যসনের সাধ,
নিরন্তর করিতেছ এত অপরাধ।
তব দেহ মৃৎপিণ্ড, অন্য কিছু নয়,
তাহার পোষণ তরে কুকুরের প্রায়,
ছাগ মৃগ আদি জন্তু খেয়ে নিরন্তর
পরিপূর্ণ করিও না বৃথা এ উদর॥

भो भ्रान्त त्वमनादिरन्तरहितः किन्त्वेष ते विग्रहो
नो ते तोषकरश्चिराय भविता नश्येदवश्यं कदा।
हित्वा धर्ममहिंसनं मुनिगणादिष्टं वपुः-पुष्टये
श्वादि व्याध इव प्रबोधविधुरो मा स्वोदरं पूरय॥

মর্ম্মার্থ।

ওহে ভ্রান্ত! ভ্রান্তি-বশে কি করিছ ভাই,
তুমি চিরস্থায়ী, তব আদি অন্ত নাই।
চিরকাল এই দেহ তোমা সনে থেকে,
এ হেন আনন্দ ভাই দিবে না তোমাকে।
অতএব নশ্বর এ দেহের কারণ
কর' না নিজের চির অহিত-সাধন।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ,
মুনিঋষি-বাক্যে ভাই করিয়া বিদ্বেষ,
দেহ-পুষ্টি তরে, যথা ব্যাধ কি কুকুর,
কর' না উদর-পূর্ত্তি বিবেক-বিধুর!

या शक्तिः शिववक्षगा पतिरता ख्याता सतीत्याख्यया
स्त्री रूपेण च सैव विश्वजननी सीमन्तिनी-पालिनी।
तन्नीत्वं न पराङ्गनासु गमनं द्रागेव तत्ते वने
तत्स्वाहीर कदापि मा कुरु तदाचारं शिवोक्तिभ्रमात्॥

মর্ম্মার্থ।

সদাই বসতি যা'র পতি-বক্ষঃস্থলে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যা'কে 'সতী' 'সতী' বলে;

সতীরে অসতী কর' সতীর সম্মুখে
এ আদেশ ওহে বীর তন্ত্রে নাহি লেখে।
লজ্জাহীনা বিবসনা ভ্রমিলে রমণী
কি ঘোর বিপদ্ সদা হেরিত ধরণী!
বিশ্বমাতা রক্ষিবারে সীমন্তিনীকুলে
লজ্জারূপে রহে নারী-হৃদয়-কমলে।
সতীকুল-শিরোমণি পতিবক্ষে রেখে,
ভামিনী-পালিনী সেই জননী-সম্মুখে,
সতীরে বিলজ্জ কভু করিও না বীর,
শিবোক্তি ভেবেছ যাহা, ভ্রান্তি তব স্থির॥

উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, মারণ প্রভৃতি উপায়ে লোকের অনিষ্ট সাধন করা তামসী সিদ্ধির ফল। তান্ত্রিক উপায়াদিদ্বারা ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতিতে সিদ্ধ হইলে ঐ সকল তামসী ক্ষমতা লাভ করা যায়। তামসী সিদ্ধি লোকের আশু মোহকরী। কিন্তু তাহা পরমার্থের উপচয় করে না। তাহা দ্বারা পাপরাশিই সঞ্চিত হইয়া থাকে। মদ্য-মাংস-মৈথুনাদি শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ উপায়ে ভগবতী-আরাধনা করিয়া যদি কোনও ক্ষমতা লাভ করা যায়, তাহাও পরমার্থ-সাধিকা নহে, মোহকর তামসীসিদ্ধি মাত্র। এ সম্বন্ধে কূর্ম্ম পুরাণ হইতে হিমালয়ের প্রতি দেবী-বাক্য, ধর্ম্ম মীমাংসক রঘুনন্দন যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাএই "যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানিচ। শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী। করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমাশ্রিতং। এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিতু।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ও কবিত্বযোগে ঐ শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন,

कर्त्तुं या प्रलयं तमोगुणमयं कायं वहाम्या। यदि तु
तन्मूर्त्तौ न दया क्रियास्त्वतिभया मद्यं च तस्मैव या
दृष्टं तामसमेव शिष्टनिचय-द्विष्टं सदा सम्भवं
दुष्टाचारपरं च काममखिलं तन्त्रं समुक्तीयताम्॥

মর্ম্মার্থ।

কভু মাতা ব্রহ্মাণ্ডের করিতে প্রলয়,
চরমে ধরেন কায় ঘোর তমোময়!
সে মূর্ত্তিতে নাহি দয়া, নহে ক্ষেমকরী,
ভয়ঙ্কর ক্রিয়া করি' ঘোরে ভয়ঙ্করী!
মদ্য পেলে সে মূর্ত্তিতে ভয়ঙ্কর ফল,
শিষ্টের বিদ্বিষ্ট অতি, তামস কেবল!
সে ভাবেতে পরমার্থ কিছুমাত্র নাই,
বীভৎস পৈশাচ ফল লভিবে সদাই।
সে ফল (ও) তন্ত্রের যদি হয় লক্ষ্যস্থল,
যে বচন পাও জেনো তন্ত্রের(ই) সকল॥

कदाप्याविर्भूता विकटदशना वीतवसनाऽ
सृगाक्तं मांसाद्यासव कवलनैर्लोलरसना।
रणोन्मत्ता हत्वाऽसुरसुरपि यन्नीरमुदिता
विधत्तां तन्त्रे वा प्रभवतु परं तामस-वचम्॥

মর্ম্মার্থ।

কখন বা আবির্ভূতা বিকট-দশনা,
দারুণ-বীভৎস-বেশা, বিগতবসনা!

রণেতে উন্মত্ত যাঁযা অসুর নাশিয়া,
শম্ভু-বক্ষঃ ছেড়ে নাচে হাসিয়া হাসিয়া!
আসব পানের তরে জিহ্বা সদা লোল,
অসুরের রক্তমাংসে ভরিছে কবল!!
সে মূর্ত্তিতে ঢেলে মা'য়ে রক্ত-মাংসাসব
ঘোর তমোময় বর পেতে পার সব॥

এইরূপ তামসী সিদ্ধি বীরাচারের অধীন হইলেও, যাঁহারা বীরোচিত সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ঐ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেই মদ্য-মাংস-মৈথুন ব্যবহার বরং শোভা পায়। অন্যের পক্ষে ঐসকল একান্তই উপহাসজনক। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন,

কর্ত্তুং যে প্রভবন্তি মারণ-বচস্তম্ভাদিকং তামসং
তেষামস্তু বরং পরস্য রমণী-সঙ্গঃ সুরা-সেবনং।
বীরত্বং ত্বয়ি, কিন্তু কাপি বিভুতা নো ভাতি বীরাশ্রিতা
হা রত্নাকরমজ্জনৈস্তব পয়ঃপানং ফলং কেবলং॥

মর্ম্মার্থ।

বচঃস্তম্ভ মারণাদি তামসিক কাযে,
পটু যারা, কথঞ্চিৎ তাহাদেরি সাজে—
বরং মদিরা আর পর-পত্নী সেবা,
কিন্তু হে তোমাতে ফল ফলিয়াছে কিবা?
বীর তুমি, কিছু নাহি বীরের লক্ষণ,
না পেলে মারণ-বিদ্যা, না জান স্তম্ভন!

আহা, রত্নাকরে ডুবে রত্ন নাহি পেলে,
লবণাক্ত জলে শুধু হাবুডুবু খেলে !!

वेदाद्यै र्विहिता सुरादिरहिता सेवासुरप्रीतिदा
तत् सेवा परमार्थसाधनमिदं तन्त्रैरपि स्थापितं।
स्वल्पामोहनकारि किञ्चिद्वचनं मत्वेन मद्यं पिब
वर्त्तेद् यः परदेवतां प्रणमतयस्तस्मिंस ततसाहसे॥

মর্ম্মার্থ।

দেবের সন্তোষ হয় আরাধিলে দেবে,
মদ্য মাংস তেয়াগিয়া সংযত স্বভাবে।
এই উপদেশ সর্ব্ব বেদাদিতে রয়,
ইথে পরমার্থ লাভ, তন্ত্রেও তা কয়।
তন্ত্রের সে অংশ গেল, গেল শ্রুতি স্মৃতি,
কাল-ধর্ম্ম প্রচারিতে যে অংশ বিবৃতি,
যে অংশ মোহনকর তন্ত্র নিজে কয়,
সেই অংশে যেই নর করিয়া প্রত্যয়,
ক্ষুদ্র কতিপয় বাক্যে সর্ব্বশাস্ত্র ছেড়ে,
মদ্য পিয়ে, মদ্য দিয়ে আরাধনা করে,
সহস্র প্রণাম আমি তারে করি, আর
সহস্র প্রণাম থাক্ সাহসেতে তার॥

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান, সেইরূপ উপদেশ দিতেই তিনি বাধ্য। তিনি বীরাচারকে ঘোর অবৈধ বিবেচনা করেন, এ বিষয়ে তাঁহার লিপিও তদ্রূপই হইয়াছে। যাঁহারা বীরাচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই সকল উক্তিতে অসন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। এজন্য

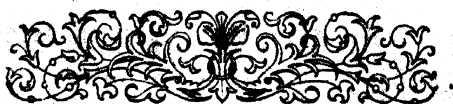
ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

वीराचार-विचार-वाग् विरचिता नैषा मया स्वेच्छया
यद्भूतं भवदागमिष्यदखिलन्त्वीच्छामयीच्छाफलं ।
सुष्ठु तत् प्रणिधाय शुद्धहृदये भो मान्त्रिकास्तान्त्रिका
रोषावेशमपास्य पावकसमा ! दोषो मम क्षम्यतां ॥

মর্ম্মার্থ।

যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে হয়,
সকলি কেবল ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়।
মান্ত্রিক তান্ত্রিক যত বাক্য শুনে মম
হ'তে পারে হইয়াছ পাবকের সম!
বীরাচার-বিরোধিনী বাণী যে সকল,
তাহাও ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ীর কেবল।
বাক্যগুলি চিন্তা করে' বিশুদ্ধ হৃদয়ে,
মম দোষ ক্ষম' সবে রোষ তেয়াগিয়ে॥





নবম পরিচ্ছেদ।

ঋষি-জীবন। দেব-নির্ভর। বহু বিপদাপদ্ হইতে উদ্ধার। হাতুয়ার মহারাণীর অভয়-বাণী। নিষ্কাম ভগবদ্-ভক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মীমাংসার সমালোচনা। ব্রাহ্মণ-নিন্দায় বিদ্বেষ। সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রমে অনুরাগের হেতু।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবি-জীবনের নির্ম্মল-উচ্ছ্বাস, অধ্যাপক-জীবনের বিদ্যা-বিস্তার যেমন দর্শনীয় সামগ্রী, ঋষিজীবনের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, দেব-নির্ভর প্রভৃতিও সেইরূপ লক্ষ্য করিবার বস্তু। তিনি যখন ভক্তিভরে পূজা করিতে বসেন, দেখিলেই বোধ হয় পূজা-স্থানে দেবতাগণের আবির্ভাব হইয়াছে। দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা প্রভৃতি উৎসব সকল ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিবর্ষেই করিয়া থাকেন। ঐ সকল উৎসবের সময় তিনি যখন সজল-নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন, দেখিলেই বোধহয় যেন মায়ের কোন' প্রিয়তম পুত্র কৈলাস হইতে তপোভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যে নামিয়াছেন, এবং মায়ের মৃণ্ময়ী প্রতিমা দেখিয়া কৈলাসের মাতৃস্নেহ স্মরণ হওয়ায়, ঐরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। শিবপূজান্তে এবং সায়ংসন্ধ্যান্তে ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিদিন একদণ্ড দুইদণ্ড কাল আশুতোষের করুণা ও বিভুত্বের ব্যঞ্জক নাম সকল উচ্চারণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে

ডাকিয়া থাকেন। সে ডাক শুনিলে অতিবড় পাষাণেরও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দেবদয়ার উপর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অসীম বিশ্বাস। পরিজনের পীড়াদির সময় ও অন্যান্য বিপৎকালে পুরুষকারের সহিত রীতিমত দৈব-কার্য্যেরও তিনি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহাতে বহুতর বিপদাপদ্ হইতে উদ্ধারও পাইয়াছেন। একবার অপুত্রক হইয়া প্রাচীনাবস্থায় পুত্রলাভ কামনায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দেড় সহস্র শিবের আরাধনা করান। পরে বর্ত্তমান পুত্রকে ন্যায়রত্ন মহাশয় লাভ করেন।

একটী ঘটনাকে দেবদয়ার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় চিরদিন স্মরণ করিয়া থাকেন। একবার পূর্ব্ববঙ্গে কোনও স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। ছোট ছোট খালের ভিতর দিয়া নৌকা করিয়া ঐ স্থানে গমন করিতে হয়। প্রায় দুই প্রহর রাত্রি-কালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নৌকা হঠাৎ ডাঙ্গায় ধাক্কা লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্থলে উঠিলেন। স্থলে লোকালয় নাই কেবল প্রান্তর। বর্ষায় সেই প্রান্তর কোথাও জল-পূর্ণ, কোথাও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। বৃষ্টিও অবিশ্রান্ত পড়িতেছে। মাঝীদিগের নিকট ঐ স্থানে ব্যাঘ্র-ভীতির সম্বন্ধেও-নানা কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মাঝীরা বলিল "ঠাকুর-মহাশয় এখান হইতে স্থলপথে এক্রোশ মাত্র গমন করিলে আপনি কর্ম্মবাটীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন। এই মাঠটী আন্দাজ তিন পোয়া হইবে। তৎপরে অতি ক্ষুদ্র একটী খাল আছে। পারাপার জন্য নারিকেল গাছের গোড়া ফেলা আছে। তাহার উপর দিয়া খালটুকু অনায়াসে পার হইতে পারিবেন। তৎপরে পোয়াটাক্ গেলেই গ্রাম পাইবেন এবং কর্ম্মবাটীতে উপস্থিত হইবেন।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় ঘোর বিপন্ন হইলেন। সেই দুর্য্যোগের মধ্যে অন্ধকারে দুইপ্রহর রাত্রি সময়ে অজানা মাঠ পার হওয়া দূরদেশীয় পথিকের পক্ষে কিরূপ আশঙ্কা-জনক, যিনি কখনও ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তদুপরি বৃক্ষমূলরূপ সেতু অবলম্বনে অন্ধকারে খাল পার হইতে হইবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-জীবনে অর্থোপায় কি ক্লেশসাধ্য, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেইদিন তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন, এবং বিপদে পড়িয়া মুহুর্মুহুঃ মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন, দূর হইতে লণ্ঠন হস্তে দুইটী লোক আসিতেছে। তাহারা ক্রমশঃ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিতে পারিলেন, তাঁহাকে যে বাটীতে যাইতে হইবে, ঐ দুইটী লোক আবশ্যকমতে সেই বাটীতেই গমন করিতেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাদিগের সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। ঘোর নিশীথকালে মধ্য নিদ্রার সময়, দুর্য্যোগের মধ্যে মনুষ্যের অগম্য প্রান্তরে সেই সঙ্গীদ্বয়কে পাইয়া ন্যায়রত্নমহাশয় দেবদূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

শুধু এইরূপ বিপদ্ বলিয়া নহে, যে কোনও সময় চিত্তে বিশেষ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিবারণ কল্পে অনেক সময় এমন সুযোগ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহাকে ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবদয়ারূপে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রথম অধ্যাপনা কালে, কিরূপে বিপুল ছাত্র প্রতিপালন করিবেন, এই ভয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন ব্যাকুল হন, তখন অযাচিতভাবে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কিরূপ বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সে ঘটনাকে ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবদয়া বলিয়াই

পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রাচীনাবস্থায় কাশীবাস করিবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন বিশেষ ব্যাকুল হইলেন, কিরূপ অযাচিতভাবে হাতুয়ার মহারাজ তাঁহাকে পরিজনবর্গসহ কাশীধামে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তাহাও পাঠক জ্ঞাত আছেন। এ সকল, মহাপুরুষের উপর দেবদয়ারই নিদর্শন।

হাতুয়ার মহারাজ স্বর্গ গমন করিলে পর, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আবার কয়েক বৎসর কিছু ব্যাকুলতার সহিত কাল যাপন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে পরিজনবর্গের দশা কি হইবে? রাজসংসারের দৃষ্টি যদি সেরূপভাবে আর না থাকে, তবে ভবিষ্যতে কাশীতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিজনবর্গের কি দুর্দ্দশাই না ঘটিবে! এইরূপ নানা চিন্তায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইদানীং কিছু ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার পুত্র কন্যারাও প্রায়ই বলিতেন "বাবা, মহারাজ স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু প্রমুখ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী যাঁহারা মহারাজের দক্ষিণ হস্ত, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের কথা একবার মহারাণীকে জানাইলে হয় না?" ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজের কোনও ব্যাকুলতা সহসা পরিজনগণকে জানিতে দিতেন না। তিনি ঐ সকল কথার উত্তরে প্রায়ই বলিতেন "তোমরা ভাবিও না। তোমাদের এরূপ ব্যাকুল হইবার বিশেষ কিছুই হেতু নাই। যে রাজ-সংসারের অধীনে তোমরা কাশীবাস করিতেছ, সে সংসার ক্ষুদ্র সংসার নহে। মহারাজ স্বর্গগামী হইলেও সে সংসারে বিবেচনা, তিরোহিত হইবার বস্তু নহে। বিশেষতঃ ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা রাজ্ঞী অন্নপূর্ণারূপে সে সংসারে বিরাজ করিতেছেন। কুমার-মহারাজ বয়ঃস্থ হইতেছেন।

যে দেবেন্দ্রবাবু প্রভৃতির নাম করিতেছ, তাঁহারা রাজকার্য্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাঁহাদের নিকট উপযাচক হইয়া কোনও বিষয় জানান চপলতা প্রকাশ মাত্র। অতএব মহারাজ স্বর্গগামী হইলেও তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই জানিবে।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্যাকুল পরিজনবর্গকে এই ভাবে বুঝাইতেন বটে, কিন্তু মমতা নিবন্ধন প্রিয়বস্তুগণের জন্য তাঁহার আশঙ্কাও মনে মনে বড় কম ছিল না। বিশ্বনাথ অচিরেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এ ব্যাকুলতাও তিরোহিত করিয়া দিলেন। বিন্ধ্যাচলে কুমার-মহারাজের উপনয়ন-উপলক্ষে মহারাণী ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তথায় লইয়া গেলেন, এবং মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকারও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। সেই সময়ে মহারাণী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যাকুলতা অবগত হইয়া তাঁহাকে অভয়-বাণী শ্রবণ করাইলেন। যাঁহার দ্বারা একবার জানাইবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যাকুল পরিজনেরা সর্ব্বদা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করিতেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যাকুলতা দর্শনে রাজ্ঞীই স্বয়ং সেই দেবেন্দ্রবাবুর মুখে প্রকাশ করাইলেন "আপনার সংসার এখন যে ভাবে কাশীধামে রহিয়াছে, আপনার অবর্ত্তমানেও সেই ভাবেই কাশীধামে থাকিবে। আপনি রাজসংসার হইতে যে সাহায্য পাইতেছেন, আপনার পুত্রও তাহা পাইবেন। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন।" আমি যাহাকে দেবদয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তুমি হয়তো তাহাকে দেবদয়া বলিতে রাজী নও। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সকল ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেবদয়া বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং মহিমময়ের মহিমা চিন্তা করিয়া রোমাঞ্চিত

হন। দেব-দয়ায় ন্যায়রত্নমহাশয়ের এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অসীম শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবেই দেবভক্তি করিয়া থাকেন। পার্থিব শুভাশুভ তাঁহার সেই ভক্তির তারতম্য ঘটাইতে কখনও সমর্থ হয় না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বৈরাগ্য ও ভগবদ্-বিষয়ক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার এই ঈশ্বর-নির্ভর ও ঐকান্তিক ভক্তি কিরূপ অদ্ভুত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে দুই চারিটী কবিতা উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইল। 'অপরাধ-ভঞ্জন' নামক কবিতার মধ্যে তিনি কোনও স্থানে লিখিয়াছেন,

नैवाकारि नतिर्नुतिश्च न मया भो विश्वबन्धो विभो
सत्यं ब्रूम कदापि भाषितमिदं नास्तीश्वरः कर्हिं वा ।
तद्वाक्यद्वयमेव तावक महानामाङ्कितं सश्वितं
पातस्तात भवाब्धिपात-विरते नौ किं निदानं भवेत् ॥

মর্ম্মার্থ।

না করেছি স্তব কভু করিনি প্রণাম বিভু
তুমি বন্ধু এ বিশ্ব-জগতে,
কভু বলি "ঈশ নাই" "ঈশ সত্য" কভু গাই
কার্য্যাকার্য্য নাহি স্থির চিতে।
যাহা করি, যাহা কই, প্রভু তোমা ছাড়া নই,
মহানামে হই না বিরত,
আগে 'ঈশ' নাম করে' 'আছে' 'নাই' বলি পরে
অগ্রে 'ঈশ' হয় উচ্চারিত।

আস্তিক নাস্তিক হই ভেবে কি সন্তোষে কই
ভবে মুক্তি ওই নাম গুণে
ওহে পাতঃ! ওহে তাত! ভবসিন্ধু নিপতিত
পাবে না কি এই দীনজনে?

नास्तीशो नच बन्धुरस्ति जगतां नापक्षपाती तथा
कोऽप्यस्तीति कथाः कदाहमवदं शोचन् हृदन्वाक्षिपन् ।
एतद्-भीषण-भाषण-प्रजनितं क्षाम्यापराधं विभो
यस्मात्तन्न कदाप्युपादिशमहं क्लेशैर्विद्वेषणं ॥

মর্ম্মার্থ।

শোকে তাপে মন'-খেদে কখন' বলেছি কেঁদে
ঈশ্বর নামেতে কেহ নাই,
যদি বা ঈশ্বর থাকে বন্ধু নাহি বলি তাঁ'কে,
বন্ধু যদি কষ্ট কেন পাই?
যদি তিনি বন্ধু হন কারো বন্ধু, কারো ন'ন,
পক্ষপাতী তিনি অতিশয়,
এ সব ভীষণ-ভাষে দুষেছি কত না দোষে
তোমারে গো কতই সময়!
নিজ গুণে আজ আমা করিতে হইবে ক্ষমা,
করি না তো ভুলাবার ছলে
কা'রেও এ উপদেশ নাহিতো বিদ্বেষ-লেশ,
যা বলেছি, শোক তাপ পেলে।

'বৈরাগ্য-চিন্তা' নামক কবিতায় অন্যস্থানে স্তায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন,

समाश्लिष्टः सृष्टेरहमिह महापातकशतैः
पिता त्वं पाता त्वं भव तव कृपापात्रमखिलम् ।
ततः स्यात् स्वैरं मेऽमृतममृतलाभैक सदनं
कदा यामि स्वामिन् विषयग-दुराशा-प्रशमनम् ॥

মর্ম্মার্থ।

যে দিন হইল সৃষ্টি সেই দিন হ'তে
সত্য বটে লিপ্ত আমি মহাপাতকেতে;
কিন্তু ওহে দেব-দেব! এ বিশ্ব ভিতর,
পিতা তুমি, পাতা তুমি, আছ নিরন্তর।
সবাই কৃপার পাত্র এই বিশ্বে তব,
পাতকী আমিও তাই মুক্তি-ধন পাব।
কিন্তু কোন্ জন্মে পা'ব সেই মুক্তি-ধন,
কোন্ জন্মে হ'বে ভববন্ধন-মোচন,
কোন্ জন্মে বল' সেই মুক্তি দিতে মোরে
বিষয়-দুরাশা মোর ছেড়ে যা'বে দূরে?

যেখানেই ন্যায়রত্নমহাশয় ভগবদ্-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ অসামান্য ভক্তি পরিলক্ষিত হয়। 'নিষ্কাম-ভগবদ্ভাবঃ' নামক কবিতা সমূহের মধ্যে তিনি একস্থানে লিখিতেছেন,

जीवाः सन्तु न सन्तु वा स्थिरतरा जन्मान्तरादीनि वा
धर्माः सन्तु न सन्तु वा सुखमय-स्थानादय विस्मय ।

বাল্যাদ্ধি তব তাবতীষু তদপি প্রীতিঃ পরা মূর্ত্তিষু
প্রেয়ঃ প্রীতি রপেক্ষতে নহি ফলং প্রীতিঃ সুতাদিষ্বিব ॥

মর্ম্মার্থ।

'নিত্য জীব' থাক্ আর নাহি থাক্ কিছু,
থাক্ আর নাহি থাক্ 'জন্মান্তর' পিছু,
থাক্ কি না থাক্ প্রভো বস্তু 'ধর্ম্ম' নামে,
থাক্ কিম্বা নাহি থাক্ 'স্বর্গ' পরিণামে,
বাল্য হ'তে ভালবাসি শ্রীমূর্ত্তি সকল,
কথন' ভাবিনা কিবা তা'র ফলাফল।
প্রেম প্রিয়বস্তু চায়, নাহি চায় ফলে,
পুত্রে কি বাৎসল্য যায় ফল নাহি পেলে?

যখন কেশব-সম্প্রদায় বঙ্গীয় নবযুবকদলের মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কর্ত্তব্যতা সংস্থাপনের বহুল প্রয়াস পাইতেছিলেন, তৎকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় সাকার-উপাসনাপক্ষে অনেক গুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। তাহাতে ভক্তকবি বলিতেছেন যে, চিরপ্রচলিত সাকার উপাসনা কেন ছাড়িতে হইবে?

কৃতং বা বিম্বং বা তব ধবল-পীতাসিত-তনু-
পরিমানং নূনং তদপি মম চেতো রময়তি।
প্রমিত্যেব প্রীতিং ত্রিভুবনপতে কিন্তু ভজতি
কলাপী নো ধূলীপটল-জলদভ্রান্তিজ-মুদম্ ॥

মর্ম্মার্থ।

কখন' শ্রীমূর্ত্তি কালা কভু মূর্ত্তি গড়ি' ধলা
কভু পীত করিয়া গঠন

. ব্রহ্মভাবে তাঁ'র ধ্যানে কত শান্তি লভি প্রাণে ;
ভ্রমেতেও ভাবি না কখন—
সে মূর্ত্তি তোমার কিনা, মিথ্যা হয় নাহি মানা,
বিশ্বাসেতে আমি প্রাণ সঁপি ;
ধূলিরাশি ওঠে যবে যদি জলধর ভাবে
আনন্দে কি নাচে না কলাপী ?

কবি মহাকবি অনেক জন্মিয়াছেন। কাব্য মহাকাব্য সকল অন্বেষণ করিলে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অনেক কবিতাই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় শ্লোকসকল যেন এই নূতন। পবিত্র ঋষি-জীবনে কবি-জীবনের সম্মিলন হওয়ায় কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যেন এইরূপ পবিত্রতা প্রতিফলিত হইয়াছে। 'ব্রাহ্মাভাসানাং ভ্রমখণ্ডনং' নামক কবিতাবলি হইতে আরও এইরূপ কতিপয় অপূর্ব্ব কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ গুলিও ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মীমাংসায় লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে তাঁহাদের সহিত বিরোধ ঘটাইবার জন্য ঐ সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। উপাস্য-বস্তু সম্বন্ধে কোনও নূতন মীমাংসা শুনিলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চক্ষুঃ জলে ভাসিতে থাকে। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি সেই সজল-নয়নের স্মৃতি-চিহ্ন।

मूर्त्तिं मोक्षसमागमाय विपदां मोक्षाय सख्येन वा
भावेनोद्भवतो हृदा भगवतो यां भावयामो वयम्।
स्वप्ने यान्तु विलोक्य जड-मनसां मन्यामहे धन्यता
मन्यन्तो हतचेतनस्य कथया तां विस्मरामः कथम्॥

মর্ম্মার্থ।

যে মূর্ত্তি ভাবি গো কভু মোক্ষ পা'ব বলে',
যে মূর্ত্তি পড়ে গো মনে বিপদের কালে,
কখন' বা বন্ধুভাবে
অন্তর যে মূর্ত্তি ভাবে,
পুরাতে ভক্তের বাঞ্ছা যে মূর্ত্তি সকলে —
স্বয়ং ভাবের বিভু
যত্নে ধরেছিল কভু;
যে মূর্ত্তি স্বপ্নেও কভু নিরখিতে পেলে—
জনম সার্থক জ্ঞান
ধন্য হয় মন প্রাণ;
আমাদের চেয়ে যা'রা হীনবুদ্ধি কত
সে মূর্ত্তি তাদের বাক্যে হ'ব কি বিস্মৃত ?

যেষামীষ মহাপ্রসাদমমৃতং ভোক্তুং কদা ন স্পৃহা
দ্রষ্টুং শ্রীপুরুষোত্তমিন্দুবদনং শ্রীমন্দিরান্তর্গতম্।
গন্তুং তীর্থময়ীঞ্চ তৎ প্রিয়পুরীং তেষাং পরিগ্রাহিষাং
শ্রীমৎতৎসদ্বচসাং প্রমুদিতহৃদাং ধিগ্ভিক্ষুনন্ত্রোপাসনাম্ ॥

মর্ম্মার্থ।

না জন্মে বাসনা কভু যাহাদের মনে
প্রভুর অমৃতময় প্রসাদ ভক্ষণে,
না রাখে যাদের হিয়া
সাধ শ্রীমন্দিরে গিয়া
পুরুষ-শ্রেষ্ঠের সেই শ্রীমুখ-দর্শনে,

কভু ক্ষণেকের তরে
বাঞ্ছা যা'রা নাহি করে
ঈশ্বরের প্রিয়ক্ষেত্র তীর্থাদি গমনে,
যা' বলুক সেই জাতি
প্রভুর বিদ্বেষী অতি
সে "ওঁ তৎসৎ" বাদী আঁখি বন্ধ করে'
কি নব ভজনা করে, ধিক্ ভজনারে।

प्रीताः सन्ति य एव बिल्वतुलसी-पत्रेण मन्त्रेण वा
ध्यानेनापि य एव दत्तमपि चेद् भक्तेन भोज्यादिकम्
नो भुक्त्वा वितरन्ति वाञ्छितफलं भक्ताय भक्तिप्रियान्
तान् देवांश्च मन्यतां न भजतां द्वेषः परं त्यज्यताम्।

মর্ম্মার্থ।

দেবের সন্তোষ কত তুলসীর দলে
সন্তোষ বৃক্ষের পাতা বিল্বপত্র দিলে,
তা'ও যদি হয় ভার
মন্ত্র মাত্র জপ' তাঁর,
তন্ত্র, মন্ত্র, তা'ও তুমি কিছু না জানিলে —
করে' মাত্র অধিষ্ঠান
শ্রীমূর্ত্তির কর ধ্যান
দেবতাগণের তাহে সন্তোষ উথলে;
অর্পিলে নৈবেদ্য কভু
লবে না, ছোবে না প্রভু,
ভক্তেরে অর্পিবে যত অভীপ সিত-কলে:

তাঁদের সমান ভাই
আর ভক্তিপ্রিয় নাই,
মানিও না, ভজিও না সে দেব-নিকরে,
প্রাণের বিদ্বেষ মাত্র দিও ভাই ছেড়ে।

ধ্রুবে প্রহ্লাদে বা ভগবদনুকম্পাঙ্কিত কথা
শ্রুতা শ্রোত্রে শ্রুত্যামমৃত-রসধারাং বিতরতি।
তবাস্মিন্ বিদ্বেষো বিষবদমৃতাস্বাদিনি রসে
ন জানীমঃ কোঽয়ং বুধবর বিকারঃ সমজনি॥

মর্ম্মার্থ।

ধ্রুব কি প্রহ্লাদ আদি জন্মিয়া ধরায়
শ্রীমূর্ত্তি ভজিয়া পেল কতনা কৃপায়!
সে সব কাহিনী শুনে
সুধা ঢেলে দেয় কাণে,
তোমার হ'তেছে তাহে বিদ্বেষ উদয়,
হায় রে বিষের মত
অমৃতে বিদ্বেষ এত,
না পারি বুঝিতে কিছু, হয়েছে তোমার
বুধবর উপস্থিত কি ঘোর বিকার!

ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ-নিন্দার পক্ষপাতী একেবারেই নহেন। কেহ ব্রাহ্মণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিলে তাহা তিনি শ্রবণ করেন না। কোনও গ্রন্থে ব্রাহ্মণের উপর কটাক্ষ থাকিলে তাহা তিনি পাঠ করেন না। ব্রাহ্মণেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুষ্ঠায়ী নহেন

বটে, কিন্তু গায়ত্রীত্যাগ অনেকেই করেন নাই। যে ব্রাহ্মণ ত্রৈকালীন গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহার নিন্দায় পাপ আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, ইহকাল পরকাল উভয়েই বিশ্বাস রাখা হিন্দুর প্রয়োজনীয়।

কলিতে গৃহস্থাশ্রমেরই ন্যায়রত্ন মহাশয় অধিক পক্ষপাতী। তাঁহার শিষ্যশাখার মধ্যে বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ ঐহিক-আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যদি আশ্রমান্তর অবলম্বন করিতে চাহেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে কখনও অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন শোককালীন বৈরাগ্যকে, বৈরাগ্য সংজ্ঞা দেওয়া অপেক্ষা বিকার সংজ্ঞা প্রদান করাই অধিক প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মোন্নতি সাধনই যদি উদ্দেশ্য হইবে, সংসারাশ্রমই সে কার্য্যসাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। সংসারাশ্রমে পাপ করিলে অনেক পাপের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত সহজ। কিন্তু আশ্রমান্তরে পাপ করিলে অনেক পাপ বজ্রলেপবৎ কঠিন। সংসারাশ্রমে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ নিগ্রহ করিবার ব্যবস্থা নহে। অন্য আশ্রমে মুহূর্ত্তের জন্যও ইন্দ্রিয়ের অধীন হইলে মহাপ্রত্যবায়। সংসারাশ্রমই সকল আশ্রমের প্রতিপালক। সংসারাশ্রমেও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উত্থান করার পর হইতে, রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। সংসারাশ্রমও স্বর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সক্ষম। জনক, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জরৎকারু প্রভৃতি বহু মহর্ষি সংসারাশ্রমে থাকিয়াই তপস্যা করিতেন। আশ্রমান্তর অবলম্বনের স্পৃহা বৈরাগ্য অপেক্ষা বহুক্ষেত্রে বিকারেরই অধিক পরিচায়ক, ইহা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত। বিশেষতঃ কলিকালে সকল আশ্রমের বৈধতাই তিনি স্বীকার করেন না। গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা ব্যাসদেবও কাশীখণ্ডে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা, "চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং কোঽতীব শ্রেয়সে সতাং। যস্মিন্ প্রাপ্নোতি

সংক্ষুব্ধে পরত্রেহচ বা সুখং॥ ইদং শ্রেয়স্ত্বিদং শ্রেয়স্ত্বিদমত্র সুকরং ভবেৎ। ইত্থং সর্ব্বং সমালোড্য গার্হস্থ্যং প্রশশংসতু॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থোবা বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ। এষামাধার ভূতোহসৌ গৃহস্থো-নান্তথেতিচ॥ দেবৈ র্মনুষ্যৈঃ পিতৃভি স্তির্য্যগ্‌ভি শ্চোপজীব্যতে। গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাত্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠোগৃহাশ্রমী॥



দশম পরিচ্ছেদ।



সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভা। আদিরসের কবিতা। শ্লিষ্ট কবিতা। কাব্য-মোহে বিদ্যার ব্যাঘাত সম্ভাবনা। মোহভঞ্জন দশকং। রাজরাজেশ্বরী স্তোত্রং। ঋষিগ্রন্থ আলোচনার্থ যুবকগণের প্রতি উপদেশ।

সংস্কৃত-কবিত্বাংশে ন্যায়রত্ন মহাশয় নৈষধীয় রীতিরই অধিক পক্ষপাতী। তিনি শ্রীহর্ষের কবিতা যত ব্যবহার করেন, এত আর কাহারও কবিতা ব্যবহার করেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, যে কবি দার্শনিক, তিনি কবিত্ব-বিকাশের স্থলসমূহ যেমন নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন, অন্য কবি তদ্রূপ পারেন না। এ কারণ, বহু কবির শক্তি, মাত্র কুঞ্জ-কোকিল-কামিনীর কমনীয়তা বর্ণনেই পর্য্যাপ্ত। ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজ কবিত্ব-শক্তিকে ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করিতে চাহেন না। তথাপি তিনি যে ঐ সকল বর্ণনায় শক্তি ধারণ করেন না, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। যে ঘটনায় যে রসের কবিতা রচিত হওয়া উচিত হয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই ঘটনা-স্থলে সেই রসের কবিতাতেই প্রতিভার উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। বাল্যাবস্থায় বিবাহান্তে তিনি যৎকালে শ্বশুরালয়ে গমন করিতেন,

পল্লীস্থ স্ত্রীলোকগণ আসিয়া চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে সম্পর্কোচিত হাস্য পরিহাস করিত। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা কেহ কেহ বা দূরে অবস্থান করতঃ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতেই আবশ্যকমতে রহস্য করিতেন। ঐরূপ একটি রসিকা স্ত্রীলোককে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার জন্য অনুরোধ করার ছলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই বাল্যকালে রহস্য পূর্ব্বক নিম্নলিখিত রসিকতাপূর্ণ কবিতাটি রচনা করেন এবং ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া তথায় স্ত্রীলোক-মহলে হাসি ছড়াইয়া দেন।

नैपुण्येषु सुसाधितेषु रचनां कृत्वा विरिञ्चिश्चिरं
पूर्णेन्दीवरविन्द-कुन्द-तड़िताद्यान्यान्य शोभाभृताम्।
मूर्त्तिं ते समकल्पयन् मृदुतनो मर्त्येषु कीर्त्त्याशया
तामाच्छाद्य हि वाससा विधियशो हेषो न ते शोभते ॥

মর্ম্মার্থ।

যা' কিছু সুন্দর ভবে সৃজন করেন সবে
প্রথমেই ধাতা পদ্মযোনি,
সৃজিলেন শশধর, গড়িলেন মনোহর
অরবিন্দ, কুন্দ, সৌদামিনী।
সুন্দর সামগ্রী যত করে' করে' অবিরত
সিদ্ধ হ'ল নৈপুণ্য ধাতার,
সর্ব্বশেষে ও সুন্দরি! পাকা হাতে চেষ্টা করি'
ও বরাঙ্গ গড়িয়া তোমার—
পাঠালেন ধরা পরে মর্ত্ত্যে কীর্ত্তি রাখিবারে,
সেই তনু রেখে বস্ত্রে ঢেকে—

নিয়ত এমন ধারা বিধি-বশে হেব করা

ওগো নারি ! সাজে না তোমাকে।

ঐ সময় আরও একটি কবিতা রচিত হইয়াছিল।

बिम्बौष्ठि निम्बतरु-नीरस-पादपादौ
सर्पेऽपि सर्पति मृगाक्षि तवाक्षि युग्मम् ।
जानासि मां किमु ततोऽप्यधमं सगर्व्वे
यत्त्वं मृगाक्षि कुरुषे मयि दृष्टिरोधम् ॥

মর্ম্মার্থ।

বিম্ব-ওষ্ঠি ! বড়ই মিষ্টি, এইটি দেখি চোখে,
তেতোর গুরু, নিমের তরু, মুখ ঢাক' না দেখে !
নাই লো মিঠে, শুক্‌নো কাঠে, দেখ্‌তে তা'ও হয়,
সাপ খেলালে, তা'ও সেকালে, ঘোম্‌টা খোলা রয় !
ওলো ধনি, গরবিণি, তোর চোখে কি দীন
সাপের চেয়ে, কাঠের চেয়ে, নিমের চেয়ে হীন ?
একি ভঙ্গি, তোর কৃশাঙ্গি, আমি প'ড়্‌লে চোখে
ফেল অম্‌নি, বদন খানি, ঘোম্‌টা দিয়ে ঢেকে !!

যে প্রতিভা কেবলমাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রচনায় স্ফূর্ত্তি পায়, সে প্রতিভা প্রতিভাই নহে। যে প্রতিভা কেবল আদিরস-বিষয়ক রচনায় স্ফূর্ত্তি পায়, সে প্রতিভাও প্রতিভা নহে। যে প্রতিভা লোকের মর্ম্মান্তিক বেদনায় রচনায় কেবলমাত্র নিয়োজিত হয়, তাহাকেও উৎকৃষ্ট প্রতিভা বলি না। যে প্রতিভা সকল বৃত্তির রচনায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাহাই যথার্থ কবি-প্রতিভা।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে বিষয় লইয়াই চিন্তা করিয়াছেন, তাহাতেই নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। তাহাতেই স্বীয় অসীম ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু যৌবনাবস্থায় পত্নীর সহিত কলহ করিয়া বিদেশে চলিয়া যান। ভার্য্যা কাতরা হইয়া পড়িলেন, স্বামী কিছুতেই গৃহে ফেরেন না। নিদাঘ-শুষ্কা কোনও সরসীর দুরবস্থা রবিকে জানাইবার ছলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়া, উক্ত বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

हृद्ये पङ्कज-कोरके तव करै र्भग्नेऽपि या मोदते
नो मुञ्चेत्तव सङ्गमं दिनपते यावद् भवाँस्तप्यते ।
किन्त्वेषा भवतैव सन्ततमहो सन्ताप्यते शोष्यते
दुर्नीतिः सरसीं प्रतीति तपने वक्तुं न कैः शक्यते ॥

মর্ম্মার্থ।

দিবাকর তব প্রতি সরসীর কিবা প্রীতি,
শোভা করে' বক্ষের উপর
উঠিলে পঙ্কজ-কলি করে দল' দলগুলি
তবু তার প্রীতি নিরন্তর।
দরশন হলে পরে কভু না তোমারে ছাড়ে,
অনুরাগে সদা মুগ্ধ থাকে,
কতই মমতা ভরে প্রতিবিম্ব বুকে করে'
সযতনে নিরবধি রাখে।
ছি ছি রবি কোন্ পাপে তারে নিদাঘের তাপে
দগ্ধ তুমি কর নিরন্তর,

বৃথা এত দাও জ্বালা কি দোষী সরসী-বালা,
এতই কি ভাল দিবাকর!
কর ইচ্ছা যা' তোমার যত দোষ অধীনার
প্রবলেরে দোষী করে কেবা,
তাই সরসীর প্রতি তপন তোমার নীতি
ভাল, ভাল, ভাল পেলে শোভা॥

নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত এই, জল ও ক্ষিতি উভয় দ্রব্যেই চতুর্দ্দশ গুণ বর্ত্তমান। তন্মধ্যে পার্থক্য এই, জলে স্নেহগুণ অবস্থিত, ক্ষিতিতে তৎপরিবর্ত্তে গন্ধ বিরাজিত। প্রমাণ যথা, 'স্নেহহীনা গন্ধযুতা ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশ।' দার্শনিক কবির আদিরসের কবিতাতেও পদার্থতত্ত্বের অপলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। রমণীর মুখ বর্ণনায় ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

নীরাম্ন-নির্ম্মিত-ময়ী সুখয়ত্যশেষং
মাং তাপয়ত্যনুদিনং বদনং ত্বদীয়ং।
তুল্যে গুণস্য গণনেঽপি সতি স্বতন্ত্রৌ
স্নেহো গুণোঽস্য বিরহো ভুবনস্য বীজম্॥

মর্ম্মার্থ।

জলেতে ক্ষিতিতে, শুনে দার্শনিক কাছে,
সংখ্যায় সমান গুণ উভয়েতে আছে,
ওলো বালা, ও মুখের তুলা সুধাকরে
কবিদলে কুতূহলে দেখি সদা করে;
কিন্তু কি আনন্দ সখি দেয় সুধাকর,
ও মুখের বাক্য মোর শুধু দাহকর;

কবিদলে শুনেনি লো হইয়া নিপুণ,
জলেতে ক্ষিতিতে থাকে স্বতন্ত্র কি গুণ;
স্নেহগুণ জলে থাকে, ক্ষিতিতে না রয়,
তোমার ক্ষিতির মুখ, শশী জলময়॥

কবিরা চিরকাল চন্দ্রমার সহিত রমণী-মুখমণ্ডলের তুলনা করিয়া আসিতেছেন। দার্শনিক-কবি সে মীমাংসা মঞ্জুর করিলেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ পরিপক্কতা সর্ব্ববিষয়েই পরিদৃষ্ট হয়। 'সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে' (অর্থাৎ বিধবার কপালে সিন্দূর-চিহ্ন) এই চরণ লইয়া তাঁহাকে একবার সমস্যা-পূরণ করিতে দেওয়া হয়। বাক্যটি অসঙ্গতি-দোষাক্রান্ত হওয়ায় প্রাচীন কোন' কবি (১) সিন্দূর-বিন্দুঃ, (২) বিধবা, (৩) ললাটে, এই তিন অংশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়া প্রশ্নোত্তর ছলে কোনও রকমে সমস্যা পূরণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্যা-পূরণ সংস্কৃত সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অনেকে পরিজ্ঞাত আছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কিন্তু সমস্যা-পূরণ কালে অসঙ্গতি-দোষ পরিহার পূর্ব্বক, বিধবার কপালেই সিন্দূর সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। যথা,

ধবাঙ্কলীনা ধব-সঙ্গমার্থং
দিগম্বরত্বাদ্ বিধবা নিশীথে।
নিতম্বিনী ভাতি, ন ভাতি কস্মাত্
সিন্দূর-বিন্দুর্বিধবা-ললাটে॥

মর্ম্মার্থ।

'ধব' মানে 'বসন' টেনে, এক হেয়ালি কই
এ' রচনা, বুধজনা, কর্‌বে না কি সই? *

* সই—স্বীকার। মঞ্জুর।

নিশা কালে, নারীকুলে, ধবের কোলে যায়,
এক ধব তাঁর রাখে কোলে, আর ধব না রয়।
সেই সধবা, হয় বিধবা, দেখ্‌বি গো সেই কালে
সীথের আঁটা, সিঁদূর ফোটা, রয় বিধবা-ভালে॥

যিনি রচনাশক্তির দ্বারা এইরূপ সকল রসের রসিককেই আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ, তাঁহার শক্তি সর্ব্ববিষয়িণী। ন্যায়রত্ন মহাশয় কোনও স্থলে লিখিয়াছেন—

নো বেদ্মি চন্দ্রবদনে নয়নদ্বয়ন্তে
কিং ভাস্করস্য কিযদংশময়ং কিমিন্দোঃ।
দগ্ধো হতোঽস্মি পতনেন যদস্য রশ্মেঃ
স্নিগ্ধো ভবন্ ভজতি কোঽপি পরং প্রমোদম্॥

মর্ম্মার্থ।

বুঝিনা লো নেত্র তব অয়ি চন্দ্রাননে,
রবি কি বিধুর অংশে নিরমিলা বিধি।
আমি দগ্ধ হ'য়ে মরি রশ্মির পতনে,
স্নিগ্ধ হ'য়ে কেহ শান্তি ভুঞ্জে নিরবধি॥

এই সময় একটী প্রাচীন ইতিবৃত্ত স্মরণ হয়। একজন সন্ন্যাসী একদা একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া আসিয়া, কোনও রাজার নিকট অসাধারণ কবিতা দ্বারা তাহার রূপ বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি যে রসে রসিক নহে, সে ব্যক্তি দ্বারা সে রসের সুন্দর কবিতা রচিত হওয়া অসম্ভব, রাজার এইরূপ ধারণা থাকায় সন্ন্যাসীকে তিনি ভণ্ড বলিয়া অশ্রদ্ধা করিলেন। দৈবক্রমে কিছুকাল পরে

সেই রাজারও নিজের উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তি জন্মিল। সেই সময় উক্ত সন্ন্যাসী রাজার সহিত দেখা করিয়া কবিতা দ্বারা দরিদ্র-ব্যক্তির কাতরোক্তি বর্ণনা করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা দরিদ্র ব্যক্তির কাতরোক্তি এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় সন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন "মহারাজ আপনি রাজা হইয়া, যে শক্তির প্রভাবে দারিদ্র্য-বর্ণনায় সমর্থ হইয়াছেন, আমি সন্ন্যাসী হইয়া সেই শক্তি দ্বারাই আপনার নিকট রমণীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছিলাম।" প্রকৃতই, যিনি প্রতিভাশালী কবি তিনি সকল প্রকারের কবিতাতেই রস করিয়া তুলিতে পারেন।

শ্রীহর্ষাদি মহাকবিগণ ঘোর অতিশয়োক্তি দ্বারা দময়ন্তী প্রভৃতির রূপ-গুণাদির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্দর্শনে বাল্যকালীন সহৃদয়তা নিবন্ধন প্রিয়-বয়স্যগণের অনুরোধে পূর্ব্বে কোনও সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় 'নারীগুণাদি বর্ণনং' নামে কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। সে সকল রহস্যোদ্দীপক কবিতা পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কাব্যরসজ্ঞ কোনও নূতন লোক তাহার লিপিভঙ্গি, পরিপক্বতা ও রসিকতা দৃষ্টি করিলে, শ্রীহর্ষাদির রচনা বলিয়াই তাঁহার ভ্রম হইবে। ঐ সকল কবিতা 'রসরত্নং' নামক কবিতা গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। নিম্নে তাহা হইতে দুই চারিটী কবিতা উদ্ধৃত হইল। কবিতাগুলির প্রথমাংশের উৎকট বর্ণনা, শেষাংশে অনুপম উপদেশাবলীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

कामिन्युत्कट-वर्णनासु पटुता यैर्यैः सहायीकृता
ते ते सत्कवयोऽप्यतो रसमयो यः कालिदासः कविः।

श्रीहर्षस्तु ततोऽपि सत्कविरतः काव्यादयशःकाम्यया
सौन्दर्य्यादिक-वर्णना-विहतयो नार्य्यो हि कार्य्या मया ॥

देवैश्च मन्दर-पुरोग-पुरन्दराद्यै
र्धिक् सिन्धुमन्थनमनुष्ठितमिष्टसिद्धैः ।
वाचो विनिन्दित-सुधा वसुधातरुण्या
नास्वाद्य ते तु विबुधा न बुधेषु गण्याः ॥

विश्वोद्भवास्पदभवेऽतिचिरन्तनत्वा
च्चर्म्माम्बराद् भुजगभस्म-विभूषितत्वात् ।
मालिन्य-लक्ष्म रमणीभिरलक्ष्यभावात्
तत् सम्भवेद्धि-विधावपि विश्वनाथे ॥

शीतांशुमण्डल-समत्वमदूरदर्शी
पश्यत्यशेषगुणभाजिनि योषिदास्ये ।
हास्यास्पदं किमिदमेव न तस्य यस्मात्
शोभा नभःकमलवज्जलमण्डलत्वात् ॥

शङ्के कथं कमल-कोरक-कुम्भ-कोय-
कुम्भादिके कुलवती-कुचसाम्य-लेशम् ।
शृङ्गं गिरेः कठिनतोन्नतितो यदेषां
कं शानलं शमयितुं तुहिनाचलस्थम् ॥

क्षीणं समीक्ष्य सुमुखी-धृत-मध्यदेशं
स्वापेक्षया क्षितितले निखिलाणवस्ते ।
संलज्जिताः किमपरं परमाणवोऽपि
तल्लज्जया जगति भेजु रतीन्द्रियत्वम् ॥

पादाब्ज-मार्जन-वशेन सरोवरान्त:
कान्तामलाद् विगलिताद् धृतपङ्कभावात्।
पङ्केरुहस्य जननं निजवीज-साम्यात्
श्रुत्वा मलात्तु मधुकैटभवन्मुरारे:॥
नारी-सुबाहुज-मलेन मृणाल-जालं
सूतं तदीय-कमनीय-कुचद्वयोत्थम्।
यत्तन्मलेन कमलस्य च कोरकाणि
शैत्यादिकानि सलिले तनु-सङ्गजानि॥
यद्यन्मलं स्मितमुखी-मुखमण्डलस्थं
वन्ध्यत्वमेव विदितं पतितेऽपि तस्मिन्।
तन्मूलकं जगति किञ्चन जायते चेत्
संसार-सारतर-तत् सुरदुर्लभं स्यात्॥
ख्याताति सुन्दरतयेव रति: स्मरश्च
यत्तत् परं परवतीभिरतीव सङ्गात्।
तद्द्योतनाभिरभिदीप्ततमौ यदेतौ
संसर्गजात-गुणजात समञ्चितौ वा॥
स्वेदादिजात-तरुणीतनु-पूतिगन्धो
ऽप्याकर्षति भ्रमरितं हि विदग्धचित्तम्।
का मालिने सति कथा वपुष स्तदस्या:
किंवास्ति शस्ततम-वस्तु यदस्तु तुल्यम्॥
धिक् कुर्व्वतां नव-मधूनि वधूमुखस्थ
लालाश्रयापि शतशश्च सदाश्रयाणाम्।

तत्प्रीतिसाधन-तपश्चरणं तदस्याः
किंवास्ति प्रस्ततम-वस्तु यदस्तुतुल्यम् ॥
यत्रापवित्र-मलमूत्र-चिराधिवास
स्तस्मिन् घृणास्पद-पदेऽपि सदा विलासः।
शुद्धात्म-हृद्यतम-सत्कृतिनां तदस्याः
किंवास्ति प्रस्ततम-वस्तु यदस्तु तुल्यम् ॥
कान्तास्तु विद्धि विबुधैरपि नोपमेया
मैषा त्रिवर्ग-परिहापि यतो न हेया।
देवा दिनेश-गिरिजेश-गणेशमुख्याः
सर्व्वार्थदा अपि नवै रसिकैरलभ्याः ॥

শব্দবিন্যাস ও ভাবমাধুর্য্য গুণে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত সামান্য অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকও কিরূপ সুন্দর হইয়া থাকে, 'গঙ্গা' বিষয়ক কয়েকটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইল।

भव-वारि भवद्वारि नाम ते यामभीश्वरम्।
कोऽनुमाता जगन्मातः कतमस्ते गुणः पुनः ॥
भव-बन्धन-युक्तासि जटया जगदम्बिके।
भव-बन्धन-हन्त्री त्वं भवद्भावोऽयमद्भुतः ॥
अमृतन्ति परतरं अङ्गजे सिन्धुजादपि।
तस्मादमर एव स्याद्वदेव स्तवाद्भुतात् ॥
सुपर्व्वादिव सर्व्वस्मात् विश्वोर्यंत् परमं पदम्।
हेतुस्ते तव सम्बन्धस्तस्त्वां मातरुपास्महे ॥

सुलभं सलभमथापि त्वत्पयः स्यतोऽस्मि[illegible] ।
शिरसा नतस्तवयामि त्वां मातर्गङ्गे प्रसी[illegible]

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত শ্লিষ্ট-কবিতার মধ্যেও সা[illegible]পূর্ব

मातर्ममातितमसावृत माद्यविद्ये
चेतोऽति कुत्सितचिताङ्कितमीशहृद्ये ।
नान्ये स्पृशन्तु घृणयन्तु सुराः शरण्ये
नोपेक्षणमव नटनं तव दक्षकन्ये ॥

"হে শিবহৃদ্‌বিহারিণি মাতঃ কালিকে! আমার চিত্ত তমোগুণাচ্ছন্ন ও অতি অপকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন। এই চিত্তকে ঘৃণা করিয়া অন্য দেবতারা স্পর্শ করেন না। না করেন, নাই করুন। কিন্তু তুমি যে আমাদের মা। অতএব তুমি এই চিত্তে নৃত্য করিতে ঔদাস্য করিতে পারিবে না।" অন্ধকারময় শ্মশানক্ষেত্রে কালী নৃত্য করিয়া থাকেন। বাহ্যদৃষ্টে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ হইলেও শ্লেষে ঐ বাক্য দ্বারাই নিজের চিত্তকে অন্ধকারময় শ্মশানক্ষেত্র সাজান হইয়াছে। 'তমসাবৃত' এই শব্দের দ্বারা যেমন 'তমোগুণাচ্ছন্ন' অর্থ করা হইয়াছে, সেইরূপ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' অর্থেরও উহার দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। 'কুৎসিত-চিতাঙ্কিত' শব্দের যেমন 'কুৎসিতজ্ঞান-বিশিষ্ট' অর্থ করা হইয়াছে, সেইরূপ ঐ বাক্য দ্বারাই 'চাণ্ডালাদি-কুৎসিতজাতির চিতাদ্বারা সজ্জিত' ইহাও বোধ হইয়া থাকে। অতএব বাগ্‌ভঙ্গি দ্বারা নিজের চিত্তকে অন্ধকার পূর্ণ, চাণ্ডালাদির চিতা দ্বারা সজ্জিত শ্মশানক্ষেত্ররূপেও শ্লেষে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতুই ভক্তকবি বলিতে পারিয়াছেন "অন্যান্য দেবতারা ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিবেন না। নাই

করুন।—হে শরৎ! হে রুক্মাঙ্গিকে! এই চিত্তে নৃত্য করিতে তুমি উদাস্ত করিতে পারিবে না।” সংস্কৃত শ্লিষ্ট কবিতার ভাব ভাষান্তরে বাহির হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণই ইহার মাধুর্য্য অনুভব করিবেন। আদিরসের কবিতাও এইরূপ আছে।

অত্যর্থং সখি সখ্যকর্ম্মসু রতা মর্ম্মব্যথাগোপন
স্তাপং প্রাপয়সীতি মাদৃশজনপ্রীতিং ন কিং সাধয়েৎ!
বিঘ্নং যো বররাজকুঞ্জর-করাঘাতৈন সদ্যস্তন-
প্রেয়ঃপঙ্কজকোরকং তবনবং ভঙ্গাপদং প্রাপয়ন্ ॥

কোনও অবিবাহিতা বয়ঃস্থা রাজকন্যাকে তাঁহার সঙ্গিনীগণ বলিতেছেন “সখি আমরা তোমার সখ্য কর্ম্ম করিয়া থাকি। তুমি আমাদের নিকট নিজের মর্ম্মব্যথা গোপন করিয়া আমাদিগকে কষ্ট দিতেছ। অতএব জগদীশ্বর করুন, উপবনে তোমার সাধের যে পদ্ম-কলিকা জন্মিয়াছে, প্রবল রাজ-হস্তী আসিয়া শুণ্ডাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া অচিরেই আমাদের প্রীতি সম্পাদন করুক।” বাহ্যভাবে এই অর্থ আসিলেও কবিতাটীর অন্তর্নিহিত ভাব অন্যরূপ। অবিবাহিতা রাজকন্যার মর্ম্মব্যথা বুঝিয়া সখিরা তাঁহাকে সুসমাচার দিতেছেন “রাজকুঞ্জর অর্থাৎ প্রবল রাজা সত্বরই তোমার বর হইবেন। সে পক্ষে ‘করাঘাতেন’ ‘সদ্যস্তন’ প্রভৃতির ব্যাখ্যান্তর করতঃ শ্লোকটীর অন্যরূপ অর্থ করিতে হইবে।

এইরূপ শ্লিষ্ট কবিতা ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক সময়েই ব্যবহার করিয়াছেন। সম্রান্ত ব্যক্তিগণকে যে সকল কবিতা উপঢৌকন দিয়াছেন, তন্মধ্যেও প্রায়শঃই এইরূপ সুন্দর দ্ব্যর্থকতা পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

दु:साधरवैधगहनावगमस्थिराय
ताताश्रयाति शुभलक्षण सेवितोऽयं ।
भूजावरोधाप्रशमने नियतव्रतश्री-
युक्त: सदा विजयतां रघुराजसिंह: ॥

(রেওয়ার সাবেক মহারাজ ৺রঘুরাজ
সিংহ-সন্নিধানে পঠিত।)

भूभृत्सरो विजयतां जगतां हिताय
नैर्मल्यभाजि करुणासलिलैर्विराजि ।
यस्मिन् विराजति सदा कमलेशपाद
स्तस्मिं स्थिराय न भवेत् कमलोदय: किं ॥
गम्भीरतागुणसुशीतलतैकसद्म
पद्मोदयादवनतीकृतराजहंस: ।
नित्यं द्विजालिपरिसेवित शोभमानं ॥
यदयामरहस्य शरणन्तु सरो द्विजस्थात् ॥

(পাতিয়ালার সাবেক মহারাজ-
সন্নিধানে পঠিত।)

त्रेतायां स्वयमीश ऐशविभवात् पृथ्वीशवेशं भजन्
यस्मात् प्रार्थयतिस्म पैतृकगुरोराशी:शतं सन्ततं ।
तद्वंशि-वशिष्ठवंशजमया श्रीमत्सुजीवाशया
दत्ताशी: किमुपेक्षते क्षितिपते सन्तान सीतापते ॥
श्रीमन्माधवदीनबान्धवधराधीशस्य वासक्षौ
यत्स्थानं परमाश्रमावशुसमाप्नोतिश्च सवत्सके ।

পদ্মাসদ্মসমর্থীশ্ব বিস্ময়করী বিশ্বস্য বিস্মাবলী
মায়ত্ব কিমিদং পদং জয়পুরং গোলোকলোকোঽথবা ॥

(জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মাধব
সিংহ-সন্নিধানে পঠিত।)

কবিতায় নেশা বড় গুরুতর নেশা। কত কত বুদ্ধিমান্ যুবক এই নেশায় পড়িয়া শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করতঃ ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ করিয়াছেন। প্রাচীন বাক্যও আছে "শাস্ত্রং কাব্যেন হন্যতে।" ন্যায়শাস্ত্র-পাঠাবস্থায় কবিত্বের নেশায় পড়ায় এক সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঐ শাস্ত্রে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সমূহ বিঘ্ন হয়। যুবক ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ভাটপাড়ার ভবিষ্যৎ আশা-স্থল বলিয়া ৺ হলধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের তৎকালে বিশ্বাস ছিল। সেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের, পাঠে ঐরূপ বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া, পঠদ্দশায় কবিতা রচনা পরিত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ন্যায়রত্নমহাশয়কে ঘোরতর তিরস্কার করেন। তদবধি প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিত্বের ঝোঁক ন্যায়রত্ন মহাশয় কতক কমাইলেন। তথাপি কবিত্ব শক্তি এমনই সামগ্রী যে, উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইলে তাহা দমন করা যায় না। একারণ, কি ভক্তি, কি রসিকতা, কি উপদেশেচ্ছা, যখন যে বিষয়ে উচ্ছ্বাস আসিয়াছে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেই বিষয়ে রচনা করিতে হইয়াছে। কোনও মনোরম স্থান বা তীর্থাদিতে গেলে সুন্দর ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত রাজা জমীদার গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় কবিতা উপহার দিয়াছেন। ইয়োরোপ আমেরিকা হইতে সংস্কৃত-সেবী সাহেবেরা ভারতে সংস্কৃত-চর্চ্চা দর্শন করিতে আসিয়া, যখন যিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সকলকেই উৎকৃষ্ট

উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা অভিনন্দিত করা হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ সমগ্রজীবনের রচনা যদি সংগৃহীত থাকিত, তবে তাহার সমষ্টি যে কত হইত বলা যায় না। কিন্তু কবিত্ব প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের না থাকায়, তিনি ঐ সকল কবিতা যত্ন করিয়া রাখেন নাই। যখন যে কবিতা করিয়াছেন, নিকটস্থ বান্ধব ও ছাত্রদিগকে দেখাইয়া কয়েক দিন আমোদ করিয়াছেন মাত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আলোচিত তন্ত্রের পুথি, স্মৃতির পুথি, ন্যায়ের পুথি প্রভৃতি অন্বেষণ করিলে তাহাদের আশে পাশে ছেঁড়া কাগজে লেখা, তাঁহার রচিত বহুতর পুরাণ কবিতা পাওয়া যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বৈরাগ্য-বিষয়ক কবিতা বা দেবদেবীর স্তব দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যাদিও বুঝি সেরূপ স্তবাদি রচনা করিতে পারেন নাই। নিম্নে নমুনা স্বরূপ 'মোহভঞ্জন দশকং' এবং 'রাজরাজেশ্বরী স্তোত্রং' প্রদত্ত হইল।

মোহভঞ্জন দশকম্।

उद्याने नवनिर्म्मिते धवलिते सौधे सदावस्थितं
नृत्यैश्चित्तविनोदकारितरुणीसंघेन संसेवितम्।
निद्रावेशवशेन मुद्रितदृशं मामेकदैकः पुमान्
यां यां वाचमुवाच विस्मयकरीं तां भ्रातराकर्णय ॥१॥

মর্ম্মার্থ।

ধবলিত সৌধমাঝে নবীন উদ্যানে,
চিরসুখে বাস করি হরষিত মনে।
নৃত্যগীত-বিলাসেতে মোহি' অবিরল,
চারিদিকে সেবা করে বিলাসিনী দল।

অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যময় সে অপূর্ব্ব-স্থানে
এভাবে পরমসুখে আছি মুগ্ধ-মনে।
একদা মুদ্রিত আঁখি হ'লে নিদ্রালসে,
সহসা পুরুষ এক শিয়রেতে এসে,
বিচিত্র বাক্যজা কত তুলা তার নাই,
আমারে কি ব'লে গেল শুন তুমি ভাই।

दृष्टं कुष्ठज पूतिगन्धिकुरसैः श्लिष्टं वपुस्ते कदा
स्पृष्टं नैवच बान्धवैः किमपरं जुष्टं न जायादिकैः।
भक्तं तत् क्षतजातशोणितयुतं भुक्तं त्वया श्वादिवद्
गर्व्वं माकुरु जीव बर्व्वर नवो नायं तवाविर्भवः॥

মর্ম্মার্থ।

হে জীব! লেপেছ দেহ কস্তুরি চন্দনে,
মোহে অভিমান তাই ধরে নাকো মনে।
একদা দেখেছি শুন, ছিল নিরন্তর
নিদারুণ কুষ্ঠ-ভরা তব কলেবর।
দিবা নিশি ক্ষত হ'তে কত রস ওঠে,
চারিদিকে কি বিষম পূতি গন্ধ ছোটে;
সে জনমে দেখেছি হে আমি তব কায়
না বন্ধু, না জায়া, কেহ সেবিবারে চায়।
বিগলিত-পূঁজ-রক্ত ক্ষত-হস্ত হ'তে
নিয়ত মিশিছে তব আহারীয় সাথে।
স্বচক্ষে দেখেছি আমি, কুকুরের প্রায়
ক্ষুধায় খেতেছ তুমি সেই সমুদয়।

নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ' বৃথা গর্ব্ব তবে॥

মধ্বানস্তব বাজিরাজি-শকটৈঃ সংসজ্জিতৈঃ শোভিতাঃ
প্রাগ্ জন্মন্যধুনৈব তাঃ সুখনিশা যোষাবরৈর্যাপিতাঃ।
দৃষ্টং তন্নু জনী ত্বয়া পরিজনৈ র্ভিক্ষান্নৈর্জীবিতং
গর্ব্বং মা কুরু জীব বর্ব্বর নবো নায়ং তবাবির্ভবঃ॥

মর্ম্মার্থ।

হেরিয়ে সৌভাগ্য, মনে এত গর্ব্বোদয়,
অদৃষ্ট-চক্রের কিছু লহ পরিচয়।
কোন' জন্মে এই রূপে র'ত তোমা তরে
অশ্ব-হস্তী সুসজ্জিত পথের দু'ধারে।
তখনো এরূপে তুমি কতই যতনে
যামিনী জাগিতে যত যুবতীর সনে।
সেই জন্মে এ'ও দেখি, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে
অকস্মাৎ ভিক্ষা কর পরিজন ল'য়ে।
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ' বৃথা গর্ব্ব তবে।

পশ্যামি স্ম পরস্য হস্তিহরণং ত্বং দস্যুবৃত্তী হতঃ
জিত্বা নিত্যমতোষয়ঃ পরিজনং সম্পোষয়ো দাসবৎ।
পশ্চাত্ত্বং পরিহায় পাপনিকরং কারাপ্রবিষ্টশ্চিরং
গর্ব্বং মা কুরু জীব বর্ব্বর নবো নায়ং তবাবির্ভবঃ॥

মর্ম্মার্থ।

এরূপে কতই জন্ম কত ভাবে গত
কোন' জন্মে নিরবধি দস্যুতায় রত।
দাস-রূপে সন্তোষিতে নিজ-পরিজন
নিরন্তর পরস্বত্তি করিছ হরণ।
পোষ্য তরে এই ভাবে দস্যু-বৃত্তি করে',
একদিন আছ দেখি বদ্ধ কারাগারে।
ফুরায়েছে দস্যু-বৃত্তি স্বজন-পালন,
মিটেছে মিলন-আশা জন্মের মতন।
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ' বৃথা গর্ব্ব তবে।

दृष्टोऽसि कदा सुतादिकजनैः सेवामुदा यत्नतो
नित्यं सर्व्व-सुपर्व्व-गर्व्व-निचयो नीतस्त्वयाखर्व्वताम्।
सर्व्वे ते तव सन्निधौ प्रियजना याताः पुनः संक्षयं
गर्व्वं मा कुरु जीव बर्व्वर नवो नायं तवाविर्भवः ॥६॥

মর্ম্মার্থ।

দেখিয়াছি কত জন্মে তোমারে যতনে
সেবিতেছে পত্নী-পুত্র চির-হৃষ্ট-মনে।
সেবা দেখি' মনে মনে হইত উদয়,
হেন সেবা দেবতারো ভাগ্যে বুঝি নয়।
ধীরে ধীরে সুখ-রবি অস্তাচলে গেলে
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ ভাগ্যনাশ-কালে,

যত প্রিয় জনে ফেলি' একাকী তোমারে
লুকাইল কালগ্রাসে চোখের উপরে।
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ বৃথা গর্ব্ব তবে।

যস্যাসীদ্‌গিরিগহ্বরে বিচরণং সিংহৈঃ সমং স্বেচ্ছয়া
সোঽয়ং স্বীকুরুতে সদাঙ্কুশ-পদাঘাতং ত্বদীয়াঙ্গনে।
দৃষ্টস্তে দ্বিরদাকৃতিং ধৃতবতো দুঃখং কদাপীদৃশং
গর্ব্বং মা কুরু জীব! বর্ব্বর! নবো নায়ং তবাবির্ভবঃ॥

মর্ম্মার্থ।

যে করীন্দ্র উচ্চতম নগেন্দ্র-শেখরে
সিংহ সহ বিহরিত গর্ব্বিত-অন্তরে,
সে মহান্ জীবে তুমি বাঁধিয়া অঙ্গনে
ব্যথা দাও পদাঘাত, অঙ্কুশ-তাড়নে!
অভিমানে আজি মনে কর না স্মরণ
তুমিও কতই যোনি করেছ ভ্রমণ।
কভু পেয়ে সুবিশাল করি-কলেবর,
এতই লাঞ্ছনা আহা পেতে নিরন্তর।
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ বৃথা গর্ব্ব তবে।

ক্রীড়া যস্য করীন্দ্র-কুম্ভনিকরে বাসো গিরীন্দ্রোদরে
সোঽয়ম্বায়সপঞ্জরে পশুবরস্ত্বৎপ্রীতয়ে নৃত্যতি।
তদ্দাখেব গতা কদাপি ভবতা সিংহাকৃতিং বিভ্রতা
গর্ব্বং মা কুরু জীব বর্ব্বর নবো নায়ং তবাবির্ভবঃ॥ ৩॥

মর্ম্মার্থ।

সে মৃগেন্দ্র, রাজা যার নগেন্দ্র-নিলয়ে,
খেলা যার নিরবধি করি-কুম্ভ ল'য়ে,
তৃপ্তি হেতু বদ্ধ ক'রে' আয়স-পঞ্জরে,
মনোমত খেলা তুমি খেলাও তাহারে।
কোন' কালে পেয়ে আহা মৃগেন্দ্র-আকার,
এ লাঞ্ছনা দেখিয়াছি সহ' অনিবার।
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ বৃথা গর্ব্ব তবে।

হ্রষ্যন্তো মকটাশ্ববত্ব-বপুষঃ পৃষ্ঠে ভটারোপণং
জ্ঞাত্বাবাপ্যনং কশাহতিবশাদ্ হ্রেষারবং কুর্ব্বতঃ।
ঘাসগ্রাসগতস্য হৃন্নিরসমা দৃষ্টাশ্বকায়ং কদা
গর্ব্বং মা কুরু জীব! বর্ব্বর! নবো নায়ং তবাবির্ভবঃ॥৮॥

মর্ম্মার্থ।

তব করে যেই ব্যথা পায় অশ্বগণ,
সে ব্যথা তোমারো কভু করেছি দর্শন।
দেখিয়াছি বদ্ধ তুমি থাকিতে শকটে
অথবা যুদ্ধেতে চল যোদ্ধা ল'য়ে পিঠে।
অভিমানে আজি তুমি নাহি কর চিতে,
কশাঘাতে হ্রেষা-রবে কতই কাঁদিতে।
তখন এ ক্ষীর-সর ছিল না তোমার
ক্ষুধায় ঘাসের গ্রাস মিলিত আহার।
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ বৃথা গর্ব্ব তবে।

লব্ধ্বা দুর্লভ মত্র মানবজনিং লব্ধ্বা চ সৎ সন্নিধিং
নিদ্রাহারবিহারমাত্রকরণং স্বংপৌরুষং মন্যসে।
নিস্তারৈকগতির্মতিঃস্তুতিনতী প্রীতিশ্চ কিন্ত্বীশ্বরে
ধিক্ তাং তাং যদপাস্য পাশবময়ীং বৃত্তিং ত্বয়োপাস্যতে॥

মর্ম্মার্থ।

সুদুর্ল্লভ নরজন্ম করেছ ধারণ,
সাধু সঙ্গ পেতে পার করিলে যতন।
এ সুযোগ যদি, কেন পশুর সমান
নিদ্রাহার বিহারেতে পুরুষার্থ জ্ঞান।
ভগবানে ধ্যান, জ্ঞান, প্রণাম, ভকতি,
জীবের নিস্তার তরে এক মাত্র গতি॥
ধিক্ তোমা পশু-বৃত্তি উপাসনা করে'
কাল যাপ নিরন্তর এ সকল ছেড়ে।

তস্মাদ্বেদ মুনীশবাদ নিচয়ং বিশ্বস্য নিঃসংশয়ং
জ্ঞাত্বা তর্কবিশোধিতার্থমনয়োরাচার্য-শুশ্রূষয়া।
সাক্ষাৎকর্ম্মমনিত্যভোগমখিলং হিত্বৈব নিত্যং সুখং
ভক্ত্যা ভাবয় ভাস্করং রঘুবরং কিম্বা ভবানীশ্বরম্॥১০।

মর্ম্মার্থ।

বেদ-বাক্য, ঋষি-বাক্য, শিব-বাক্যচয়ে,
দম্ভ ছাড়ি' বিশ্বসহ দ্বিধা-শূন্য হ'য়ে!
কায়-মনে জ্ঞানবান্ আচার্য্য সেবনে,
তর্ক-বিশোধিত-ধর্ম্ম শিখহ যতনে।

দুঃখ-সম্মিলিত তুচ্ছ সুখভোগ ছেড়ে,
চেষ্টা কর নিত্যসুখ সাক্ষাতের তরে।
ভক্তি-ভরে ব্রহ্মভাবে ভাব' রঘুবর,
দিনমণি, ভবানী, কি ভবানী-ঈশ্বর।

রাজরাজেশ্বরী-স্তোত্রম্।

वेधोविष्णुशिवैः शुभप्रदपदं संस्थाप्य शीर्षे स्थिते
मञ्चे काञ्चननिर्म्मिते जननि ते यद्वैश्चिरं चिन्त्यते ।
उद्भूति स्तिति संहृति प्रजनिकाशक्तेः स्थिरत्वाश्रया
निस्ताराय मयार्थ्यते पदतरोः श्रीराजराजेश्वरि ॥

(মহাসমুন্নত ভাবে কি ঐশ্বর্য্য কি গৌরবে
ব'সে আছ ত্রিপুর-সুন্দরি!
বিভব সম্পদ্ তরে কে না তোমা সুরাসুরে
সেবা করে রাজ-রাজেশ্বরি!)
মঞ্চ শোভে স্বর্ণভারে সেই মঞ্চ নিজ শিরে
বিধি ধরে' আছে অনুক্ষণ,
সে মঞ্চ মস্তকোপর ধরে' আছে মুরহর,
পুরহর করেছে ধারণ!
মঞ্চোপরি তুমি তারা সে মঞ্চ ধরিয়া তা'রা
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণ,
লভিতে অচলা শক্তি কত মতে করে' ভক্তি
তব পদ চিন্তে অনুক্ষণ!

অন্য কিছু নাহি আশ, হৃদে মম অভিলাষ,
শুন গো মা রাজ-রাজেশ্বরি,
ভীষণ এ ভব-ঘোরে এ দাস নিস্তার তরে
নিস্তারিণি চাহে পদ-তরী।

ত্বাং ধৃত্বাপি পুরন্দরঃ সমগমৎ স্বারাজ্যমৈরাবতং
লেভে নন্দনকাননং বিমলভা রম্ভা শচী-সেবনম্।
হস্তাদম্বুদমাশ্রয়ংশ্চ কুরুতে দম্ভোলি-সঞ্চালনং
নিস্তারায় মযার্থ্যতে পদতরীঃ শ্রীরাজরাজেশ্বরি॥

মর্ম্মার্থ।

ভক্তি-ভরে পুরন্দর সে মঞ্চ মস্তকোপর
লভিয়াছে করিয়া ধারণ—
স্বর্গের রাজত্ব কিবা, কিবা রম্ভা, শচী-সেবা,
. ঐরাবত, নন্দন-কানন!
নিরন্তর ভক্তি-ভরে সেই মঞ্চ শিরে ধরে'
পুরন্দরে কি শক্তি-সৃজন!
সদা সেই শক্তি-ভরে বসিয়া অম্বুদ পরে
দম্ভে করে দম্ভোলি-চালন।
অন্য কিছু নাহি আশ হৃদে মম অভিলাষ
শুন গো মা রাজরাজেশ্বরি,
ভীষণ এ ভব-ঘোরে এ দাস নিস্তার-তরে
নিস্তারিণি চাহে পদতরী।

ত্বত্বা ভক্তিমতি প্রপূজ্য ভবতীমাদ্যাপতিস্ত্র্যম্বকঃ
কার্য্যৈঃ স্বীয়সুধাবশান্তিমগমন্ মুক্তিং গতাঃ কেচন।

সূর: শক্তিমবাপ বৃষ্টিকরণে সোম: সুধাবর্ষণে
নিস্তারায় মযাথ্যতে পদতরী: শ্রীরাজরাজেশ্বরি ॥

মর্ম্মার্থ।

নিরন্তর মা গো তোরে শক্তি-তরে সেবা করে'
শক্তি পেলে দশ দিক্‌পাল,
সযতনে ভক্তি-ভরে মুক্তি তরে সেবা করে'
মুক্তি পেলে মুক্তির কাঙাল।
রস আকর্ষণ করে' সূর্য্য মেঘ, বৃষ্টি করে,
চন্দ্র করে সুধা বরষণ,
ওই পদে ভক্তি করি' ওগো রাজ-রাজেশ্বরি,
যে যা' চাহে দাও গো তখন!
অন্য কিছু নাহি আশ হৃদে মম অভিলাষ
শুন গো মা রাজরাজেশ্বরি,
ভীষণ এ ভব-ঘোরে এ দাস নিস্তার তরে
নিস্তারিণি চাহে পদতরী।

ধর্ম্মার্থী ভজতীহ কোঽপি ভবতীং কোঽপ্যর্থলাভাশয়া
কামপ্রার্থনয়ৈব কোঽপি ভজতে কোবাঽমৃতার্থী ভবন্।
ভক্তৈ: প্রার্থিতমেকদা বিতরিতুং তং তং বরং সাদরং
মূর্ত্তিস্তে কিমু শোভতে গিরিসুতে রম্যৈশ্চতুর্ব্বাহুভি: ॥

মর্ম্মার্থ।

কেহ ভজে ধর্ম্ম আশে, কেহ অর্থ অভিলাষে,
কেহ কাম, কেহ মোক্ষ তরে,
চারি ফল হ'বে দিতে 'তাই কি মা চারি হাতে
বসে' আছ চারিফল ধরে'!

अस्यैकेन सुवीक्षणामृतरसैः सन्तापमाध्यात्मिकं
तापं दुःसहमाधिभौतिकमपाकर्त्तुं द्वितीयेन च।
भक्तेष्वापतदाधिदैविकसमुत्तापं तृतीयेन ते
मातः किं शुभलोचनत्रययुतं स्मेराननं शोभते॥

মর্ম্মার্থ।

ত্রিলোকে ত্রিতাপ-ব্যথা বুঝেছ কি গিরিসুতা
ত্রিনয়নে পুণ্য-দৃষ্টি করে'
সে ত্রিতাপ নাশিবারে আছ কি ত্রিনেত্র ধরে'
অত হাসি তাই কি অধরে ?

ऐश्वर्य्यं किम् वर्ण्यते तव शिवे त्वं राजराजेश्वरी
त्वन्त्वाद्याप्रकृतिस्त्वमेवच जगन्मातापि गीतागमैः।
स्वेच्छातः कुरुषे यतस्त्रिजगतामुत्पादनं पालनं
भुङ्क्ते क्लेशमशेषमेष सततं त्वद्दासदासः कथम्॥

মর্ম্মার্থ।

বিভব ঐশ্বর্য্য তব বল মা কেমনে ক'ব
তুমি গো মা রাজরাজেশ্বরী,
তুমি আদ্যা সনাতনী, তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী,
তন্ত্রে গাহে মহিমা তোমারি!
তুমি মা ত্রিগুণ ধর' স্বেচ্ছায় তুমি মা কর'
ত্রিলোকের সৃজন-পালন
তবে মা গো কোন্ পাপে বল' এ অশেষ-তাপে
দাস-দাস দহে অনুক্ষণ।

নব্য কাব্যসমূহ আলোচনার স্রোতে রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদির আলোচনা চতুষ্পাঠীসমূহ হইতে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃতশিক্ষার্থিগণের দ্বারা প্রাচীন কালের মত আবার ঐ সকল ঋষি-গ্রন্থ আলোচিত হোক্, এই উদ্দেশ্যে নব্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সকল উপদেশ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

भो भो नव्य नवीनकाव्यजरसैः स्वःश्रेयसःक्षालनं
लब्धं मुख्यफलन्तु यस्य विषदयोषामनस्तोषणम् ।
यत्तोषस्य गणेशवासवशिववद्द्वेषस्तु शेषःफलं
तस्मात् स्त्रीमदकामजव्यसनदे काव्ये मनो मार्पयताम् ॥

মর্ম্মার্থ।

নব্য-কাব্য-রসাস্বাদে, ওহে নব্যদল,
প্রক্ষালিত হয় মাত্র নিজের মঙ্গল।
কামিনীকুলের মন' বিষের মতন,
তারে সন্তোষিতে চিত্ত ধায় অনুক্ষণ।
নারী-প্রেমে হ'লে মত্ত নর যায় ভুলে,
গণেশ বাসব শিব আদি দেবকুলে।
অতএব শুন ভাই, যেই কাব্য-রসে
নারী প্রতি ধায় মন', চিত্তে গর্ব্ব আসে,
যে কাব্যে বাড়ায় কাম, বাড়ায় ব্যসন,
সে কাব্যের রস পান কর' না কখন ॥

कालेऽस्मिन् कुटिले सतामपि सदा स्वान्तन्तु कान्तागतं
वात्सल्यादि सुराधिकं तव पुनस्ताकण्यमुज्झितम् ।

तस्मात् किं भवितेति भावय, पुनः काव्याब्धि-सम्मज्जने
भो भ्रातः किमनर्थसार्थघटनं सम्भावि तद् भाव्यताम् ॥

মর্ম্মার্থ।

ভয়ঙ্কর কলিকাল হয়েছে উদয়
এ কালে সাধুরো চিত্ত নারী প্রতি ধায়।
তাহে উত্তেজিত পুনঃ যৌবন তোমার,
বারুণী-সুরার চেয়ে মাদকতা তার।
ইহাতেই কত তব অনিষ্ট ঘটন,
হ'তে পারে, মনে মনে করহ চিন্তন।
পুনঃ আধুনিক কাব্যে রসের সাগরে
ডুবিলে ভাল কি মন্দ, দেখ চিন্তা করে' ॥

यत् संसेव्य महर्षि सन्ततिगणाः सन्तोऽभवन् सद्गुणा
स्तत्श्रीभागवतादि भारतमथो वाल्मीक-सद्भारती।
तत्सत्त्वेऽप्यधुनातनानि रसिक ग्रन्थे समालोचिते
विद्यां विद्धि समुद्रमध्यपतितां सिद्धेदविद्या सतां ॥

মর্ম্মার্থ।

ভাগবত, রামায়ণ, শ্রীমহাভারত,
রহিয়াছে ঋষি-গ্রন্থ জুড়িয়া জগৎ।
যাহা পাঠে হইতেন ঋষিপুত্রগণ
কতগুণী, কত জ্ঞানী, কত বিচক্ষণ।
থাকিতে সে ঋষিগ্রন্থ, ভবে অবিরত
রসিকের রস-গ্রন্থ হ'লে আলোচিত,
প্রস্থান করিবে বিদ্যা সাগরের জলে,
অবিদ্যাই হ'বে সার বিদ্বানের দলে ॥



একাদশ পরিচ্ছেদ।



বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজ সংস্থাপক ধনবান্ ও বিদ্বান্‌গণের স্মৃতি রক্ষা। সমাজ বন্ধনে প্রাচীনগণের বুদ্ধিমত্তা। দেশীয় সামগ্রীর গৌরব রক্ষায় দেশবাসীর কর্ত্ত-ব্যতা। শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ শ্রুত্যনুসারে এই ত্রিবিধ উপাসনাবস্থা বর্ণন। তর্কশাস্ত্রের দায়িত্ব। প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক বঙ্গে ন্যায়াতিরিক্ত দর্শনে উপেক্ষার হেতু। অন্যান্য দর্শন তর্কশাস্ত্র কিনা জানিবার উপায়। অদ্বৈতবাদখণ্ডন গ্রন্থের পরিচয় এবং আপত্তি উপপত্তিচ্ছলে মর্ম্ম প্রকাশ আরম্ভ। নিজগুরুমত সংস্থাপন ও তদ্‌বিরোধি মত খণ্ডনের বৈধতা। পদ্ম-পুরাণে সদসৎ শাস্ত্র নিরূপণ ও অদ্বৈতবাদ শ্রবণে পাতিত্য বর্ণন। 'ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বং * *' ইত্যাদি শ্রুতির স্বারসিক ব্যাখ্যারম্ভ। পরমাণু সংস্থাপন।

যে সকল শক্তিমান্ পুরুষ পূর্ব্বাপর বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের গঠন ও সংরক্ষণ কল্পে দৃঢ়ব্রত ছিলেন, বিদ্বৎ-ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন সংশ্লিষ্ট রাখা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কারণ অধ্যাপকেরা শাস্ত্রসেবী, ধনবান্ বিষয়ীলোকেরা তাঁহাদের প্রতিপালক। দেশের শাস্ত্রীয় সমাজ রক্ষায় বিদ্বান্ অপেক্ষা বিদ্যোৎসাহীর চেষ্টা সমধিক ফলপ্রদ। বর্ত্তমান ধনবান্‌গণ অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধনবান্‌গণ সে চেষ্টা

অনেক অধিক পরিমাণে করিয়া গিয়াছেন। এখনও সমাজের যে বন্ধন পরিলক্ষিত হয়, তাহা তাঁহাদেরই চেষ্টার পরিণাম মাত্র। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তৎসন্তান শিবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার বংশধর রাধাকান্ত দেব ও কমলকৃষ্ণ দেব, নড়ালের রতন রায়, উলোর মহাদেব মুখোপাধ্যায়, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, রমালির রাজচন্দ্র রায়, কলসকাটীর বরদাকান্ত রায় প্রভৃতি পূর্বতন ভূম্যধিকারী ও রাজন্যবর্গ কিরূপে বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের পরিগঠন ও সংরক্ষণ করিবেন সেই চিন্তায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। মহিষাদলের রাজধারা পূর্ব্বপুরুষ-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে অদ্যাপি দেশীয় সমাজ-রক্ষক বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ৺মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌, কলিকাতার ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা সমাজের বহু বল বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আজীবন ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ও বহু ক্লেশে সেই অর্থগুলি সঞ্চয় করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বর্গগমনের কিছু পূর্ব্বে যখন দেখিলেন তাঁহার পুত্রগণ কৃতকর্ম্মা হইয়াছেন, তখন নিজের অর্জ্জিত কপর্দ্দক পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্য না রাখিয়া যাবতীয় অর্থ দেশের বিদ্বৎসমাজ সংরক্ষণ কল্পে প্রদান করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত, বঙ্গ-সরস্বতীর প্রেরিত একটী বুধশেখর দেশের বিদ্বৎ সমাজ রক্ষার পক্ষে লোকাতীত কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা করিয়া কাউল সাহেব যে কার্য্য সাধন করিতে পারেন নাই, ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কার্য্য সাধন করিতে পারেন নাই, এই পুরুষ সেই

কার্য্য সাধন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া, ডিরেক্টর সাহেবকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া ইনি সংস্কৃত বিদ্যার রক্ষাকল্পে আশাতীত সাহায্য বাহির করেন, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতেও বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা-সংস্থাপনাদির দ্বারা বিদ্বৎসমাজ রক্ষা পক্ষে বহু সদ্‌ব্যবস্থাও ইহাঁর দ্বারা সাধিত হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষগণ যদি মহেশচন্দ্রের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সংগৃহীত অর্থ ব্যবস্থা সহ ব্যয় করিতে পারেন, তবে এই বুধ শেখরের কৃতিত্বও বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজ রক্ষা পক্ষে বহুদিন সুফল উৎপন্ন করিবে। দেশীয় বিদ্যারক্ষাকল্পে ধনবান্‌গণের অর্থব্যয় ক্রমশঃ খুব কমিয়া যাইবে বলিয়াই অনুমান হয়। এ সময় মহেশচন্দ্রের কৃতিত্বই সমধিক মূল্যবান্ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা প্রাচীন সময়ে কি ধনবান্‌গণ, কি অধ্যাপকগণ, সকলেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব সাধন করিতে জানিতেন। যেমন আবশ্যকীয় সামগ্রীতে তাঁহারা বঙ্গীয় সমাজ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এমন আর কোনও সমাজে নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম মীমাংসা বঙ্গদেশের স্মৃতিশাস্ত্রে। বঙ্গদেশের ব্যাকরণ-চর্চ্চা সম্পূর্ণ ফলের দিকে দৃষ্টি করিয়া। বঙ্গদেশের সাহিত্য-চর্চ্চার ন্যায় সাহিত্য চর্চ্চার প্রণালী কুত্রাপি নাই। বঙ্গদেশের ন্যায় দর্শন সকল দর্শনের রাজা। বঙ্গে আচার্য্যগণ জন্মিয়া সকল শাস্ত্রের সহিত তর্ক শাস্ত্রের সম্বন্ধ এমন পরিবদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, ক্রমে ভারতীয় সকল বিদ্বৎস্থানেই এই তর্কশাস্ত্রের রাজতা স্বীকৃত হইল, যে কোনও শাস্ত্রে রাজশক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তর্কশাস্ত্র আরাধিত হইতে লাগিল, এবং প্রধান সমাজ স্থানে বিদ্যা-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে এই তর্কশাস্ত্রকেই প্রাধান্য-পদ অর্পণ

করিয়া তদধীনে অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিতে থাকিল। এক্ষণে সেই রাজতা ভারত-ব্যাপিনী।

বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি দেশের গৌরববর্দ্ধক সামগ্রী। সেই গৌরবকর সামগ্রীগুলির মধ্যে যে দেশ হইতে যাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা সেই দেশের সামগ্রী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। তদনুসারে তর্কশাস্ত্রটীকে বঙ্গদেশের সামগ্রী বলিয়া সকল স্থানের বিষয়গুলীই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব তর্কশাস্ত্রের রাজতায় বঙ্গদেশেরই রাজতা। জাতীয় গৌরবের পক্ষপাতী কি ধনবান্ বিষয়িলোক, কি শাস্ত্রসেবী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সকলের পক্ষেই বদ্ধপরিকর হইয়া এই শাস্ত্রের রক্ষা সাধন করা বিধেয়। কাল মাহাত্ম্যে লোকে ক্রমশঃ অল্পায়ুঃ ও হীনবল হইয়া আসিতেছে। অর্থাগম বিরহিত কঠিন পরিশ্রম আর কেহ কামনা করেনা। আশুবোধ্য দর্শনাদি লইয়াই এক্ষণে অনেকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু প্রকৃত সুসার সামগ্রী সমাজে না থাকিলে সমাজের গুরুত্ব নষ্ট হইবে। এক্ষণে সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ করা, এবং সমাজের সংস্থাপক প্রাচীন মহাত্মাগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

শুধু জাতীয় রাজতা রক্ষার জন্য তর্কশাস্ত্র রক্ষার আবশ্যকতা নহে। শাস্ত্রীয় সমাজের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য সাধন করিবার ভার তর্কশাস্ত্রেরই স্কন্ধে সমর্পিত। শ্রুতিতে আদিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত তিনটী উপায় পর পর অবলম্বন করিতে হইবে। যথা,

১। শ্রোতব্যঃ।

২। মন্তব্যঃ।

৩। নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

"শ্রোতব্যঃ" শব্দের অর্থ কি? প্রথমে শ্রুতি-সাহায্যে নির্ণয় করিতে হইবে। সেরূপ করিলে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব মুক্তি-প্রযোজকত্ব ও অন্যান্য নানা বিষয় সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নির্ব্বিবাদে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ উপনিষদে নাই। বিভিন্ন উপনিষদে আপাততঃ দৃষ্টিতে কেবল বিভিন্ন মতের খণ্ডনই পরিলক্ষিত হয়। কোন' উপনিষদে 'অসৎ' খণ্ডন করিয়া 'সৎ' সংস্থাপিত হইয়াছে। কোন' উপনিষদে 'সৎ' খণ্ডন পূর্ব্বক 'অসৎ' সংস্থাপন করা হইয়াছে। কোন' উপনিষদে 'ভূয়' 'তয়' করিয়া ব্রহ্মকে বুঝান হইয়াছে। কোন' উপনিষদে 'তৎসমুদয়কেই' ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সর্ব্বাংশের একবাক্যতা করিতে গেলেও মত পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। ইহা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার সপ্রমাণ করিয়াছেন। এ কারণ দ্বিতীয় উপায় উক্ত হইয়াছে "মন্তব্যঃ।" অর্থাৎ অনুমাতব্যঃ। স্মৃতিও আছে 'মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।' সহচার, দৃষ্টান্ত বা উপকথা সাহায্যে উপপত্তি হয় না। উপপত্তি প্রণালী যে কত কঠিন তাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কতক প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রুতির তাৎপর্য্যজ্ঞানে গোলযোগ ঘটিলে প্রত্যেক স্থলেই 'পক্ষ' 'হেতু' 'সাধ্য' 'পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান' 'কার্য্যকারণভাব' ও তর্কসাহায্যে ব্যাপ্তি নির্ণয় করিতে না পারিলে উপপত্তি করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে শ্রুতিও রহিয়াছে, ন প্রবচনেন। ঋষি-আদেশ রহিয়াছে,

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণাভিসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

অতএব শ্রোতব্যঃ এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়া আর্য্যদর্শন মাত্রেই রচিত বটে, কিন্তু মন্তব্যঃ এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়াই

তর্কশাস্ত্রের সৃষ্টি। এ কারণ, নিদিধ্যাসনের পূর্ব্বসোপানে উপনীত হইবার জন্ত তর্কশাস্ত্রেরই প্রয়োজনীয়তা।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা মুক্তির কিরূপ প্রযোজক তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে আদিষ্ট নিম্নলিখিত প্রমাণ দৃষ্টে অনুমান করা যায়। যথা,

যথা দৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নাম নৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবং॥

তর্কশাস্ত্রের প্রতিকূলে উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যা ঋষিগণ গ্রাহ্যই করিতেন না। মহাভারতে প্রমাণ যথা,

তত্রোপনিষদং তাত পরিশেষন্তু পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাং॥

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আস্তিকগণ তর্কশাস্ত্রের দায়িত্ব বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুসন্তান আত্ম-গন্তব্যপথ অবধারণের জন্য শ্রুতির অধীন হইবেন। শ্রুতিকে আবার আত্মগন্তব্য-পথ অবধারণের জন্য তর্কশাস্ত্রের অধীন থাকিতে হইবে। অতএব বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে গিয়া তর্কশাস্ত্রকে এক রকম সর্ব্বজ্ঞ সাজিতে হইবে।

তর্কশাস্ত্র যোগবলে এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ সাজে না। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ কঠিন নিয়মাবলীতে পরিবদ্ধ যে, প্রকৃত তত্ত্ব ইহার গণ্ডীর বহির্ভাগে কোনও রূপে যাইতে পারিবে না, এবং অপসিদ্ধান্ত ইহার সীমা স্পর্শ করিতে পারিবে না। তৃতীয় পরিচ্ছেদ দৃষ্টি করিলে অভিজ্ঞগণ কতক পরিমাণে ইহা বুঝিতে পারিবেন। তর্ক-সাপেক্ষ যে কোনও প্রকার শাস্ত্রের মীমাংসায় গোলযোগ দাঁড়াইলে, তার্কিকগণ

সেই গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করেন, এবং তর্কশাস্ত্রোক্ত উপায় সকল একে একে প্রয়োগ করিতে থাকেন। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে সম্পূর্ণ অমীমাংসিত সামগ্রী এই সকল গণ্ডীতে ফেলিয়া মীমাংসা করিবার সময় নৈয়ায়িকগণের বিচারের একটী বর্ণও অন্য সম্প্রদায়ের বোধগম্য হয় না। যদিবা বর্ণবোধ হয়, তবে তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারের দিকে দৃষ্টি করিয়া অভিভূত হইতে হয়। একবার একটী কাগজের কলে গিয়া দেখিয়াছিলাম, কলের এক ধারে ময়লা নেকৃড়া, ঘাষ, মাটী প্রভৃতি যত কিছু আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কলে সেই গুলি নানা আকার ধারণ করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে বিশুদ্ধ কাগজ হইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ভারতীয় শাস্ত্র-সমূহের সহিত তর্কশাস্ত্রের সম্বন্ধও ঠিক ঐ ভাবে পরিবদ্ধ। তর্ক-সাপেক্ষ শাস্ত্রীয় সামগ্রীসমূহ ইহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তর্কশাস্ত্রোক্ত উপায়ে উপায়ে কিছুক্ষণ দুর্ব্বোধ ভাবে পরিচালিত হইয়া, অবশেষে তাহার তাত্ত্বিক মীমাংসা বাহির হইয়া আসিবে। বাহ্য-বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিলে যেমন পাশ্চাত্যজাতির নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া থাক, অন্তর্বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ করিলে সেইরূপ ভারতীয় তর্ক-শাস্ত্রের কলাকৌশলে স্তম্ভিত হইবে।

(১) শ্রোতব্যঃ, (২) মন্তব্যঃ, (৩) নিদিধ্যাসিতব্যঃ, এই তিনটী সোপানের দ্বিতীয় সোপান তর্কশাস্ত্রের উপর ভর করিয়া গঠিত। ঐ সোপানে তর্কশাস্ত্রেরই সাহায্য মহর্ষিগণ গ্রহণ করিতেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ সোপানে উঠিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিবার জন্যই প্রথম সোপানে বিভিন্ন দর্শনকার বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। সাংখ্য এই প্রথম সোপানে পুরুষ প্রকৃতিকে অবলম্বন

করিয়া, ঘট পট মঠাদি বিভিন্ন সামগ্রী গুলিকে প্রকৃতিরই আবির্ভাবরূপে শ্রুতিবলে মানাইয়া লইলেন। বেদান্ত গাহিলেন "ওকথা কিছু নহে।" তিনি শ্রুতিবলে ব্রহ্মে মোহ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, "ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে মোহসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। বিষ্ঠা কৃমি শূকর পর্য্যন্ত সকলেই মোহাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। তুমি আমিও মোহাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। মোহবশেই মোহাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে ঘট পট মঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে যাহাদিগের উল্লেখ আছে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার মোহে আচ্ছন্ন। শিব, দুর্গা, বিষ্ণু প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মোহে আচ্ছন্ন। ইহারা কেহই বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম নহে। প্রলয় না হইলে ব্রহ্মর মোহসম্বন্ধ কস্মিন্ কালেও ঘোচে না।" যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, এ সকল কিছুই নাই, ভ্রম চলিয়াছে মাত্র, কেবল ব্রহ্মেরই সত্তা আছে, মীমাংসক এ কথা স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন "ব্রহ্মই নাই, আর সবগুলি আছে। তপঃ যজ্ঞাদি আবশ্যক, কিন্তু শিব দুর্গাদি অলীক। তোমারই ফলের জন্য মাত্র ঐ সকল কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।" এইরূপে নানাবিধ উপায়ে প্রথম সোপান চিত্রিত করিয়া দর্শনকারেরা মুমুক্ষুর তত্ত্বজিজ্ঞাসা বৃদ্ধি করাইয়া দ্বিতীয় সোপান অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন। সে সোপানে উঠিয়া শ্রুতির গলদেশ হইতে বৈচিত্র্য-হার খুলিয়া লওয়া হইল। বিবিধ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গেল। নিদিধ্যাসনের জন্য শ্রুতির একটী মাত্র সিদ্ধান্ত পরিরক্ষিত হইল। তাহাতে কোনও বৈচিত্র্য নাই। তাহাতে নির্দ্ধারিত হইল, বিষ্ঠা কৃমি শূকর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে নিরন্তর মোহোপহিত নহে। ব্রহ্মে মোহের কোনও সম্বন্ধ কখনই ঘটিতে পারে না। শিব দুর্গাদি মোহাচ্ছন্ন নহেন। বিশুদ্ধ

ব্রহ্মই ঐ সকল রূপ ও বিবিধ লীলা ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। ঘট-পট মঠাদি যেমন দেখিতেছি, তাহাদের স্বরূপও তাহাই। গল্প করিয়া প্রত্যেক পদার্থ উপপত্তি করা অপেক্ষা চক্ষুঃ কর্ণের প্রামাণ্য আছে। কোষাধীন বা চিরপ্রচলিত মহাজনের ব্যবহারাধীন শ্রুত্যুক্ত পদার্থই সিদ্ধ হয়। 'তন্ন' "তন্ন' করিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে, এবং স্ব স্ব অধিকার মত যথাশাস্ত্র উপাসনা করিতে হইবে।" এইরূপে দ্বিতীয় সোপানে উঠিলে প্রথম সোপানের বৈচিত্র্য-প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া আসে, এবং এই একটী মাত্র সিদ্ধান্তের জন্য স্বরূপ-নির্দ্দেশক বাক্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়। একারণ অতি যত্ন সহকারে এই দ্বিতীয় সোপানেরই উপকরণ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রক্ষিত হইত।

নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাথ্‌লা, বিক্রমপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি বঙ্গীয় প্রাচীন সমাজ মাত্রেই যত অভিজ্ঞ দার্শনিক জন্মিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় সোপানের সামগ্রী সমূহেরই সকলে প্রাণপণে রক্ষা সাধন করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, রামরতন রায় প্রভৃতি প্রাগুক্ত দেশীয় প্রাচীন ভূম্যধিকারী ও রাজন্যবর্গ সেই সামগ্রী দ্বারাই সমাজ বন্ধন দৃঢ় রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তর্ক সাহায্য গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে মাত্র সহচার দৃষ্টান্তাদির সাহায্য গ্রহণ করায় এবং মাত্র গল্পাংশে ঔপন্যাসিকতা দেখাইয়া চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করায়, আর কোনও দর্শনই দ্বিতীয় সোপানের কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ নহে, ইহা তৃতীয় পরিচ্ছেদ দৃষ্টে বিশেষ অভিজ্ঞগণ বুঝিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা দৃষ্টে পরে আরো অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। ফলে, দ্বিতীয় সোপানে উঠিবার জন্য প্রথম সোপানের আবশ্যকতা হইতে পারে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সোপানে সমাজ অধিষ্ঠিত থাকিলে প্রথম সোপানে তাহাকে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা অনাবশ্যক, অতি অল্প

পূর্ব্বেও বঙ্গীয় সমাজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কাউল সাহেব ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিদ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে অন্য কোনও দর্শনের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একবার জিজ্ঞাসা করেন "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একমাত্র ন্যায়দর্শনেরই পদ স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইয়াছে, অন্যান্য দর্শনের পদও পৃথক্ সৃষ্টি করা হয় না কেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দেন "যে দেশের দর্শনে স্বয়ং গৌতম কণাদ কর্ত্তৃক উচ্চ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, এবং যে দেশে তর্ক শাস্ত্র দার্শনিক-জীবন গঠন করে, সে দেশে অন্যান্য দর্শন মাত্র উপকথা সহযোগে পদার্থতত্ত্ব বিবৃত করিয়া থাকে বলিয়া দার্শনিক আসন প্রাপ্ত হয় না।" প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা উভয়েই পরম অভিজ্ঞ। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় দেশীয় প্রাচীনগণের সহিত ঐক্য হইত, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অভিপ্রায় বর্ত্তমান সময়ের বহু ধনবান্ বিষয়ীলোকের অভিপ্রায়ের সহিত ঐক্য হয়। কারণ, এক্ষণে বহু ধনবান্ প্রথম সোপানের বৈচিত্র্য-শোভা দর্শনেও অভিলাষী হইয়াছেন। 'শ্রোতব্যঃ' এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়া 'বেদান্ত' 'সাংখ্য' প্রভৃতি যত কিছু দার্শনিক কল্পনা সৃষ্ট হইয়াছে, সকল গুলি পর্য্যালোচনা করিবেন বলিয়া ঐ সকল সামগ্রী লইয়া বিদ্যামন্দিরাদি স্থাপন করিতেছেন। কিন্তু 'শ্রোতব্যঃ' এই অংশে আবদ্ধ না থাকিয়া যদি তৃতীয় সোপান অর্থাৎ 'নিদিধ্যাসন' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে ঐ সকল ধনবান্ কামনা করেন, তবে দ্বিতীয় সোপানেরও সামগ্রী পরিষ্কার রাখিতে হইবে। সেখানে প্রথম সোপানের সকল বৈচিত্র্য ঘুচাইয়া দিয়া পূর্ব্বলিখিত মহর্ষিগণের মত একমাত্র

সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করতঃ তত্ত্বস্থির করিতে হইবে। সে সিদ্ধান্তে বিষ্ঠা, শূকর, কৃমি সকলই ব্রহ্ম এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। শিব, দুর্গা, বিষ্ণুকে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞগণকে সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অবধারণ করা হয় নাই। যে সকল শ্রুতি প্রথম সোপানে অদ্বৈতবাদের সাধক হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতি দ্বিতীয় সোপানে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে থাকিবে। এসকল বিষয় 'অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন' নামক একখানি গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তর্কানুমানের আকার সাধারণের বোধগম্য হইবেনা। তবে তর্কশাস্ত্রানুমোদিত ত্যাজ্য ব্যাখ্যা ও গ্রাহ্য ব্যাখ্যা জ্ঞাত হইয়া দেশের প্রাচীন-প্রথা ও ঋষি-মীমাংসা অনুসারে নিদিধ্যাসনের পূর্ব্বপথ বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। একারণ, অদ্বৈত ব্যাখ্যায় দোষারোপ সহ তর্ক-সম্মত শ্রুতি-ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন গ্রন্থ হইতে গুরু শিষ্যের আপত্তি উপপত্তি ছলে নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ ব্যাখ্যার বিরোধী শ্রুতি উপনিষদের সকল ব্যাখ্যাই নিদিধ্যাসনের পূর্ব্ব সোপানে আস্তিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া, শক্তি লক্ষণাদি সাহায্যে অনুকূল ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

অদ্বৈতবাদ খণ্ডন।

শিষ্য। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্য কি ?

গুরু। আমি গৌতমকণাদাদি মহর্ষিগণের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়-ভুক্ত। ঋষি মতে এবং গুরুপরম্পরার মতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আমি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। উক্ত মহর্ষিগণ এবং আমার গুরু-পরম্পরা শ্রুতি বুঝিতেন না, অথবা শ্রুতিবিরুদ্ধমত চালাইয়া গিয়াছেন, একথা আমি কখনও স্বীকার করি না। তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ

মতকেই আমি শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য। অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত, হুজুগে হুজুগে অনেক বস্তুর প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অদ্বৈতবাদের প্রসার বৃদ্ধির হেতু আমি তাহাই মনে করি। কারণ, প্রাচীনগণের ধার্ম্মিকতা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহারা অদ্বৈতবাদের দ্বারা বঙ্গীয় সমাজ বন্ধন করিয়া যান নাই। শ্রুতি-সম্মত সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি-বিরুদ্ধ সামগ্রীর দ্বারা পূর্ব্বপুরুষেরা বঙ্গীয় সমাজ বন্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মনে এ পাপ বিশ্বাস কদাচ স্থান পাওয়া উচিত নহে। ধার্ম্মিকচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন "গীতাতত্ত্ব বুঝিলাম, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য-তত্ত্ব যে বুঝা দায়।" এই প্রবাদ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীনগণের ধার্ম্মিকতায় এবং দেশাচারের পবিত্রতায় বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক দেশেই শাস্ত্রীয় মীমাংসা হওয়া উচিত, ইহা আমার ধারণা।

শিষ্য। আপনার ধারণা বলিয়াই কি বেদান্তটা অশুদ্ধ হইয়া গেল?

গুরু। হিন্দুর ঘরে জন্মাইয়া কেহ কস্মিন্‌কালে বেদান্তকে অশুদ্ধ বলে না, বেদান্ত আলোচনা করিতে গিয়া বেদের কদর্থ আলোচিত হইয়া না পড়ে, ইহাই বুঝান দ্বৈতবাদিগণের উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়-বিশেষে একটী নবীন মত প্রবর্ত্তিত করিয়া, আত্মমতের পুষ্টির জন্য স্বপক্ষে কতকগুলো শ্রুতি উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সে ব্যাখ্যাকে ভাবলিয়া বেদান্ত বলা যাইতে পারে না। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে "জগৎ উচ্ছিন্ন দিবার জন্য অর্থাৎ কলিপ্রচার করিবার জন্য মায়াবাদের সৃষ্টি। বেদ বাক্যকে ছদ্মবেশ পরাইয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যেন এই শাস্ত্র কতই বেদার্থ-

বিশিষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা শ্রুতির কদর্থ এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র-বিশেষ। এই শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রে, ব্রহ্ম নির্গুণ, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অবৈদিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে জ্ঞানী ব্যক্তিরও পাতিত্য জন্মে।" পৌরাণিক বাক্যটী নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল। যথা,

পার্ব্বতীং প্রতীশ্বর উবাচ।

প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং।
মচ্ছক্ত্যা বেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃপরং॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ঃ সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্ববেদময়ার্থকং।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরং॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতং।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুণা বুদ্ধরূপিণা।
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকং।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়িত্বাতিগর্হিতং॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্মং তত্র চোচ্যতে॥

পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽপ্যপরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া ॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণং।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥

শিষ্য। নিরীশ্বর-বাদের প্রশংসা যে বচনে রহিল সে বচন কিরূপে প্রামাণিক হয়? ইহা অপ্রামাণিক বচন।

গুরু। 'নিরীশ্বরবাদ' শব্দের অর্থ তুমি কতটা অনুধাবন করিয়াছ? পদ্মপুরাণে পাগলের বচন নাই জানিবে। মন্ত্র এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ, ভিন্ন ব্রহ্ম নাই, ইহা কোন' মীমাংসকের মত। শ্রুত্যর্থও এই অনুসারেই তিনি মীমাংসা করিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় মন্ত্রেই প্রাধান্যবুদ্ধি সাধকের একান্ত প্রয়োজনীয়। এই দর্শন সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে একান্ত উপযোগী। মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনের প্রণেতা। ইহা অতি সাত্ত্বিকের শাস্ত্র। 'নিরীশ্বরবাদ' শব্দে 'নাস্তিবাদ' নহে। 'নাস্তিবাদ' যে অতি গর্হিত তাহা 'চার্ব্বাকমতি গর্হিতং' এই বাক্যে পরেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

শিষ্য। পুরাণাদিতে প্রক্ষিপ্ত বাক্য নাই, পুরাণের সকল বাক্যই প্রামাণিক, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

গুরু। যে বাক্যের মীমাংসা হইতে পারে, যে বাক্য শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ নহে, যে বাক্য তর্কানুমানের বিরুদ্ধ নহে, সে বাক্যকে সহসা অপ্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রমুখ

প্রাচীন আচার্য্যেরা ঐ ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া অদ্বৈতবাদ আলোচনা করিতে হিন্দুসন্তানকে একরকম নিষেধই করিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য। তবে কি সকল বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান আপনি চাহেন না ?

গুরু। চাহিবনা কেন ? যদি সেরূপ চিন্তা করা শাস্ত্রের আদেশ থাকে, যদি সেরূপ চিন্তা করা সেই মহাপুরুষের অভিলষিত হয়, যদি সেরূপ চিন্তা করিলে তাঁহার দয়া পাওয়া যায়, তবেই করিতে পারি। নিজের ইচ্ছায় পারি না। সেই পরম পুরুষের কৃপা লাভার্থ আমাদের অধিকার বুঝিয়া শাস্ত্র যেমন আদেশ করিবেন, তাহা করিতে পারি। শাস্ত্রোক্ত অধিকার মত শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা ব্রহ্মাভেদ চিন্তা করিতে আদেশ দিলেন। আমাদের অধিকার তত নহে। তবে কখনও যে সে অধিকার পাই নাই এমন নহে। প্রাতঃকালে চিন্তা করিবার বিধি "অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোক ভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥" ইত্যাদি। এরূপে অধিকার মত চিন্তা করিবার বিধি থাকিলেও, আমরা সকলেই ব্রহ্ম এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।

শিষ্য। আপনার মন অনুসারে তো শ্রুতি চলিবে না। শ্রুতিতে অদ্বৈত-সাধক বচন সহস্র সহস্র।

গুরু। ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি যত দর্শন আছে, শ্রুতি যে অদ্বৈত-পক্ষে ইহা কোনও দর্শনকারের বোধে আসে নাই। পরস্পরে নানা রকমে মতভেদ থাকিলেও, শ্রুতি যে দ্বৈত-পক্ষে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রুতিতে দ্বৈতভাব এতই স্পষ্ট যে, বৈদান্তিকগণের মধ্যেও রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সহিত একমত হইতে পারিলেন না।

শিষ্য। সকলে যদি পাগল হইয়া থাকেন?

গুরু। অপরাধ?

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রভৃতি অদ্বৈত-ভাবে ভিন্ন ব্যাখ্যা হয় না।

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে অদ্বৈত-ভাব আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই বাক্যে কি বুঝা যাইতেছে?

গুরু। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই বাক্যটীর বিশেষ বিচার করা প্রয়োজন। কারণ সকল বাক্য পদার্থ-সাধক নহে। ঘটপটাদি মৃত্তিকা, গঙ্গাগোদাবরী প্রভৃতি নদী, রূপ রস গন্ধাদি গুণ, এইরূপ প্রয়োগসকল পদার্থ-সাধক। আর এক প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। যথা, শালগ্রামই সাক্ষাৎ বাসুদেব, গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম, জলই নারায়ণ, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী, ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, ইত্যাদি। 'শালগ্রাম সাক্ষাৎ বাসুদেব' এই বাক্য, শালগ্রামে বাসুদেব-বুদ্ধি করিবার জন্য হিন্দুর প্রতি আদেশ-বাক্য। 'গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম' এই বাক্য গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবার জন্য, মাত্র শিষ্যের প্রতি আদেশ-বাক্য। গঙ্গাতিরিক্ত তীর্থ থাকিলেও গঙ্গার সাধককে সর্ব্বতীর্থ-বুদ্ধি করিতে হইবে; 'গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী' এই বাক্যের দ্বারা তদ্বিষয়েই আদেশ করা হইয়া থাকে। ঘণ্টাতিরিক্ত বাদ্য থাকিলেও অন্য বাদ্যের অসদ্ভাব-স্থলে ঘণ্টারই সর্ব্ববাদ্য-বুদ্ধি করিয়া দেবপূজাদি করিতে হইবে, 'ঘণ্টা সর্ব্ব-বাদ্যময়ী' এই বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। এই গুলি আদেশ-বাক্য, তোমাকে এই এই রূপ বুদ্ধি করিতে হইবে, এ ভাবের

উল্লেখ না থাকিলেও শাস্ত্রমতে উক্ত বাক্যগুলির তাৎপর্য্য তাহাই। পরস্পর বিভিন্ন সামগ্রী, ইহা সিদ্ধ থাকিলে সে বাক্যপদার্থ সাধক হইতে পারে না। অতএব 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং' এই শ্রুতির দ্বারা যদি আত্মাতিরিক্ত পদার্থের সত্যতা সাধন করা হইয়া থাকে, তবে 'স আত্মা তত্ত্বমসি' এই দুই অংশও পদার্থ সাধক নহে, সিদ্ধ-পদার্থে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবার জন্য শ্বেতকেতুর প্রতি আদেশ-বাক্য মাত্র। 'সকলেই ব্রহ্ম' ঈদৃশ বাক্য যে পদার্থ-সাধক, কুত্রাপি ইহার উল্লেখ নাই। অধিকন্তু, এই সকল বাক্য, আদেশবাক্য মাত্র তাহা 'তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা উপক্রমেই স্পষ্টভাবে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিষ্য। শ্বেতকেতুর প্রতি এরূপ আদেশ করিবার প্রয়োজন কি?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্যাদির পর শ্বেতকেতু যে অবস্থায় উপনীত হইলেন, সে অবস্থার উপাসনাই সকল বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান করা। অবস্থাভেদে 'একত্ব' 'পৃথক্ত্ব' প্রভৃতি বিবিধ বুদ্ধি সহ উপাসনার বিধান আছে। ভগবৎগীতায় উক্ত হইয়াছে,

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং॥

'স আত্মা' 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যদ্বয় যে উপাসনার্থ আদিষ্ট হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিবার পক্ষে আরো হেতু আছে। যদি পদার্থ-তত্ত্বটী শ্বেতকেতুর কর্ণে উপদেশ করাই পিতার উদ্দেশ্য হইবে, তবে পুত্রকে দীর্ঘকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদিতে নিয়োজিত করিয়া অধিকার প্রতীক্ষা করিতে হইত না। শ্বেতকেতু যে অবস্থায় উপনীত হইলেন, সেই অবস্থার উপাসনাই আদিষ্ট হইল বলিতে

হইবে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থ অনুশীলন করিলে জানিতে পারা যাইবে, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্মজ্ঞান করিবার শাস্ত্রীয় বিধি আছে। ঐ জ্ঞান আহার্য্য-জ্ঞান, অর্থাৎ ঘট-পটাদি ব্রহ্ম না হইলেও তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হয়। এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে পাঠক এইটুকু জানিয়া রাখিবেন, শ্বেতকেতুকে সর্ব্বজ্ঞ করাই পিতার উদ্দেশ্য। তাহার হেতু এই, পিতা উপক্রমে বলিয়াছিলেন "তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনা-শ্রুতংশ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি।" অর্থাৎ "সৌম্য তুমি কি গুরুর নিকট এমন কোনও আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অসম্মত সম্মত হয়, অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ সকল বিষয়েরই তোমার জ্ঞান হইতে পারে?" অতএব পুত্রকে যখন সর্ব্বজ্ঞ করা প্রয়োজন, তখন পূর্ব্ব-কথিত 'আহার্য্য' জ্ঞানটাই যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

শিষ্য। 'স আত্মা তত্ত্বমসি' এই বাক্য যদি আহার্য্যজ্ঞানপর আদেশ-বাক্য হয়, তবে 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং' এই অংশের দ্বারা আত্মাতিরিক্ত পদার্থের সত্যতা সিদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা কি হইতেছে?

গুরু। এ পক্ষে এখনও সন্দেহ? 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই বাক্য ঘটক 'এতৎ' শব্দটী পরমাণুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার হেতু এই, অব্যবহিত পূর্ব্বেই পরমাণু সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব ঐ বাক্যের অর্থ "এই নিখিল ভৌতিক জগৎ পরমাণ্বারব্ধ।" অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন, ঘট পটাদি সমুদায় ভ্রমজ্ঞানের বিষয়। সে মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন "তৎ সত্যং।" অর্থাৎ, এই সমুদয় প্রমাজ্ঞানের বিষয়। নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন 'সৎ'

অর্থাৎ 'সত্য' বস্তু হইতে 'অসৎ' অর্থাৎ 'মিথ্যা' বস্তু জন্মিতে পারে না। শ্রুতিও তাহাই বলিলেন। গীতায়ও বলিয়াছেন 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।' অর্থাৎ শূন্য হইতে যেমন পারমার্থিক বস্তু জন্মে না, সেইরূপ 'সৎ' হইতে অপারমার্থিক বস্তু জন্মে না। এই বচনের বিশেষ বিচার মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শিষ্য। "এতৎ" শব্দে পরমাণু বুঝিলেন কিরূপে? অব্যবহিত পূর্ব্বে 'পরমাণুর' সংস্থাপন গগনকুসুমবৎ অলীক।

গুরু। শ্রুতিটী দেখ "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং।"

শিষ্য। একি হাসির কথা বলিলেন। ইহা বিলীনাবস্থার বর্ণনা। সকল বস্তু লয় পাইয়া পরম দেবতাতে পর্য্যবসিত হয়। পরম দেবতা শব্দে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

গুরু। দেবতা শব্দের শক্যার্থের দ্বারা কথনও ব্রহ্ম বুঝায় না। তবে লক্ষ্যার্থের দ্বারা ব্রহ্মকে দেবতা শব্দে গ্রন্থে এক একবার অভিহিত করা হইয়াছে। একারণ লক্ষ্যার্থের দ্বারা "পরস্যাং দেবতায়াং" শব্দে সাধারণ বুদ্ধিতে 'ব্রহ্ম' বুঝিবার কথা বটে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা চলিবে না। এথানে 'পরস্যাং দেবতায়াং' এই শব্দ পরিভাষাপর। কাহাকে এই পরিভাষা প্রদান করা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দিতেছেন, যথা "স য এষোঽণিমা।" 'পরাদেবতা' শব্দে যদি ব্রহ্মই আনা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইবে তবে "সয এষোঽণিমা" এই অংশ প্রদর্শন করান ব্যর্থ হয়। অতএব এই অণিমা শব্দের দ্বারা বুঝা গেল, প্রলয় কালে সৃষ্ট বস্তু পরমাণুতে পর্য্যবসিত হইল। সৃষ্টিকালে প্রথমেই তেজঃ জল প্রভৃতি বহু শরীর

ব্রহ্মই পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পরমাণু হইতে ঐ সকল সৃষ্টি করিয়া নিজে তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহা পরমাণুমূলক। তৎপরে যাহা সৃষ্ট হইল তৎসমুদয়ও পরমাণুমূলক। অতএব অণিমা সিদ্ধ করিয়া 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং' এই শ্রুতি উত্তম সঙ্গত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত তেজঃ, জল প্রভৃতি হইবার সময় সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এইরূপ ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সর্ব্বং স্যাং প্রজায়েয়' এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। অতএব 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' ইহার অর্থ 'ব্রহ্মাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এরূপ করা অসঙ্গত। 'বহু' ও 'সর্ব্ব' শব্দে অনেক প্রভেদ। 'বহু বস্ত্র নীলবর্ণ' বলিলে সর্ব্ব বস্ত্র নীলবর্ণ বুঝায় না। এতদ্ব্যতীত, অণিমাই যদি ব্রহ্ম হইবে, আর ব্রহ্মই যদি সকল বস্তু হইবে, তবে 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' না বলিয়া 'এষ আত্মা ইদং সর্ব্বং' অথবা 'এষ ইদং সর্ব্বং তৎসত্যং' বলিলেই চলিত। 'স আত্মা' এই অংশ না বলিলেও তাহা হইলে কোনও হানি হইত না। অবিদ্যাজন্য বিকার (বিবর্ত্ত) অভিপ্রায়ে যদি 'যন্' প্রত্যয় করিয়া 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' রাখা হইয়া থাকে, তবে 'তৎসত্যং' এই অংশ লাগে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে সৃষ্ট সমুদয় ভ্রম জ্ঞানের বিষয়। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইহার পরে 'তৎসত্যং' না দিয়া মধ্যস্থলে 'তৎসত্যং' দেওয়ায় তদবধি সত্যত্ব-নির্ণয় হইয়া গেল ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। এতদ্ব্যতীত, সবিধস্থ শব্দের পর 'তৎ' প্রয়োগ না করিয়া 'এতৎ' প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। এখানে তাহাও করা হইয়াছে। অণিমা উল্লেখের পরেই 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তি বাক্যগুলিও যদি পরস্পরের সহিত 'তাদাত্ম্য' ব্যঞ্জক হইত, তবে এই 'এতৎ'টী ব্যবহার করিয়া আবার ছাড়িতে হইত না। 'আত্মা'

ইহাদের সহিত তাদাত্ম্য-ব্যঞ্জক নহে, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যে বহুপূর্ব্বে আত্মার সংস্থাপন থাকায় 'এতৎ' শব্দ পরিত্যাগ করতঃ 'স আত্মা' বলিতে হইয়াছে।

শিষ্য। 'তৎসত্যং' এই বাক্যের 'তৎ' কিরূপে রহিয়াছে? এখানেও 'এতৎ' প্রয়োগ করা তবে তো উচিত।

গুরু। সদ্‌জন্য পদার্থ সৎ হয়, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই 'তৎ' প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তৎ' শব্দের অর্থ 'তস্মাৎ'। সুতরাং কোনও দোষ হয় নাই।

শিষ্য। 'অণিমা' শব্দ ব্রহ্ম তাৎপর্য্যে না লাগাইলে অনেক দোষ ঘটে।

গুরু। কোনও দোষ নাই। 'অণিমা' শব্দে 'ব্রহ্ম' এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। 'পরস্যাং দেবতায়াং' এবাক্যেরও লক্ষণা করিয়া 'ব্রহ্ম' বুঝিতে হইবে? 'অণিমা' শব্দেরও লক্ষণা করিয়া 'ব্রহ্ম' বুঝিতে হইবে? যদি ব্রহ্মেই লক্ষণা করিতে হয় তবে 'স য এষো-ঽণিমা' এই অংশ প্রদর্শন না করিলেও চলিতে পারিত ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'পরস্যাং দেবতায়াং স য এষোঽণিমা' এই শ্রুতির আমরা যে মীমাংসা করিলাম, ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও সেই মীমাংসা করিয়াছেন। 'ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ' এই সূত্রের ব্যাখ্যা কালে এবিষয় অগ্রে প্রকাশিত হইবে।





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

‘সদেব সৌম্যেদ মগ্র আসীৎ’ ‘আত্মা এক এবাগ্র আসীৎ’ ‘অসদ্বা ইদ মগ্র আসীৎ’ প্রভৃতি শ্রুতি সমূহের স্বারসিক ব্যাখ্যা। ব্রহ্মে ‘সগুণ নির্গুণ’ ‘কর্ত্তা অকর্ত্তা’ প্রভৃতি বিশেষণের সার্থক্য। পরমাণু সংস্থাপন। ন্যায়মতে প্রকৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ। ‘অজামেকাং’ ইত্যাদি শ্রুতির স্বারসিক ব্যাখ্যা।

শিষ্য। আপনি পরমাণু সিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্‌কালে অণিমাদি কিছুই ছিলনা। এক মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন ইহা শ্রুতির মধ্যে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ‘ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থও ছিল’ এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা, এসম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ শ্রুতির ভিতরই আছে।

গুরু। অশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, শ্রুতি তাহার বিরোধে কথা বলিবেন, এমন হইতে পারে না। ‘ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল না’ একথা কোথায় স্পষ্ট লেখা আছে বল।

শিষ্য। এই দেখুন প্রথমেই বলিতেছেন, একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। যথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং”। এই দেখুন তাহার পরেই বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল যাহারা

বলেন, তাঁহাদের মত ঠিক নহে। যথা, "এক আহুরসদেবেদ মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত। কুতস্তু সোম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।"

গুরু। পূর্ব্বাংশের দ্বারা 'সৎ' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' ছিলেন ইহা সিদ্ধ হইতেছে। পরাংশে অর্থাৎ যে অংশে 'অসৎ ছিল না' বলিতেছেন, 'অসৎ ছিল' সেই অংশে সিদ্ধ হইতেছে।

শিষ্য। কিরূপে?

গুরু। শূন্যবাদিগণের মতে 'একমেবাদ্বিতীয়মসৎ' সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, দ্বিতীয় পদার্থ ছিল না। 'অসৎ ছিল না' ইহা যে অংশে প্রতিপাদিত হইতেছে, শূন্যবাদিগণের মত নিরাস করাই সেই অংশের উদ্দেশ্য। পরমাণুবাদও নিরাস করা যদি সে অংশের উদ্দেশ্য হইত, তবে 'অসৎ' এই শব্দে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বিশেষণ দেওয়া চলিত না। কারণ পরমাণু 'অদ্বিতায় অসৎ' নহে, 'সদ্বিতীয় অসৎ'। যেহেতু তাহা কোটী কোটী। শ্রুতির পূর্ব্বাংশের দ্বারা ব্রহ্ম ছিলেন প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন্ অর্থ ব্যঞ্জক 'অসৎ' ছিলনা, কোন্ অর্থ ব্যঞ্জক 'অসৎ' ছিল, তাহা পরার্দ্ধে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'ব্রহ্মই মাত্র ছিলেন' যদি ইহা প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হইত, পূর্ব্বাংশের দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। দুইটী অংশ দিবার প্রয়োজন হইত না। প্রয়োজন হইলেও 'অসতের' উপর 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বিশেষণ দেওয়া চলিত না। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই সাধারণ বুদ্ধিতে 'ব্রহ্মভিন্ন কিছু ছিল না' ইহা বুঝিবার কথা। তাহার উপর স্পষ্ট করিয়া যদি বলা যায় 'অসৎ'

ছিল না, তবে আর রক্ষা থাকেনা. জগৎ হইতে একেবারেই তত্ত্ব লোপ হইয়া যায়। এই কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন্ অর্থ ব্যঞ্জক 'অসৎ' ছিল না তাহা দ্বিতীয় শ্রুতিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বিশেষণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অসৎ ছিল এ বিষয়ের শ্রুত্যন্তরও অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

শিষ্য। 'অসৎ' শব্দের দ্বারা কি পরমাণু লাভ হয় ?

গুরু। সৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। সে ভাবে ধরিলে অসৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিচারে যে সদ্বিতীয় অসৎ সংস্থাপিত হইয়াছে, পরমাণু সেই সদ্বিতীয় অসতের অন্তর্গত।

শিষ্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' শব্দে 'সজাতীয় দ্বিতীয় রহিত' ও বিজাতীয় দ্বিতীয় রহিত' অর্থ করিতে হইবে। নচেৎ 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' দুইটী শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না। অতএব পরমাণু সিদ্ধ করিতে পারেন না।

গুরু। 'স য এষোঽণিমা' এই সকল বাক্যের ব্যাখ্যা স্থলেও অসৎ দেখাইয়া পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে, বিজাতীয় দ্বিতীয় সামগ্রী সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল। সকলের সহিত বিরোধ ঘটাইবার জন্য তোমার ইচ্ছামত ব্যাখ্যা কি স্বীকার করিতে হইবে? 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' দুইটী শব্দের প্রয়োগ করায় কোনও দোষ ঘটে নাই। অনিশ্চিত পদার্থে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাইতে হইলে 'পুনরুক্তি' দোষের মধ্যে নহে। এই বচনের মধ্যে কেবল মাত্র 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' ইতর-ব্যাবর্ত্তক নহে। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' এইরূপে একবার উল্লেখ করিয়া আবার বলা হইয়াছে, 'সদেবসোম্যেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ং' ইহাতে কি পুনরুক্তি থাকিয়া যাইতেছে না? রূপবৎ বস্তুর মধ্যে জলীয়, তৈজস এবং পার্থিব পরমাণু নিত্য,

ইহা বুঝাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে, 'ত্রীণিরূপাণীত্যেব সত্যং'। তুমি এই শ্রুতির যেরূপই ব্যাখ্যা কর, এই শ্রুতিটী যে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে তাহা উপনিষদ্ দেখিলেই জানিতে পারিবে। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' ইহা বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' ইত্যাদি শ্রুতি উল্লেখ করিলেন। অতএব অনিশ্চিত পদার্থে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাইতে হইলে পুনরুক্তিদোষ হয় না। "জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।" "সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।" ইত্যাদি বহু প্রয়োগই পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি যদি মনস্তুষ্টি না হয়, তবে একমেবাদ্বিতীয়ং এই শ্রুতিস্থ 'এক' শব্দের 'মুখ্য' অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল গোল মিটিতে পারে। কোষ যথা, একে মুখ্যান্য কেবলাঃ। অদ্বৈতবাদিগণের ব্যাখ্যা সুষ্ঠু নহে। দ্বিতীয়রহিত বলিলেই যখন ইষ্ট সিদ্ধি হয়, তখন 'সজাতীয় দ্বিতীয় রহিত বিজাতীয়দ্বিতীয় রহিত' এরূপ পৃথক্ ভাবে বলিতে হইবে কেন? দ্বিতীয় রহিত বলিলেই যদি ইষ্ট সিদ্ধি হয়, তবে 'লাল দ্বিতীয় রহিত' 'পীত দ্বিতীয় রহিত' 'শ্বেত দ্বিতীয় রহিত' 'স্থূল দ্বিতীয় রহিত' 'সূক্ষ্ম দ্বিতীয় রহিত' এরূপ প্রয়োগ কি কেহ করিয়া থাকে?

শিষ্য। 'সদেবসোম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতির যে অংশে 'অসৎ ছিলনা' বলিয়া স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে, সেই অংশ হইতে 'অসৎ ছিল' ইহা আপনি সিদ্ধ করিয়া লইলেন। যে শ্রুতিতে 'অসৎ' শব্দের নাম গন্ধ নাই, তাহার গতি কি হইবে? ঐতরেয়োপনিষদ্বাক্য দেখুন "আত্মা একএবাগ্র আসীদ্ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান সৃজত।"

গুরু। এক শ্রুতির দ্বারা যখন পদার্থান্তর সিদ্ধ হইতেছে, তখন অন্য শ্রুতি সে পদার্থের ব্যাবর্ত্তক হইতে পারে না। যে শ্রুতির

উত্থাপন করিতেছ, উহা বিশেষ বিচার করিয়া দেখ। ব্রহ্মব্যতীত পদার্থান্তর ছিল না এরূপ মর্ম্ম ঐ শ্রুতির দ্বারা আসিতেছে না। আত্মার প্রত্যক্ষাদি বিদ্যমান ছিল, তাহা 'তদৈক্ষত' বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে। 'মিষৎ' শব্দের, ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যই করিয়াছেন 'ব্যাপারবৎ'। সুতরাং ঐ সকল বাক্যের দ্বারাই দ্বৈতসিদ্ধি হইতেছে। 'একমাত্র ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন' এরূপ শ্রুতি অদ্বৈতবাদিগণ যখনই প্রদর্শন করিবেন, তাহা কর্তৃবিধায় লিখিত হইয়াছে এই মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ সেইরূপ শ্রুতির দ্বারা বুঝিতে হইবে "কর্ত্তারূপে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। দ্বিতীয় কেহ কর্ত্তারূপে ছিলেন না।" "আত্মা এক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকানসৃজত" এই শ্রুতিটী দৃষ্টে তোমার আপত্তি জন্মিতেছে। এই শ্রুতিটী কর্তৃবিধায় লিখিত ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 'নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ' এই অংশের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যই করিয়াছেন 'ব্যাপারবৎ আর কিছু ছিলনা।' যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই না থাকে তবে "ব্যাপারবৎ আর কিছু ছিল না" এই অংশ বিশেষ করিয়া বলিতে হয় না। এই সকল শ্রুতির সহিত বিরোধ পরিহার করতঃ নেহনানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি শ্রুতি সমূহেরও এইরূপই মীমাংসা করিতে হইবে। গ্রামে বহু আনাড়ী চিকিৎসক সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে "গ্রামে চিকিৎসকই নাই।" এই চিকিৎসক শব্দটী সুচিকিৎসক তাৎপর্য্যে উক্ত, এইরূপ মীমাংসা করিতে হয়। গ্রামে অসার মনুষ্য থাকিলে বলা যাইতে পারে "গ্রামে একজন মনুষ্য নাই।" এই বাক্যস্থ মনুষ্য শব্দ সারবান্ মনুষ্য তাৎপর্য্যে উক্ত এইরূপ মীমাংসা করিতে হয়। সেইরূপ বহুপদার্থসত্ত্বে যখন নেহনানাস্তিকিঞ্চন এইরূপ শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, আর আর সকল পদার্থই অসার; সার

পদার্থ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। মুখ্য কর্ত্তৃরূপে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনও বস্তু নাই, এরূপ মীমাংসা করিলেও চলে। স্তব তাৎপর্য্যে উক্ত ঈদৃশ বাক্যের মীমাংসা পরে লেখা হইবে।

শিষ্য। এই জাতীয় শ্রুতি যদি কর্ত্তৃবিধায় অথবা বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্যে লিখিত হইয়া থাকে, উপাদান বিধায় ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল এভাবের শ্রুতিও তো এক আধটী থাকা প্রয়োজন।

গুরু। কেন থাকিবে না? সদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল এবিষয়ে তৈত্তিরীয়োপনিষদে প্রমাণ দেখ, অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। এই শ্রুতির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থও ছিল। ব্রহ্ম ছিলেন ইহা 'সদেবসোম্যেদমগ্র আসীৎ' এই সকল শ্রুতির দ্বারা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছ। অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে লাগিল। 'সৎ' শব্দে যেমন 'ব্রহ্ম' অর্থ পাওয়া যায় 'সত্তাবিশিষ্ট' অর্থও পাওয়া যাইতে পারে। 'অসৎ' হইতে সেই অর্থবাচক 'সৎ' জন্মিতে লাগিল। জনক অবশ্য ব্রহ্মকেই বলিতে হইবে। 'তদাত্মক' পদার্থগুলিও স্বয়ং করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাহার জনক স্বয়ং, বিভিন্ন জনক নাই।

শিষ্য। 'তদাত্মক পদার্থ' ইহার অর্থ কি?

গুরু। ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ অর্থাৎ 'ওঁ' 'তৎ' 'সৎ' এই তিনটীর প্রত্যেকটীর দ্বারা 'ব্রহ্ম' অর্থ বুঝাইয়া থাকে। অতএব 'তদাত্মক' শব্দে 'ব্রহ্মাত্মক' পদার্থ; অর্থাৎ 'ব্রহ্মা' 'বিষ্ণু' 'মহেশ্বর' 'কালী' প্রভৃতি। ইহাদের অন্য জনক নাই। নিজেই জনক। এবিষয়ে আরও শ্রুতি রহিয়াছে যথা, অহং বহুস্যাং। এবং ভগবদ্‌গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শিষ্য। আপনি যে সকল শ্রুতির এই ভাবে অর্থ করিতেছেন, তাহা সগুণব্রহ্মপর বলিব। সগুণব্রহ্মপর বলিলে অনাদিবোধ, সর্ব্বজ্ঞতা, কৃতিমত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুষ্ঠু উপপত্তি হইতে পারিবে।

গুরু। ব্রহ্মে সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি নানা রকমের অবচ্ছেদ কল্পনার আবশ্যকটা কি? 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতির পরেই 'তদৈক্ষত' এই শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব 'সৎ' শব্দের পরিবর্ত্তে এই 'তৎ' শব্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। তবে ঘটপটাদি 'সৎ' না হইল কেন? ছান্দোগ্যোপনিষদে নির্গুণব্রহ্মের নাম গন্ধ নাই। উপক্রমে যে ব্রহ্মের কথা লিখিত, উপসংহারে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। নচেৎ উপক্রম উপসংহারের ঐক্য হয় না। বিশেষতঃ কারণরূপে যদি কৃতিমত্তাদি ব্রহ্মে সিদ্ধ হয়, তবে সে সকল সামগ্রীর নাশ কল্পাইলে গৌরব। যেহেতু সেই নাশের প্রাগভাব, তাহার নাশ, তাহার প্রাগভাব এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া যায়। ভূতাদির সূক্ষ্মবীজ কল্পাইলেও সেই দোষ। তবে আর কোন্ কার্য্যের জন্য নির্গুণ ব্রহ্ম কল্পাইতে হইবে?

শিষ্য। নির্গুণ ব্রহ্ম কোনও কাযে আসুন, অথবা না আসুন, অনেক সময় ব্রহ্মে 'সগুণ' 'নির্গুণ' উভয় বিশেষণই পাওয়া যায়। 'অকর্ত্তা' 'কর্ত্তা' উভয় শব্দের প্রয়োগই পাওয়া যায়।

শুরু। শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি করিবার জন্য ব্রহ্মে 'সগুণ' 'নির্গুণ' 'কর্ত্তা' 'অকর্ত্তা' প্রভৃতি নানারকমের অবচ্ছেদ কল্পনা করিতে হইবে এরূপ শ্রুতিও কি আছে? ব্রহ্মে 'সগুণ' বিশেষণ দিবার হানি নাই। যেহেতু তাঁহাতে নিত্যবোধ, নিত্যকৃতিমত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যমান। 'গুণ' শব্দে অনেক সময় 'সত্ব' 'রজঃ' 'তমঃ' এই ত্রিবিধ সামগ্রী বুঝাইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরাও ইহাকে ক্লৃপ্ত অদৃষ্টের মধ্যে পরিগণনা করেন। ব্রহ্ম তাহার অতীত। এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মে 'নির্গুণ' বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর কর্ত্তা। সুতরাং 'কর্ত্তা' বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা কার্য্য করিলে অদৃষ্ট জন্মে, ফলভোগ হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কর্ত্তা হইলেও তিনি আমাদের তুল্য ফলোপহিত কর্তৃত্ববিশিষ্ট নহেন। ব্রহ্মে 'অকর্ত্তা' বিশেষণ পাইলে, বুঝিতে হইবে, তিনি ফলোপহিত কর্ত্তা নহেন। তুমি যাহাকে 'কর্ত্তা' বলিতেছ, তাহাকেই 'অকর্ত্তা' বলিবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। বৃক্ষের শাখায় কপিসংযোগ থাকে, সর্ব্বত্র থাকে না। তথাপি, 'বৃক্ষ কপিসংযোগী' এই প্রয়োগই হইবে, 'বৃক্ষ কপিসংযোগী নহে' এরূপ প্রয়োগ হইবে না। যদি হয়, সকলে সে প্রয়োগ স্বীকার করিবে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মের যে অবচ্ছেদে 'কর্ত্তা' শব্দ প্রযুক্ত, সেই অবচ্ছেদেই 'অকর্ত্তা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যে সকল 'অস্মৎ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিজের উপাধি অবচ্ছেদেই বলিতে হইবে। যেহেতু ঘট, পঠ, আমি, তুমি, শিব, দুর্গা প্রভৃতি সকল প্রয়োগই উপাধি-উপহিত ব্রহ্মে। সেই উপাধি-উপহিত ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং।

'সত্বাবচ্ছেদে কর্ত্তা' ও 'অব্যয়ত্বাবচ্ছেদে অকর্ত্তা' এরূপ অর্থ করা

সঙ্গত নহে। আমরা কর্ত্তা; স্বর্গ, নরক, অদৃষ্ট ফলে লিপ্ত হই। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহা হন না। তিনি বলিতেছেন,

নমাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

এ বচন সঙ্গত করিবার জন্য বলিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় ঐ সকল ফলোপহিত কর্ত্তা নহেন। অতএব 'অকর্ত্তা' শব্দে তাহাই বুঝা উচিত। শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মই বল, আর সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকল প্রকার মোহাচ্ছন্নই বল, 'কর্ত্তা' 'অকর্ত্তা'শব্দের প্রয়োগ এক অবচ্ছেদেই রহিয়াছে বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মকে 'সগুণ' বলিতে হইলে তোমাদের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অবিদ্যা' ছিল, বলিতে হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে 'পরমাণু' প্রভৃতিই ছিল এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। অবিদ্যা নামক কোনও অতিরিক্ত পদার্থ ছিল ইহার প্রমাণ নাই। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জানিতে পারি যে, সাগর, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির উৎপত্তি বিষয়ে দুইটি সামগ্রী ছিল। নচেৎ 'ঋত' ও 'সত্য' দুইবার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইত না। 'ঋত' ও 'সত্য' উভয়েই সমানার্থক। অতএব উভয়েই নিত্য, ইহা ঐ শ্রুতিতেই জানা যাইতেছে। অবিদ্যা নিত্য নহে, যেহেতু তাহার নাশ আছে। অতএব সাগর, সূর্য্য, চন্দ্রাদির উৎপত্তি-বিধায় পরমাণুই ছিল, অবিদ্যা ছিল না। ঋষিকৃত নিঘণ্টু অর্থাৎ বেদাভিধানে 'ঋত' শব্দের 'উদক' 'ধন' ও 'সত্য' অর্থ করা হইয়াছে। তুমি মনের মত অর্থ করিয়া পদার্থের লোপ করিলে চলিবে না।

শিষ্য। 'ঋত' ও 'সত্য' দুইবার উল্লেখ থাকিলেও দুইটি পদার্থ সিদ্ধ করিব কেন? সেরূপ অর্থ করাই যদি অভিপ্রেত হইত, তবে 'ঋতে' 'সত্যে' এইভাবে দ্বিবচন প্রয়োগ করিয়া একটি শব্দের দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ পাইত।

গুরু। সমানই কথা। ‘বৃক্ষশ্চ বৃক্ষশ্চ’ এই ব্যুৎপত্তিতেই ‘বৃক্ষৌ’ সিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন শব্দের দ্বারা যখন সত্য পদার্থ নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন দ্বিবচন দেওয়া চলে না। ‘তরু’ শব্দ ব্যবহৃত রহিয়াছে, ‘বৃক্ষ’ শব্দ ব্যবহার করিলেন না কেন, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতেও পারে না। বিশেষতঃ বিজাতীয় দ্বিবিধ সত্য সংস্থাপন করা আবশ্যক-বিধায় দ্বিবিধ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব এই শ্রুতিবাক্যে যে দ্বিবিধ সত্য পাওয়া যাইতেছে, তাহারই এক (জড়) জাতীয়কে পরমাণু সংজ্ঞা, অপর (চেতন) জাতীয়কে আত্মা সংজ্ঞা নৈয়ায়িকেরা প্রদান করিয়াছেন। চকারদ্বয়ও সুস্পষ্ট ভেদসাধক ইহা ব্যুৎপন্নমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ব্রহ্ম নিত্য বস্তু অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন পুরাণাদিতে এবিষয়ে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে যুক্তিযুক্ত হইতে পারিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে,

সৃষ্ট্যুন্মুখঃ স্বকলয়াপি সসর্জ্জ সূক্ষ্মাং
নিত্যাং সমেত্য সদসৎ তমজং ভজামি॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বারাও ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অণিমা ছিল। সৃষ্ট পদার্থ লয় পাইলে পুনরায় অণিমাতেই পর্য্যবসিত হইল। এই অণিমাকে অবিদ্যা বলিতে পার না। যেহেতু অবিদ্যার নাশ আছে।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বারা পূর্ব্বে যে পরমাণু সংস্থাপন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিচার এখনও বাকি আছে। তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং। স য এষোঽণিমা। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং এই অংশের আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তৈজস পরমাণু জন্য

নিখিল সৃষ্ট বস্তু এইরূপ অর্থই আসা উচিত। তাহা কেমন করিয়া সঙ্গত হয়?

গুরু। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ দৃষ্টে জানা যায় যে, প্রথম সৃষ্ট তেজঃ তৈজস পরমাণু মূলক। তৎপরে সৃষ্ট সকল বস্তুতেই, এমন কি সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতিতে পর্য্যন্ত রূপবৎ-ভূতত্রিতয় বিদ্যমান। সুতরাং সৃষ্ট সকল বস্তুতেই তেজঃ বিদ্যমান, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের মত। অতএব পাশ্চাত্য সভ্যগণ যে বলিয়া থাকেন, সকল পদার্থেই ন্যূনাধিক ভাবে 'ইলেক্‌ট্রিসিটি' অর্থাৎ বিদ্যুৎ আছে, তাহা মিথ্যা নহে। তৈজস পরমাণু উল্লেখ করতঃ 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' বলা অসঙ্গত হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন অসৈাব চোপপত্তে-রেব উষ্মা। সকল পদার্থেই তৈজসাংশ না থাকিলে স্ব স্ব পরমাণুতে পদার্থ সকল পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। নৈয়ায়িকেরা যাহাকে পরমাণু সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, সে বস্তু শাস্ত্রসিদ্ধ কিনা জানিতে হইলে ভগবৎগীতারও আলোচনা প্রয়োজনীয়। ভগবান্ কোন্ কোন বস্তুতে প্রকৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিলেন তাহা প্রথমে দৃষ্টি কর,

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, (ঐশ্বরিক) জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা, এই কয়েকটী সামগ্রী অপরা প্রকৃতি। এতদ্ব্যতীত, জীবভূতা অর্থাৎ জীবে ভূতা বা জীবে স্থিতা প্রকৃতি পরা প্রকৃতি নামে অভিহিত। নৈয়ায়িকেরা এই প্রকৃতিকে 'অদৃষ্ট' সংজ্ঞা

প্রদান করিয়াছেন। জন্য মাত্রের প্রতি অদৃষ্টের কারণতা থাকায় তাহাকে 'পরা প্রকৃতি' সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ জন্ম দ্রব্যের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতি সংস্থাপন করিয়া তাহার কার্য্য বলা হইয়াছে,

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়

অর্থাৎ 'যাবতীয় ভূত প্রকৃতি মূলক।' এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে প্রকৃতি অনাদি। পরা প্রকৃতি অর্থাৎ অদৃষ্টের অনাদিত্ব তদীয় ধারা লইয়া, ইহা নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই অদৃষ্ট-ধারার প্রযোজক অহংকার, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্ম বাসনা। তাহারও ধারা লইয়া অনাদিত্ব বুঝিতে হইবে। আর আর যে সকল প্রকৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদেরও অনাদিত্ব কি এইরূপ ধারা লইয়া? 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ' ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় জলধারা অনাদি নহে। অন্ম বাক্যের দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যথা, "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্ত-নিধনান্যেব"—অর্থাৎ ব্যক্ত-মধ্য ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, অব্যক্তেই পুনরায় তাহাদের নিধন অর্থাৎ লয় হইয়া থাকে। ভূতের অব্যক্ত অবস্থা অর্থাৎ নৈয়ায়িকেরা যাহাকে পরমাণু সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই বচনের দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। * অতএব

* নৈয়ায়িকেরা কেহ কেহ বলেন, স্থূল ক্ষিত্যাপ্তেজঃ প্রভৃতি পরমাণুপুঞ্জা-রব্ধক। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি, যাঁহারা পরমাণু স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, ত্র্যসরেণুপুঞ্জই নিত্য চরম সূক্ষ্ম অবয়ব তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত তত্ত্বসার নামক গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয় এ বিষয় পরিপাটী ক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পরমাণু নামে যে বস্তু সিদ্ধ করিতেছি, স্থূল ক্ষিত্যাপতেজঃ প্রভৃতির উপাদান চরম সূক্ষ্ম নিত্যাবয়বপুঞ্জ সাধন করাই তাহার তাৎপর্য্য, এ মীমাংসা বোধ হয়

ভূতধারায় অনাদিত্ব না থাকিলেও পরমাণুরূপী ক্ষিত্যাদিকে প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়া জড় ভূতের আরম্ভকরূপে তাহাদিগকে উল্লেখ করায়, কোনও দোষ ঘটে নাই। অব্যক্ত অথচ মূর্ত্ত কোনও সামগ্রী লইয়া ব্রহ্ম নিখিল ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত-মূর্ত্তিনা এই বাক্যের দ্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'অব্যক্তমূর্ত্তিনা' এই পদ 'ময়া' এই পদের বিশেষণ বলিয়া যেন কেহ বিশ্বাস না করেন। ব্রহ্ম মূর্ত্ত-পদার্থ নহেন, ইহা সর্ব্ব-সম্মত। অতএব জটিল ভাবে অস্বারসিক ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? 'অব্যক্তেন' এইটুকুর মাত্র উল্লেখ থাকিলে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা চলিত। এতদ্ব্যতীত, ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ শরীর ধারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এবিষয়ের

অভিজ্ঞগণের নিকট বিবৃত করা বাহুল্য। তবে, 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি' 'অব্যক্ত নিধনান্যেব', 'অব্যক্তমূর্ত্তিনা' ইত্যাদি বাক্যের 'অব্যক্ত' শব্দ ত্রাসরেণু পক্ষে সঙ্গত হয় কিরূপে ইহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এ কারণ, 'অব্যক্ত' শব্দের কিরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই, সহজে যাহার প্রত্যক্ষ হয় না, যাহার প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ উপকরণের আবশ্যক তাহা অব্যক্তের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। জলাদিতে এমন কীট বিদ্যমান যাহা সহজতঃ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এই সকল কীটকে কি ব্যক্ত কীট বলিতে হইবে? সেইরূপ গবাক্ষবিবরাগত সূর্য্য-রশ্মি যোগে যদি কোনও ক্ষুদ্রতম বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব পায়, তাহাকেও অব্যক্ত বস্তুর মধ্যেই পরিগণিত করিলে হানি নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে আরো বিশেষত্ব এই, সূর্য্যরশ্মিযোগে গবাক্ষবিবরপথে অন্ধকার গৃহে যে চরম সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্ট হইতে পারে, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু সমূহও যন্ত্র যোগে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ত্রাসরেণু উক্ত বিবর পথেও দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এই সকল যুক্তি লইয়া মূলগ্রন্থে 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে।

বহু প্রমাণ আছে। অতএব 'অব্যক্তমূর্ত্তি' ব্রহ্মই বা জগৎ সৃষ্টি করিলেন কই? বিশেষতঃ হিরণ্যগর্ভ শরীরের সৃষ্টিও 'অব্যক্তমূর্ত্তি' হইতেই। এই 'অব্যক্তমূর্ত্তি' সামগ্রীকে নৈয়ায়িকেরা পরমাণু সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। 'অব্যক্তমূর্ত্তি' বা ভৌতিক প্রকৃতির সাহায্যে যে সকল সৃষ্ট হইয়াছে, নাশকালে তাহারা কোথায় যাইবে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন,

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে, পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥

অর্থাৎ "সৃষ্ট ভূত সমূহ কল্পক্ষয়ে প্রকৃতিতেই লীন হয়। কল্পাদিতে আবার ভূত সৃষ্টি করিয়া থাকি।" সেই সৃষ্টির সময় আবার প্রকৃতির সাহায্য লইতে হয় কিনা, এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ বলিতেছেন—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।

অর্থাৎ সহকারিণী প্রকৃতিকে লইয়াই আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।

শিষ্য। সাঙ্খ্যমতানুযায়ীরা যাহাকে প্রকৃতি বলেন, তাহা কি তবে প্রকৃতি নহে? আপনি যাহা প্রদর্শন করাইলেন তাহাই কি তবে প্রকৃতির স্বরূপ?

গুরু। ভগবান্ যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই যে প্রকৃতি, এবিষয়ে সন্দেহ করিও না। অদৃষ্টকে প্রকৃতি বলে, ইহা গীতার তুল্য ন্যায়শাস্ত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ অপরা প্রকৃতি রূপে পরমাণ্বাদি আরও কতিপয় বস্তুকে নির্দ্দেশ করিলেন। অতএব 'প্রকৃতি' শব্দে এই সকল বস্তুই বুঝিতে হইবে। 'প্রকৃতী

কৃতিবস্য' এইরূপ অর্থ করিলে 'প্রকৃতি' শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়া থাকে। দুর্গা কালী প্রভৃতি সেই জন্যই প্রকৃতি নামে অভিহিতা হয়। 'প্রকৃষ্টাচাসৌ কৃতিশ্চেতি' এই কর্ম্মধারয় সমাসের দ্বারাও 'প্রকৃতি' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যখন যেরূপ আবশ্যক, তখন সেইরূপ অর্থ করিতে হইবে। প্রকৃতিকে পদার্থান্তর স্বীকার করিতে হয় না। অদৃষ্ট, পরমাণু প্রভৃতিকে প্রকৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সেই প্রকৃতিই জগৎ উৎপন্ন করে, ব্রহ্ম অধ্যক্ষ অর্থাৎ কর্ত্তা থাকেন। প্রমাণ যথা,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।

ফলে, সাঙ্খ্যমত খণ্ডন করা এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে। প্রকৃতি শব্দের উপপত্তি ন্যায়মতে কতরূপ হইতে পারে তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করান হইল। কিন্তু পাঠকগণ এইটুকু মাত্র এখানে জানিয়া রাখিবেন সাঙ্খ্যের প্রকৃতির অথবা অদ্বৈতবাদের অবিদ্যার স্বরূপ নির্দ্দেশক একটীও প্রমাণ ঐ সকল দর্শনকার এপর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে পরমাণু-সাধক প্রমাণ কোটী কোটী।

শিষ্য। অদ্বৈতবাদের অবিদ্যা বা সাঙ্খ্যের প্রকৃতির সাধক প্রমাণ, ঐ সকল দর্শনকার একটীও দেখাইতে পারেন নাই, এ কথাটী বলিতে পারেন না। একটী প্রমাণ তাঁহাদের আছে। এই দেখুন—

অজামেকাং রোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীং প্রজাং সৃজমানাং সরূপাং।
অজোহ্যেকোজুষমানোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

এতদ্ব্যতীত 'মায়া' শব্দের উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়।

গুরু। মায়াশব্দ, হয় ব্রহ্ম তাৎপর্য্যে, নাহয় ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ গুণ তাৎপর্য্যে, নাহয় অদৃষ্ট তাৎপর্য্যে, নাহয় সৃষ্টি সাধনোপযোগী অপর কোনও উপকরণ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ ইহার যে স্বরূপ নিরূপণ করেন, সে স্বরূপ কোন' প্রমাণানুসারেই সিদ্ধ হয় না। 'অজামেকাং রোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং' ইত্যাদি বচনটী সাংখ্যমতে প্রকৃতি-সাধক এবং অদ্বৈতবাদি-মতে অবিদ্যা-সাধক বিচিত্র প্রমাণ। কারণ স্বরস অন্বেষণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিলে এই শ্রুতির দ্বারা পরমাণুই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু ঐ শ্রুত্যুক্ত প্রথম বস্তুটী রূপবিশিষ্ট। তৈজস পরমাণু, জলীয় পরমাণু, পার্থিব পরমাণুর রূপকে যথাক্রমে 'রোহিত' 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা ছান্দোগ্য উপনিষদেও প্রদান করা হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থের যে কোন' রূপ এই রূপ-ত্রিতয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাও ঐ উপনিষদেই স্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণও পরমাণুর রূপ স্বীকার করেন। "সমবায়িকারণের রূপই তৎ সমবেত পদার্থের রূপের কারণ" ইহাও নৈয়ায়িকগণেরই মত। অতএব 'সরূপাং' এই বিশেষণেরও সার্থক্য আছে। তবে যথাশ্রুত দৃষ্টি করিলে ন্যায়মতের সহিত রূপ বিষয়ে যদি আপাততঃ কোনও বিরোধ বোধ হয়, তাহার মীমাংসা অগ্রে লিখিত হইবে। প্রজাজনন কার্য্যে 'রোহিত' সংজ্ঞক সামগ্রীই সর্ব্বাগ্রে উপযোগী, তৎপরে শুক্ল সামগ্রীর কারণতা, তৎপরে 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞক সামগ্রীর উপযোগ, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এ শ্রুতিতেও সেই ক্রম সুরক্ষিত। সুতরাং প্রথম লিখিত নায়িকা স্বরূপিণী অনাদি পদার্থটী পরমাণুরূপিণী দেবতা। এই পরমাণু সাধক শ্রুতিটী লইয়া অদ্বৈতবাদিগণ 'অবিদ্যা' সাধন করিতে চাহেন। 'অবিদ্যা' কি রূপ-বিশিষ্ট সামগ্রী? 'ত্রীণিরূপাণীত্যেব সত্যং' ইহাও ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত

হইয়াছে। 'অবিদ্যা' কি সত্য? বিশেষতঃ 'অজোহ্যেকঃ' অজোঽন্যঃ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা সিদ্ধ হইতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মা একই সামগ্রী হইলে 'অন্যঃ' এই সুস্পষ্ট ভেদ সাধক শব্দ প্রযুক্ত হইত না।

শিষ্য। পূর্ব্বে যে নায়িকা স্বরূপিণী অনাদি সামগ্রী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে 'একাং' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরমাণু কোটী, কোটী। সুতরাং ঐ সামগ্রী রূপবৎ হইলেও 'পরমাণু' সিদ্ধ করিলেন কিরূপে?

গুরু। বাঙ্গালা ভাষায় 'এক' শব্দের ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া তোমার যে সংস্কার হইয়া রহিয়াছে. সংস্কৃত ভাষায় 'এক' শব্দের অর্থ কেবল মাত্র তাহাই নহে, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোষ দেখ "একে মুখান্য কেবলাঃ।" এতদ্ব্যতীত, নীরূপ সরূপ বিবিধ পরমাণু। তন্মধ্যে সরূপ-পদার্থ-সৃষ্টির প্রধান উপযোগী যে পরমাণু, তাহা একই জাতীয় অর্থাৎ সরূপ। ইহা জানাইবার জন্যও 'একাং' বিশেষণ প্রযুক্ত। যেহেতু, 'এক' শব্দের লাক্ষণিকার্থ 'একজাতীয়' হইতে পারে। ইহা পরে জানিতে পারিবে। তদ্ভিন্ন, অদ্বৈতবাদিগণের মতেও 'অবিদ্যা' নানা। তৎ সমষ্টিতে 'এক' ব্যবহার তাঁহারাও করিয়া থাকেন। ধান্য রাশিতে 'একোমহান্ ধান্যরাশিঃ' প্রয়োগ হয়; বৃক্ষরাজিতে 'একং বনং' প্রয়োগ হয়। তদনুসারে ধরিলে পরমাণুরূপিণী প্রকৃতি সন্ততিতেও 'একাং' ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপে 'অজামেকাং' এই অংশের দ্বারা স্বারসিক ভাবে পরমাণুই আসিতে পারে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ ঐ অংশের দ্বারা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক পদার্থ সন্ততি সিদ্ধ করিতে চাহেন। সেরূপ করিলেও আমাদিগের কোন' হানি সম্ভাবনা নাই।

সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক পদার্থকে তাঁহারা বলিবেন 'অবিদ্যা', আমরা বলিব 'অদৃষ্টধারা', ইহাই মাত্র বিশেষ। ধারা বহিয়া অদৃষ্টের অনাদিত্ব সিদ্ধ থাকায় 'অজাং' এই বিশেষণের সার্থক্যই হইয়াছে। সে যাহাহউক প্রথমাংশের দ্বারা অদৃষ্টরূপিণী পরাপ্রকৃতি অথবা পরমাণুরূপিণী অপরাপ্রকৃতি যাহাই সিদ্ধ কর, সেইটাকে প্রজাজনন-কার্য্যে রূপকভাবে নায়িকা সাজাইয়া অপর একটী অনাদি পদার্থকে নায়ক সাজাইয়াছেন। এই দ্বিতীয় অনাদি পদার্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। উভয়ের সহযোগে যাহা সৃষ্ট হইল, কর্ম্মফল অনুসারে অপর একটী অনাদি পদার্থ সেই সমুদয় ভোগ করিয়া, মুক্তির পূর্ব্বে তাদৃশ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। এই অনাদি পদার্থ জীবাত্মা। 'এনাং' এই শব্দের অর্থ 'অজাং' অথবা 'প্রজাং', যাহা অভিরুচি তাহাই করা যাইতে পারে। 'বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ' এইরূপ পাঠ থাকিলেও 'এনাং' এই একবচনান্ত প্রয়োগে হানি নাই। মুক্তির পূর্ব্বে এক এক জীবাত্মা এক এক দেহই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সে যাহাহউক 'অজামেকাং' 'অজোহ্যেকঃ' 'অজোহন্যঃ' ইত্যাদি শব্দ সমূহের দ্বারা পরস্পর ভেদই তো সিদ্ধ হইতেছে। পরস্পরে অভেদও বিদ্যমান ইহা কোন্ অব্যভিচারী নিয়মের দ্বারা জানা গেল? 'ঘটভিন্নঃপটোঘটাভিন্নঃ,' 'বৃক্ষভিন্নং জলং বৃক্ষাভিন্নং', এজাতীয় প্রয়োগকে সাধু করিবার জন্য বাগ্জাল বিস্তার কর্ত্তব্য কি। অস্মৎপ্রদর্শিত রীতিতে শ্রুত্যাদির ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি বিচার করুন।





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি বিবিধ শ্রুতির স্বারসিক ব্যাখ্যা। স্তবাদির মীমাংসা। প্রত্যগস্থূল মনণু নেতি নেত্যাত্মা ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যাদি শ্রুতির স্বারসিক ব্যাখ্যা। সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ সাযুজ্যমৈতি ইত্যাদি বাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণের আবশ্যকতা। অদ্বৈত ব্যাখ্যার বাধ। আহার্য্যজ্ঞানের আবশ্যকতা। তাহার বিরাম। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞাবস্থা। মুক্তির কারণীভূত জীবতত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ।

শিষ্য। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং ** আত্মা' এই শ্রুতির যেরূপ অর্থ করিলেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ সমুদয় শ্রুতির কি তবে ঐরূপ অর্থই করিতে হইবে?

গুরু। এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি কর এবং অন্য কোনওরূপ অর্থ করা যায় কিনা আপনিই বিচার কর। ভগবদ্-

গীতায় উক্ত হইয়াছে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনু মাশ্রিতং। পরং ভাব মজানন্তো মমভূতমহেশ্বরং॥" অর্থাৎ "আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ইহাই আমার পরম তত্ত্ব। মূঢ় ব্যক্তিরাই আমাকে মনুষ্য-শরীরী বলিয়া অবজ্ঞা সহ স্থির করে। তাহারা আমার পরম তত্ত্ব কিছুই জানেনা।" এইসকল প্রমাণ দৃষ্টেও বুঝা যায় তোমার ঐ শ্রুতিগুলি স্বরূপ-নির্দ্দেশক নহে। 'ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি' 'আপো নারায়ণঃ স্বয়ং' 'গুরুরেব স্বয়ং ব্রহ্ম' 'শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ' 'সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা' 'সর্ব্ব তীর্থানি জাহ্নবী' 'অহং দেবোঽথ নৈবেদ্যং' ইত্যাদি বাক্য সমূহের ন্যায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্য সমূহেরও দ্বারা বুঝিতে হইবে, বিশেষ বিশেষ উপাসনাবস্থায় ঐ ঐ রূপ চিন্তার বিধি মাত্র। শ্রুতি বলিতেছেন

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।

অর্থাৎ "ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্ম হইতে পালিত, ব্রহ্ম হইতে লীন সকল বস্তুই ব্রহ্ম, এই প্রকার চিন্তা করতঃ শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।" অতএব বুঝা গেল 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' 'দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবং' ইত্যাদি বাক্যের তুল্য উপাসনা তাৎপর্য্যেই তোমার শ্রুতিগুলি উক্ত হইয়াছে। উপাসনাপর অধ্যায়সমূহ হইতে শ্রুতি সংগ্রহ করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ পদার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকেন। কোন্ শ্রেণীর সাধকের উপাসনার জন্য ঐ সকল শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাও আমরা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি। 'ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি' 'আপো নারায়ণঃ স্বয়ং' 'সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঘট, জল বাদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে না। কিন্তু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' এই সকল বাক্যের দ্বারা

'সর্ব্বং' 'অহং' 'ত্বং' এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পাইবে, এমন অমোঘ হেতু তুমি শ্রুতির মধ্যে কোথায় পাইলে ?

শিষ্য। পুরাণাদিতে বহু স্তবাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে দেখা যায়, ব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করিয়া অনেক স্থলে বলা হইয়াছে 'তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, তুমি কর্ত্তা, তুমি কর্ম্ম, তুমি জ্ঞেয়, তুমি জ্ঞান, তুমি জ্ঞাতা, তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি বাল, তুমি বৃদ্ধ, ইত্যাদি।

গুরু। স্তব খুজিয়া খুজিয়া পদার্থ-উপপত্তি করিতে হইবে নাকি ? আরোপিত বাক্যের নাম স্তব ইহা পণ্ডিতমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। গঙ্গা-মাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে,

স্তুতিবাদমিমং মত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে।

অর্থবাদ এবং স্তব যে অসত্য এবং পদার্থ-নির্ণয় বিষয়ে পণ্ডিতগণের অশ্রদ্ধেয়, কাশীখণ্ডেও তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ যথা,

নার্থবাদোঽয়মুদিতঃ স্তুতিবাদো ন বৈ মুনে।
সত্যং যথার্থবাদোঽয়ং শ্রদ্ধেয়ঃ সদ্ভিরাদরাৎ ॥
উদাহরন্তি যে মূঢ়াঃ কুতর্কবলদর্পিতাঃ।
কাশ্যাং সর্ব্বার্থবাদোঽয়ং তে বিট্‌কীটা যুগে যুগে ॥

অতএব, স্তাবক-বাক্য স্বরূপ-নির্দ্দেশক প্রমাণ নহে। রাজাকে অনেক সময় 'ত্বমর্কস্ত্বংসোমঃ' বলিয়া স্তব করা হয়। পত্নী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে 'নগৃহংগৃহমিত্যাহুর্গৃহিণীগৃহমুচ্যতে'। সন্তানানুরাগী ব্যক্তি সন্তানকেই সর্ব্বাপেক্ষা সার বিবেচনা করিয়া বলিয়া থাকেন "তুমি ধন, তুমি রতন, তুমি সব"। অতএব ব্রহ্মানুরাগী ব্যক্তি ব্রহ্মকে সার বস্তু বিবেচনা করিয়া "তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি জল,

তুমি স্থূল, তুমি সব" এ সকল বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? স্তবেই বল, আর 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেই বল, যেমন ব্রহ্মসম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তদ্রূপ 'অহং' 'ত্বং' 'সর্ব্বং' ইত্যাদি নিখিল বস্তু সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। 'ত্বমর্কস্ত্বংসোমঃ' এই বাক্যের দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রের অস্তিত্বের অপলাপ হয় না, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' এই বাক্যের দ্বারা গৃহের অস্তিত্বের অপলাপ হয় না, 'তুমি ধন, তুমি রতন' এই বাক্যের দ্বারা ধনরত্নের সত্তার অপলাপ হয় না, কিন্তু তোমার প্রদর্শিত শ্রুতিগুলির মধ্যে যে 'অহং' 'ত্বং' 'সর্ব্বং' প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর উল্লেখ রহিয়াছে সেই গুলিরই বিভিন্ন সত্তার অপলোপ হইবে, এ বিষয়ের কারণ কি? জন্য ও নিত্য, প্রতিপাল্য ও প্রতিপালক, ভোগ্য ও ভোক্তা একই বস্তু, ইহা কোন্ শ্রুতির আদেশ? ভোগ্যভোক্তৃত্ব, প্রতিপাল্যপ্রতিপালকত্ব, জন্যত্ব, এ সকল ব্যবহারিক দশায় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে এ সকল কিছুই নহে, এ কথা বলিতে পার না। ব্যবহারিক দশায় পার্থক্য থাকিলে তদনুসারেই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হয়। আয়ুঃ ও ঘৃতে ব্যবহারিক দশায় পার্থক্য আছে বলিয়াই 'আয়ুর্ঘৃতং' এই শ্রুতির লক্ষণা করিতে হয়। শ্রুতি-বলে আয়ুঃ ও ঘৃতে অভেদ সিদ্ধি হয় না। তুমি অগ্রে কোনও অব্যভিচারী নিয়মে সপ্রমাণ কর যে, সকল শ্রুতি ও স্তববাক্যে যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহাদের সত্তা ভ্রমমূলক; তৎপরে শ্রুতি গুলির যেরূপ অর্থ করিতে ইচ্ছা সেইরূপ অর্থই করিও। নচেৎ তোমার মনের মত অর্থ করিতে দিব কেন? ব্রহ্ম প্রত্যক্ অর্থাৎ বিশ্ব-ব্যাপী, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। 'প্রতি অঞ্চতি' এই ব্যুৎপত্তিতে 'প্রত্যক্' এই পদটী সিদ্ধ। 'প্রতি সামগ্রী' যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তবে 'প্রত্যক্' এই বিশেষণও ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্মে

'প্রত্যক্' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই হেতু তিনি প্রতি সামগ্রী হইতে ভিন্ন, ইহা নিশ্চয় করা উচিত হয়। শ্রুতিও বলিতেছেন প্রত্যগন্থূলোঽচক্ষুরপ্রাণোঽমনা অকর্ত্তা। প্রত্যগন্থূলমনণুঃ। ইত্যাদি। ব্রহ্মে নিখিল বস্তুর ভেদ বিদ্যমান, তাহা নেতিনেত্যাত্মা ইত্যাদি স্বরূপ-নির্দ্দেশক শ্রুতিসমূহের দ্বারাও স্পষ্টই জানা যায়। অতএব সকল শ্রুতির দ্বারা যাহাদিগের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে, তুমি কেন তাহাদিগের বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার করিবে, এ বিষয়ের কোনও শ্রুতি আছে কিনা?

শিষ্য। ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি এই শ্রুতির দ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

গুরু। 'ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন' এ কিরূপ ভীষণ কথা তোমার মুখে শুনিলাম? ব্রহ্মের অজ্ঞাতা পুরুষকে কি তুমি ব্রহ্ম বল না নাকি? তোমার মতে ব্রহ্মবিদ্ অবস্থায়ও ব্রহ্ম, তৎপূর্ব্বেও ব্রহ্ম, তৎপরেও ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্ ভবতি' এইরূপ প্রয়োগ থাকিলে বরং স্বরূপ-নির্দ্দেশক হইতে পারিত। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এ কিরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইল? যুবা দেবদত্তো ভবতি, উপবীতী যজ্ঞদত্তো ভবতি, নিরয়গামী জীবো ভবতি, পুষ্পিতো বৃক্ষো ভবতি, এরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয় হইতে পারে না। কিন্তু দেবদত্তো যুবা ভবতি, যজ্ঞদত্ত উপবীতী ভবতি, জীবো নিরয়গামী ভবতি, বৃক্ষঃ পুষ্পিতো ভবতি, এইরূপ উদ্দেশ্যবিধেয়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষ বিচার মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এক্ষণে এইটুকু মাত্র জানা উচিত এ জাতীয় শ্রুতি লক্ষণাপর বলিতে হইবে। 'ব্রহ্ম বিদ্ মুক্তো ভবতি' এই অর্থ করিতে হইবে।

শিষ্য। লক্ষণাপর কেন বলিব? 'ঘটোদ্রব্যং' এরূপ প্রয়োগ কি সাধু নহে? ব্রহ্মের অজ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্ম কি না আমার বিচারের আব-

শুক নাই। ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্ম, তাহাই এই শ্রুতির দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শুরু। ব্রহ্মকে তোমরা জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া থাক। জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই বস্তু নহে ইহা লৌকিক নিয়মে আমার সিদ্ধ আছে। সেরূপ হইলে, বোধো বেত্তি, দ্বেষো দ্বেষ্টি, ইচ্ছা ইচ্ছতি, কৃতিঃ করোতি, এই সকল প্রয়োগ স্বারসিক হইত। জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই বস্তু যদি ইহা সিদ্ধ করিতে পার, তবে 'ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই' এই বাক্যকে 'ঘটোদ্রব্যং' এই বাক্যের সহিত তুলনা করিতে পার, গুণ গুণীর অভেদ ঘোষণা করিতে পার, যেমন যেমন কথা বলিয়া থাক তেম্‌নি তেম্‌নি কথা বলিয়া পদার্থ উপপত্তি করিতে পার। কিন্তু যদি শ্রুতি গুলিকে স্বপক্ষে রক্ষা করিতে সমর্থ না হও, তবে তোমার সিদ্ধান্তে, তোমার দৃষ্টান্তে প্রামাণ্য-সংস্থাপন করিব কিসের বলে? জ্ঞান ও জ্ঞাতা যখন এক বস্তু নহে তখন 'ঘটোদ্রব্যং' এই বাক্যের সহিত শ্রুতিটীর তুলনা করিতে পার না। 'সর্ব্ববাদ্যময়ীঘণ্টা' 'আপো নারায়ণঃ স্বয়ং' 'গুরুরেব স্বয়ংব্রহ্ম' 'শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ' 'ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি' 'সর্ব্বতীর্থানি জাহ্নবী' ইত্যাদি বাক্যসমূহের সহিত ঐ জাতীয় শ্রুতির তুলনা করিতে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্তাবক বাক্য, অর্থাৎ ঐ জাতীয় শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষের প্রশংসা ঘোষণা করা হইয়া থাকে এইরূপ মীমাংসা করিলেও হানি নাই। প্রশংসা-তাৎপর্য্যে 'বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুই' এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে। 'ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন' এই শ্রুতির ব্যাখ্যা আরও বহু প্রকারে করা যাইতে পারে। 'ইব' প্রয়োগের স্থলে অর্থাৎ যেখানে বহু সাধর্ম্ম্য বিদ্যমান, সেখানে কখন' কখন' তদ্‌বস্তুর আরোপ এবং 'এব' প্রয়োগ সর্ব্বসম্মত। যথা

"গৌর্ব্বাহিকঃ" "কুলটা পিশাচী" "অজ্ঞস্ত্বন্ধ এব" "লম্পটঃ পশুরেব" "বাহুলতা" "মুখচন্দ্র" ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগ পরস্পরে ভেদ নাশক নহে। সাধর্ম্ম্য-ব্যঞ্জক। সাধর্ম্ম্য সিদ্ধি হইলে তো ভেদই সিদ্ধ হইয়া গেল।

শিষ্য। 'সাধর্ম্ম্য' শব্দের অর্থ কি?

গুরু। 'তদ্ ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গত ধর্ম্মবত্বং।' অর্থাৎ যদি কোনও ভিন্ন বস্তুতে সমান কোনও ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তবে 'সাধর্ম্ম্য' প্রয়োগ হয়। নচেৎ 'লক্ষণা' করিতে হয়।

শিষ্য। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মের কিরূপ সাধর্ম্ম্য লাভ করে?

গুরু। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি মুক্ত হয়। অদৃষ্টরাহিত্যাদি রূপ সাধর্ম্ম্যের দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্ত্যাদি হইয়া থাকে। আর জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা ক্লেশ পাইতে হয় না।

শিষ্য। লম্পটঃ পশুরেব, মূর্খস্ত্বন্ধ এব, এই সকল প্রয়োগের সহিত তুলনায় 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব' এই বাক্যের উপপত্তি আপনি করিতেছেন। অতএব আপনিও শ্রুতির শব্দার্থ রক্ষা করিতেছেন না। যদি শব্দার্থই না রহিল, তবে আপনাকে সাধর্ম্ম্য সিদ্ধি করিতে দিব কেন? লক্ষণা সাহায্যে আমিই অভেদ সিদ্ধি করিয়া লইব।

গুরু। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মত প্রবর্ত্ত করিবার জন্য যথেচ্ছভাবে লক্ষণা করিলে চলিবে কেন? আমি লক্ষণার দ্বারা সাধর্ম্ম্য-সিদ্ধি করিতেছি। তাহাতে শাস্ত্র রক্ষিতই হইতেছে। ভগবদ্ গীতায় উক্ত হইয়াছে

ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তিচ ॥

অর্থাৎ "তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমার সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আর শরীর

পরিগ্রহ করে না। নাশনিবন্ধনও কষ্ট পায় না।" অদৃষ্ট-রাহিত্যাদি রূপ সাধর্ম্ম্যের দ্বারা দুঃখ-মোচনাদি যাহা বলিয়াছি, সকলই গীতায় পাইলে। পরমং সাম্যমুপৈতি প্রভৃতি শ্রুতিও দৃষ্টি করিলে অনুভব করিতে পারা যায়, মুক্ত জীব ব্রহ্মের তুল্য হয়, ব্রহ্ম হয় না।

শিষ্য। এ সকল বাক্যেরও লক্ষণা করিয়া অদ্বৈতপক্ষে আনয়ন করিব।

গুরু। অদ্বৈতবাদিগণ করিয়াছেনও তাহাই। 'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' এই সকল বাক্যের ভাষ্য করিবার সময়, শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ লিখিয়াছেন 'সাধর্ম্ম্য' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে ভেদ সিদ্ধি হইয়া যায়। এ কারণ 'স্বরূপত্ব' এই অর্থ গ্রহণ করা হইল। 'তত্ত্বমসি' 'ব্রহ্ম-বিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এ সকল বাক্য লাক্ষণিক। তদুপরি তোমার ইচ্ছায় 'মমসাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' 'পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যাদি বাক্যকেও লাক্ষণিক বলিতে হইবে। সব লক্ষণায় লক্ষণায় চলিল। জীব প্রকৃত কিরূপ বস্তু, শাস্ত্র মুখ্যভাবে তাহা খুলিলেন না। শাস্ত্রের উপর এমন দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি দৈবাৎ দ্বিবিধ বাক্য পাওয়া যায়, তথাপি ভেদ-সাধক বাক্যের লক্ষণা করা অশাস্ত্রীয়। অভেদ-সাধক বাক্যের লক্ষণা করা শাস্ত্র-সঙ্গত। এ বিষয়ে বিশেষ বিচার জানিতে হইলে মূল গ্রন্থে শক্তি ও লক্ষণার বিচার দ্রষ্টব্য। এখানে কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতেছি। "ব্রহ্ম হইয়াছে" এই তাৎপর্য্যে 'ব্রহ্ম সদৃশ হইয়াছে' 'ব্রহ্মতুল্য হইয়াছে' 'ব্রহ্মের সমান হইয়াছে' এই সকল বাক্য প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু ভিন্ন বস্তু ব্রহ্মের ন্যায় হইলে 'ব্রহ্মই হইয়াছে' এরূপ প্রয়োগ করা যায়। সেইরূপ স্থলেই লক্ষণা দ্বারা অর্থ করিতে হয় 'ব্রহ্ম সদৃশ হইয়াছে'। সৎ মনুষ্যকে

লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে 'তিনি দেবতা'। লক্ষণাদ্বারা অর্থ করিতে হয় 'দেবতা সদৃশ'। কিন্তু দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না "তিনি দেবতা সদৃশ"। সাদৃশ্য বা তদ্বাচক কোনও শব্দ প্রযুক্ত হইলে, সে বাক্যকে লক্ষণাপর বিবেচনা করা অসঙ্গত। তদ্রহিত বাক্যকেই লক্ষণাপর বুঝিতে হইবে। 'মম-সাধর্ম্যমাগতাঃ' এরূপ প্রয়োগ না থাকিয়া যদি থাকিত 'মামাগতাঃ', তাহা হইলে লক্ষণা-সাহায্যে 'মত্বমাগতাঃ' 'মৎস্বরূপত্বমাগতাঃ' এরূপ ব্যাখ্যা করা চলিত। অতএব সুস্পষ্ট ভেদ-সাধক প্রমাণ সকল বিদ্যমান থাকিতে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যকে 'সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা' 'ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি' ইত্যাদি প্রাগুক্ত বাক্য-সমূহের সহিত তুলনা না কর কেন? এতদ্ব্যতীত, 'বহবোঘটাঃ' 'বহবো বৃক্ষাঃ' 'বহবো জীবাঃ' 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে' 'দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া' 'যতো বৈ ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি' 'সর্ব্বেবয়মতঃপরং' ইত্যাদি লৌকিক অলৌকিক প্রয়োগ দৃষ্টেই বল, আর চাক্ষুষাদি অবলম্বনেই বল, বহু ঘট, বহু জীব প্রভৃতি সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্ম এক ভিন্ন দুই নহে। সুতরাং বহু পদার্থ সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। বহু অবিদ্যার দোহাই দিয়া এক ব্রহ্মে তুমি বহুত্বের উপপত্তি করিয়া থাক। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যেখানে কোনওরূপ গত্যন্তর নাই ইহা বাদী প্রতিবাদী উভয়ে একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই স্থানেই বিশেষণের বহুত্ব লইয়া ধর্ম্মের বহুত্ব অবধারণ করা হয়। যথা 'বহ্ব্যঃ শ্রুতয়ঃ' 'বহ্ব্যোদিশঃ' ইত্যাদি। কিন্তু স্বারসিক ব্যাখ্যা দ্বারা এক পক্ষ পদার্থের উপপত্তি করিতে যেস্থলে সমর্থ হইবেন, সেস্থলে অস্বারসিক ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য নহে। সেরূপ হইলে শব্দগত বহুত্ব লইয়া 'একং গগনং বহূনি', ঐশ্বর্য্যের বহুত্ব লইয়া

'একো রাজা বহবঃ' এ সকল প্রয়োগও হইতে পারিত। অতএব 'অবিদ্যাদি লইয়া ব্রহ্মে বহুত্ব ব্যবহার' এ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। তর্কানুমানাদির দ্বারা এবং 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ' ইত্যাদি বাক্যের বিচারের দ্বারা অগ্রে আরো সুস্পষ্ট ভাবে সপ্রমাণ করা যাইবে যে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এইরূপ প্রয়োগ সমূহ 'ঘটো-দ্রব্যং' এরূপ প্রয়োগের তুল্য নহে। কিন্তু 'ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি' 'আপো নারায়ণঃ স্বয়ং' 'সর্ব্ববাদ্যময়ীঘণ্টা' এই সকল প্রয়োগের সহিত তুলনা করিতে হইবে এবং 'ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি' এই সকল বাক্যের লক্ষণা তুমি যেরূপ করিতেছ সেরূপ করা চলিবে না। আমি যে লক্ষণা করিতেছি তাহাই প্রকৃত লক্ষণা বুঝিতে হইবে। লক্ষণা না করিলেও 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতির ব্যাখ্যা দ্বৈতপক্ষে হইতে পারে, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে তাহা হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই কোনও কোনও শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। যথা, দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেবচ। মুক্ত জীব শরীর পরিগ্রহ করে না, জীবব্রহ্মই থাকিয়া যায়। সেই অভি-প্রায়ে উক্ত হইয়াছে 'ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি।' ব্রহ্ম ও জীব সাধক যত শ্রুতি আছে, কুত্রাপি অভেদ প্রদর্শিত হয় নাই, পরস্পরে ভেদই সংস্থাপিত হইয়াছে। যথা,

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখয়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥

এই শ্রুতিস্থ 'অন্য' শব্দটী ব্রহ্ম ও জীবে সুস্পষ্ট ভেদই সাধন করিতেছে। অভেদ সিদ্ধি হইবে কিরূপে? 'ঘটভিন্নঃ পটো ঘটাভিন্নঃ' এরূপ প্রয়োগ সঙ্গত নহে ইহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-

সূত্রাদির দ্বারাও যে দ্বৈতসিদ্ধি হইতেছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। অতএব যথেচ্ছ ভাবে সূত্রাদির ব্যাখ্যা করতঃ অসঙ্গত সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে।

শিষ্য। সকল বস্তু ব্রহ্ম নহে, অথচ উপাসনা বিশেষের জন্য ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে হয় ইহা আপনি বলিতেছেন। সুতরাং এই জ্ঞানটী ভ্রমজ্ঞান ইহা আপনাকে বলিতে হইতেছে। আমাদের যে অংশে ভ্রম নাই, অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে পৌছিলে সেই অংশে ভ্রম কিরূপে সম্ভব পাইতে পারে?

গুরু। সকল ভ্রম সম্ভব না পাউক, আহার্য্যজ্ঞানাদি রূপ ভ্রম উন্নত স্তরেও সম্ভব পায় ইহা সকল অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। নচেৎ 'অনুসঙ্গ' হইতে পারে না। 'দ্বারং' বলিলে আবশ্যক-স্থলে যোগিপুরুষেরাও আমাদের ন্যায় 'দ্বারং পিনদ্ধি' বুঝিয়া লইতে পারেন। 'পিনদ্ধি' এই শব্দটী 'দ্বারং' এই শব্দের উত্তরবর্ত্তী না হইলেও উত্তরবর্ত্তী বলিয়া যখন জ্ঞান হইয়া থাকে, তখন আহার্য্যাদি রূপ ভ্রম (তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞান) যোগি-পুরুষেরও হইতে পারে।

শিষ্য। আবশ্যকীয় স্থলেই যোগিপুরুষগণের সেরূপ জ্ঞান হইতে পারে। অনাবশ্যক স্থলে সেরূপ হইবে কেন? ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তুর জ্ঞান করিয়া যোগিপুরুষের লাভ কি?

গুরু। অনাবশ্যক নহে। 'ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আপনাকে 'ব্রহ্মত্ব প্রকারে' বুঝিলে, আত্ম-পাতাদি শঙ্কা নিবৃত্তি পায়। তখন 'আমি মরিব' 'আমি ক্লেশ পাইতেছি' এই সকল ভাবিয়া কেহ আকুল হয় না। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" "সর্ব্বং খল্বিদং

ব্রহ্ম" "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইত্যাদি বাক্যমত ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তু জ্ঞানে ভাসিলে, শত্রু-মিত্র-জ্ঞান, ভাল-মন্দ-বিচার, দ্বেষ অনুরাগ সকলই তিরোহিত হয়। কেননা তখন বৈষম্য-বুদ্ধি থাকে না। উপাসনা-পথে ইহা একটি অল্প লাভের সামগ্রী নহে। ভগবদ্গীতায় পঞ্চমাধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥
বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ॥
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্জ্যোতিরেব যঃ
স যোগী ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥

অতএব জানা গেল (ব্রহ্মভূতাত্মভূতাত্মা হইলে অর্থাৎ) ব্রহ্ম-রূপে নিখিল বস্তু জ্ঞানে ভাসিলে যে অবস্থা হয় তাহাকেই 'ব্রহ্মভূতঃ' 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ' ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। নচেৎ "ব্রহ্মাভেদ জ্ঞান হইলে সম ও নির্দ্দোষ হওয়া যায়, ব্রহ্মও সম-নির্দ্দোষ", এই অংশ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করাইতে হয় না। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।" এই বাক্যের দ্বারাও স্পষ্টই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 'বাসুদেব' ও 'সর্ব্বে' পার্থক্য আছে। যেহেতু সেই জ্ঞানে বাসুদেব ও সর্ব্ব উভয় সামগ্রীই ভাসিয়া থাকে। অতএব এই সকল বাক্য

আহার্য্যজ্ঞানপর মাত্র। 'ব্রহ্মভূত' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানপর অবস্থা নহে, শ্রীধর স্বামি প্রমুখ টীকাকারগণও এই কথাই বলিয়া থাকেন। মুক্তির পূর্ব্বে 'আহার্য্য-জ্ঞান' ভাঙ্গিয়া গিয়া ব্রহ্মগত যথার্থ ধর্ম্মসমূহের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত 'আহার্য্য-জ্ঞানপর' বচন গুলির পরেই ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা,

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

অতএব বুঝা গেল, ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তুর জ্ঞান মুক্তির পরম্পরা সাধক। ঐ জ্ঞানের পরে মুক্তির পূর্ব্বে অন্যরূপে ব্রহ্মজ্ঞানও হইবে।

শিষ্য। 'সর্ব্বযজ্ঞ ভোক্তৃত্ব', 'সর্ব্বলোক-মহেশ্বরত্ব', 'সর্ব্ব-সুহৃত্ব' প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞানের প্রসক্তি কি? বিশেষতঃ সর্ব্বপদার্থের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার আমাদের কৈ আছে? সুতরাং 'সর্ব্বলোক-মহেশ্বরত্বাদি' রূপে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অতএব ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র।

গুরু। ব্রহ্মাভেদ জ্ঞানাদির পর সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগী হইতে পারিব। সে অবস্থায় সর্ব্বপদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার, এবং 'সর্ব্ব যজ্ঞভোক্তৃত্ব' 'সর্ব্বলোকমহেশ্বরত্ব' 'সর্ব্বসুহৃত্ব' প্রভৃতি ব্রহ্মগত- অসাধারণ সকল ধর্ম্মের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞান সম্ভব পাইবে। সেই অবস্থা, এবং তৎপরবর্ত্তি অবস্থার বর্ণনা অন্যত্র ভগবান্ এইরূপ করিয়াছেন। যথা,

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥

শিষ্য। ব্রহ্মাভেদজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান নহে, এবিষয়ে কি আরও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে?

গুরু। মুক্তির আসন্ন-কারণীভূত জ্ঞানই 'জ্ঞান' পদবাচ্য। প্রমাণ যথা "মোক্ষেধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।" নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'দেহদেহীর জ্ঞানই' মুক্তির আসন্ন কারণ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ও তাহাই বলিতেছেন। যথা,

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম।।

এই ভগবদ্‌বাক্যে জানা যাইতেছে, 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানই' 'জ্ঞান' পদ-বাচ্য। অর্থাৎ ঐ জ্ঞানই মোক্ষের আসন্ন-কারণ। পূর্ব্বার্দ্ধের দ্বারা জানা যাইতেছে, শরীরের নাম 'ক্ষেত্র' এবং সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বলিয়া জীবের নাম 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। পরার্দ্ধে জানা যাইতেছে যে, নিখিল বস্তুর নামও 'ক্ষেত্র'। সেই নিখিল বস্তুরূপ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মও 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। অতএব 'সর্ব্ব-সর্ব্বজ্ঞ-জ্ঞান' ও 'দেহ-দেহি-জ্ঞান' ভেদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান দ্বিবিধ। এই দুই জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিয়া উল্লেখ করায়, ইহারাই মুক্তির আসন্ন কারণ। অতএব ব্রহ্মরূপে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান মুক্তির আসন্ন-কারণ নহে। ব্রহ্মরূপে সকল বস্তুর জ্ঞান হইবার পরে, ব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেও বুঝান হইয়াছে, এখনও বুঝিতে পারিলে। কারণ ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তুর জ্ঞান হইলে, 'সর্ব্বজ্ঞ' এই 'বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান' এবং 'দেহী' এই 'বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞান' অর্থাৎ 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান' হওয়া অসম্ভব।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সাকারোপাসনার অতীতাবস্থা সমূহের ক্রম। ব্রহ্মাভেদজ্ঞান। পরাভক্তি। ব্রহ্মতত্ত্ব ও তৎসহ সর্ব্বতত্ত্বের সাক্ষাৎকার। জীবজ্ঞান। মুক্তি। জীবের নিত্যত্ব সংস্থাপন। সাকারোপাসনার আবশ্যকতা। দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত বিচার। যথা—সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা। ন্যায়ের বিরোধে আপত্তি। তাহার খণ্ডন। ব্রহ্মে 'জ্ঞান' 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য। ন্যায়মত-সমর্থন।

শিষ্য। মুক্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মরূপে সকল বস্তুর জ্ঞান একটি কারণ, ইহা কতিপয় শ্লোকে বুঝিয়াছি। অপর কতিপয় শ্লোকে বুঝা গিয়াছে, সকল বস্তুতে 'ব্রহ্মজ্ঞান' হইবার পর অন্তরূপেও ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। আবার এক্ষণে বুঝিলাম 'দেহীর জ্ঞানও' মুক্তির পূর্ব্বে আবশ্যক। এই জ্ঞান গুলির মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে কোন্‌টী পরে হইবে, এবং আর কোনও জ্ঞানাদি হইবে কি না, এই গুলি কিরূপে জানিব? আর, 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান' দ্বিবিধ ইহা প্রতিপন্ন হইল। তন্মধ্যে 'দেহি

ঘটিতজ্ঞান' যদি 'সর্ব্বজ্ঞঘটিতজ্ঞানের' পরে হয়, তবেই নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত প্রকৃত, ইহা বুঝা যাইবে। 'জীব-ঘটিত-বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞান' পরে হইবে কে বলিল ?

গুরু। ব্রহ্মাভেদ জ্ঞানের পর কতগুলি অবস্থা হইবে, এবং 'দেহ দেহীর জ্ঞান' সর্ব্বশেষে হইবে কিনা নিম্ন-লিখিত ভগবদ্ বাক্যে তাহা বুঝা যায়। যথা,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥
ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥

অর্থাৎ, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শ্রুতি মত জীবাত্মা ব্রহ্মরূপে জ্ঞানে ভাসিলে 'অহং সুখী' 'অহং দুঃখী' 'অহমাকাঙ্ক্ষাবান্' ইত্যাদি বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় শোক ও আকাঙ্ক্ষাদি রহিত হওয়া যায়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইত্যাদি বাক্যমত নিখিল বস্তুতে 'ব্রহ্মত্ব প্রকারে' অভেদ-বুদ্ধি হওয়ায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী হওয়া যায়। এইরূপে প্রসন্নাত্মা হইলে পর, জীব পরাভক্তি লাভ করে। পরাভক্তি লাভের পর. প্রকৃত 'ব্রহ্মতত্ত্বের' সাক্ষাৎকার হয়। 'ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের কোনও কোনও তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বলোক-মহেশ্বর" 'সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি রূপে সাক্ষাৎকার হইবার সময় সর্ব্বপদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারও সুতরাং ঘটিয়া থাকে। এইহেতু এই অবস্থাটী সর্ব্বজ্ঞ যোগীর

অবস্থা। সর্ব্বজ্ঞযোগী পুরুষেরই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্তও নারদাদিতে বিদ্যমান। সে যাহা হউক, ব্রহ্মবিষয়ে ইহাই চরম জ্ঞান। এইরূপে 'ব্রহ্মগত অসাধারণ যাবৎ ধর্ম্ম পুরস্কারে' ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর, তদনন্তরবর্ত্তি উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা. ততঃ অর্থাৎ তৎপশ্চাৎ। তদনন্তরং বিশতে, অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তিনমুপায়ং লভতে।)

শিষ্য। তৎপরবর্ত্তি উপায় কি ?

গুরু। 'জ্ঞান' শব্দে 'সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞজ্ঞান' ও 'দেহদেহিজ্ঞান' বুঝাইয়া থাকে ইহা 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং' ইত্যাদি বাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বাক্যান্তর্গত একটীর জ্ঞান হইয়া গেল, 'পরবর্ত্তি জ্ঞান' শব্দে 'দেহ দেহীর তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই' বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। এত গুলি জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তুর যে জ্ঞান, সেইটীকেই 'মিথ্যা' বলা হইল কেন? পরবর্ত্তী জ্ঞান গুলিকেই 'তত্ত্বজ্ঞান' না বলিয়া 'মিথ্যা জ্ঞান' বলা যায় না কি ?

গুরু। ভগবদ্-বাক্যের দিকে চাহিয়া দেখ। ব্রহ্মভূতজ্ঞানের পর পরাভক্তি। পরাভক্তির পর 'তত্ত্বতো' ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব 'ব্রহ্মভূত' জ্ঞান 'তত্ত্বতো' ব্রহ্মজ্ঞান নহে। শেষের ব্রহ্মজ্ঞানই 'তত্ত্বতো' ব্রহ্মজ্ঞান।

শিষ্য। এই সকল বাক্যের কি অদ্বৈত-পক্ষে ব্যাখ্যা নাই ?

গুরু। না থাকিবে কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবাদ আছে যে, পরম ভক্ত গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন "গীতা বুঝা যায়, কিন্তু ইহার অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা বুঝা যায় না।" অদ্বৈত-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বলোপ করিবার প্রয়োজন কিছুই নাই। 'পরমং সাম্যমুপৈতি' 'মম সাধর্ম্ম্য-মাগতাঃ' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে, মুক্তি হইলে

ব্রহ্মের সমান হওয়া যায়। এ সকল বাক্য কতদূর ভেদ-সাধক তাহা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে। 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ' এই সকল বাক্যের দ্বারাও সুস্পষ্ট ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পরে লিখিত হইবে।

শিষ্য। অভেদ-বোধক শ্রুতিসকল কেবল ভাবনাপর, আচার অনুষ্ঠানের দ্বারাও কি তাহার পরিচয় পাওয়া যায়?

গুরু। সে নীতির পরিচয় সর্ব্বত্রই। প্রাতঃকালে দেখ, প্রথমেই অভেদ চিন্তার বিধান। যথা

অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

পরেই ভক্তির বিধান। যথা

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

পূজাকালেও দেখ, প্রথমেই অভেদ ভাবনা "অহং দেবোঽথ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ। দেবাধারো হ্যহং দেবো দেবং দেবায় যোজয়েৎ॥" শাস্ত্র রহিয়াছে "না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ॥" পরেই ভক্তিযোগে উপচারদান, স্তবপাঠ, প্রণাম প্রভৃতির বিধান। এইভাবে যথাপদ্ধতি উপাসনা করিতে করিতে, যতদিন ব্রহ্মাভেদজ্ঞান দৃঢ় না হয়, ততদিন শাস্ত্রনীতিই পরমাত্মার পার্থক্য রক্ষা করিয়া ভক্তির ক্রমোন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। ব্রহ্মাভেদ-

জ্ঞান দৃঢ় হইলে, শাস্ত্রাদেশ আর কার্য্যকারী হয় না। অর্থাৎ সাকারোপাসনার আর প্রয়োজন থাকে না।

শিষ্য। 'পরাভক্তি' 'প্রকৃতব্রহ্মজ্ঞান' 'দেহ দেহীর জ্ঞান' প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মাভেদজ্ঞানেরই যদি এইরূপ প্রয়োজনীয়তা হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধানমত সাকারোপাসনাদি না করিয়া ব্রহ্মাভেদ চিন্তা করিলেও ত হয়।

গুরু। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইহা উচ্চারণ করিলেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ জ্ঞান দৃঢ় হয় না। শ্রুতি রহিয়াছে, বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানেচ্ছা করিতে হয়। ভগবান্‌ও তাহাই বলিতেছেন। যথা,

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

অর্থাৎ "কথিত নিয়মে তোমরা দেবতাগণকে ভাবিতে থাক। দেবতারাও তোমাদিগকে ভাবিতে থাকুন। এইরূপে পরস্পরে পরস্পরকে চিন্তা কর, তাহাতেই তোমাদের মুক্তি হইবে।" অতএব বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মাভেদজ্ঞানাদি যাহা আবশ্যক স্ব স্ব অনুষ্ঠানে থাকিলে, তাহা আপনিই হইবে। নিজ চেষ্টায় সে জ্ঞান আনিতে হইলে, কলিকাতার ব্রহ্মজ্ঞানী সাজা মাত্র ফল দাঁড়াইবে।

শিষ্য। অদ্বৈতপক্ষীয় শ্রুতির মীমাংসা, আপনি পূর্ব্বেই দ্বৈতপক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ সুস্পষ্ট অভেদ-সাধক কতিপয় দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সে গুলিরও মীমাংসা করা প্রয়োজন। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং
বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং
মৃত্তিকেত্যেব সত্যং।

এই দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টই তো বুঝা যাইতেছে, সমুদয় বিকার। ব্রহ্মই অবিকৃত বীজ।

গুরু। বীজ নিরূপণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। বীজ জ্ঞানে অথবা অবিকৃত মূল পদার্থের জ্ঞানে কি অজ্ঞাত বিকৃত বস্তুর জ্ঞান জন্মে? ন্যগ্রোধ বৃক্ষ না দেখিলে কি বীজ দেখিয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষের জ্ঞান হয়? শুক্র-দর্শনে কি শরীর-জ্ঞান সম্ভবে? অবিকৃত পদার্থের দ্বারা তদ্‌বিকারের জ্ঞান সম্ভব পায় না। গ্রন্থের উদ্দেশ্য লক্ষ কর। দৃষ্টান্ত গুলির পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, "সোম্য গুরুর নিকট এমন কি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, যদ্দ্বারা অশ্রুত অসম্মত অবিদিত সকল পদার্থের জ্ঞানই তোমার হইতে পারিবে? অর্থাৎ গুরু কি এমন কোনও একটী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে উপদেশ সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইবার কারণীভূত?" তৎপরে আশঙ্কা উঠিতেছে, একের দ্বারা এক বিষয়েই জ্ঞান হইবে, তদতিরিক্ত বস্তু যাহার বিষয় জ্ঞাত নহি, তৎসম্বন্ধে কিরূপে জ্ঞান হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান হইতেছে যে, একটা জ্ঞান করিয়া দিলে অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান হওয়াও অসম্ভব নহে। একটা মৃত্তিকার সামগ্রী দেখাইয়া যদি তোমাকে মৃত্তিকার জ্ঞান করিয়া দিতে পারি, তুমি মৃত্তিকার অন্যান্য সামগ্রী দেখিলেও মৃত্তিকার সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কারণ, সে সমুদয় মৃত্তিকা তো সত্যই, কেবল নামধেয় বিকার

মাত্র। এইরূপে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রতিপাদন করিলেন, একটা জ্ঞানের দ্বারা পরে অবিদিত সামগ্রীরও জ্ঞান হয়। দৃষ্টান্ত-বাক্যের দ্বারা এইটুকু মাত্র ফল এখানে গ্রহণ করা চলিবে। দৃষ্টান্তটীতে যেরূপে যে হেতু নিবন্ধন অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান হয়, দার্ষ্টান্তেও যে, সেইরূপে সেই হেতু নিবন্ধন অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান হইবে, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত-বাক্যে দৃষ্টান্তের হেতু কার্য্যকারী। দার্ষ্টান্তে অন্য হেতু কার্য্যকারী হইবে। দার্ষ্টান্তে যে অংশে বিভিন্নতা সিদ্ধ আছে, দৃষ্টান্ত সে অংশের উপর কোনও ক্ষমতা দেখাইতে পারে না। এবিষয়ে বিশেষ বিচার জানিতে হইলে, মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এস্থানে একটী মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। যথা,

পাণ্ডুপুত্রো যথা ভীমো ভীমঃ কর্ণস্তথাহবে।
দ্বয়োঃ সম্মুখযুদ্ধেষু ন জানে কিং ভবিষ্যতি॥
যথা ভীম-স্থূলগদা সংঘাতয়তি বৈরিণং।
দুর্য্যোধন-সহায়স্য কর্ণস্য শায়কস্তথা॥
হরিণেব ক্ষুধার্ত্তেন লক্ষ্যং ভীমেন লক্ষ্যতে।
কর্ণো বিরাজতে যুদ্ধে মদক্ষরকরীন্দ্রবৎ॥

এই কারিকার প্রথম কিয়দংশের অর্থ এই 'পাণ্ডুপুত্র ভীম যেমন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর, কর্ণও তদ্রূপ। তাহাদের সম্মুখ-যুদ্ধে অদ্য যে কি ফল হইবে জানি না।' 'কর্ণও তদ্রূপ', এই দার্ষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, 'কর্ণও যুদ্ধে তদ্রূপ দুর্দ্ধর্ষ।' দৃষ্টান্তে অর্থাৎ ভীমে 'পাণ্ডুপুত্রত্ব' প্রবেশ আছে বলিয়া, দার্ষ্টান্তে অর্থাৎ কর্ণে 'পাণ্ডুপুত্রত্ব' সিদ্ধ করা যাইবে না। কারণ, কর্ণ পাণ্ডুপুত্র নহে তাহা সিদ্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত কারিকাটীর মধ্যাংশের অর্থ এইরূপ 'ভীমের স্থূল গদা

যেমন শত্রু নির্ম্মূল করে, দুর্য্যোধন-পক্ষীয় কর্ণের শায়কও তদ্রূপ। 'কর্ণের শায়কও তদ্রূপ' এই দার্ষ্টান্তে বুঝিতে হইবে 'কর্ণের শায়কও তদ্রূপ শত্রু নির্ম্মূল করে।' 'কর্ণের শায়কও তদ্রূপ স্থূল ও শত্রু-নাশ করে' এতটা অর্থ আনা চলিবে না। গদায় 'স্থূল' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, গদারই শত্রু-নাশকতা শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশ করিবার জন্য। শায়কের স্থূলতা শত্রু-নাশকতা শক্তির উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক নহে। কারিকাটীতে তৎপরে উক্ত হইয়াছে 'ভীম ক্ষুধার্ত্ত হরির ন্যায় লক্ষ্য বস্তুর উপর লক্ষ করিতেছেন।' লক্ষ্য বস্তুর উপর লক্ষই মাত্র, দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তে বিশেষ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-বাক্যে রহিয়াছে বলিয়া ভীমকে যুদ্ধকালে ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে না। 'ক্ষুধার্ত্ত' বিশেষণ সিংহেরই উৎকৃষ্ট লক্ষ্যানুসন্ধানের ব্যঞ্জক। কারিকায় সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে 'কর্ণ মদক্ষর করীন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধে বিরাজ করিতেছেন।' 'মদক্ষর' বিশেষণ দৃষ্টান্ত-স্থলাভিভূত করীন্দ্রেরই দুর্দ্ধর্ষতা-ব্যঞ্জক, কর্ণের দুর্দ্ধর্ষতা সিদ্ধ করিবার জন্য মদক্ষরণ রূপ হেতু কর্ণে টানিয়া আনিতে হইবে না। সর্ব্ববস্তু ব্রহ্ম নহে ও ব্রহ্মের বিকার নহে, ইহা সিদ্ধ আছে। 'নামধেয় বিকারের' দোহাই দিয়া, এবং 'মৃত্তিকেত্যেব-সত্যং' এই সকল উল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্তটীকে মাত্র সুসঙ্গত করিতে পারিয়াছেন। দার্ষ্টান্তে ওই সকল হইতে কিছু অনুমান করা চলিবে না। একটা মৃত্তিকা-দ্রব্য বুঝাইয়া দিলে, যাহা বুঝান হয় নাই, এমন মৃদ্বস্তুও পরে মৃদ্বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারিবে; মাত্র সেই পক্ষেই হেতু হইতেছে, 'সকল গুলিই তো মৃত্তিকা বটে, নামধেয় বিকার মাত্র বিশেষ।' 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই জ্ঞানের পর অবিদিত অশ্রুত

সকল পদার্থের জ্ঞান হইবে, এপক্ষে হেতু এই যে, ভগবৎ কৃপায় ঐ আহার্য্যজ্ঞান ভাঙ্গিয়া গিয়া পরাভক্তি বলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যাইবে। এ বিষয় ইতি পূর্ব্বে প্রমাণ সহ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, একটা জ্ঞানের পর অবিদিত বস্তুর জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে, দৃষ্টান্ত-বাক্যে ইহাই মাত্র বুঝান হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও এই মীমাংসাই করিয়াছেন, পরে ইহা পাঠক জ্ঞাত হইতে পারিবেন। লোকের আশু-মোহকর এইরূপ আরো কয়েকটী দৃষ্টান্ত অদ্বৈতবাদিগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥

অদ্বৈতবাদিগণ এই সকল দৃষ্টান্ত আপনাদের মনের মত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। ফলে, এই জাতীয় সকল দৃষ্টান্তের অর্থই পূর্ব্ব-প্রদর্শিত নিয়মে করিতে হইবে। "যথা হসন্ স্বং লভতে দরিদ্রঃ। দদাতি কর্ণো দ্রবিণং তথা হসন্" অর্থাৎ দরিদ্র যেমন হাসিতে হাসিতে অর্থ গ্রহণ করে, কর্ণ তেমনি হাসিতে হাসিতে ধন দান করিয়া থাকেন। এখানে পূর্ব্বার্দ্ধের সমাপিকা ক্রিয়া 'গ্রহণ করা।' পরার্দ্ধে সমাপিকা ক্রিয়া 'দানকরা।' সুতরাং এ অংশ দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তে সাধারণ-ধর্ম্ম নহে। 'হসন্' এই অসমাপিকা ক্রিয়াটীই উভয়-সাধারণ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে—"ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যটীও ঠিক এইরূপ। নদী সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, জীবাত্মা ব্রহ্মের

সমান হন। সুতরাং সমাপিকা ক্রিয়ার ঐক্য নাই। তবে উভয়েই নাম রূপ পরিত্যাগ করে বটে। অতএব 'নামরূপে বিহায়' এই অসমাপিকা ক্রিয়াই দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তে 'অনুগত ধর্ম্ম' বুঝিতে হইবে। মুণ্ডকোপনিষৎ যে ভগবদ্ গীতার সহিত অবিরোধী অগ্রে এ বিষয়ের আভাস দেওয়া হইবে। অনন্তশাস্ত্ররাশি হইতে যদি পাঁচ সাতটি জটিলার্থক দৃষ্টান্ত মিলিয়া থাকে, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসের যাবৎ বাক্যদ্বারা উপপন্ন এবং প্রত্যক্ষাদি যাবৎ উপায়-লব্ধ পদার্থসমূহ, তদ্দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। উর্ণনাভ হইতে যেমন জল নির্গত হয়, পুরুষ হইতে যেমন কেশ-লোম নির্গত হয়, অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়' এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জালের প্রতি, কেশলোমের প্রতি এবং স্ফুলিঙ্গের প্রতি যথাক্রমে উর্ণনাভ, পুরুষ এবং অগ্নি যেমন অপ্রধান কারণ মাত্র, প্রধান কারণ যেমন ব্রহ্ম, সেইরূপ নিখিল বস্তুর প্রতি আর যে যে কারণ থাকিতে পারে সকলেই অপ্রধান কারণ, প্রধান কারণ একমাত্র ব্রহ্ম। দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে উর্ণনাভ-ঘটিত এবং কেশলোম-ঘটিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের দ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে, জালে ও উর্ণনাভে, কেশলোমে ও পুরুষে যেমন ভেদ সিদ্ধ, নিখিল বস্তুতে ও ব্রহ্মে সেইরূপ ভেদ সিদ্ধ। দৃষ্টান্তের দ্বারা এইরূপ আংশিক বিষয় মাত্র দার্ষ্টান্তে সিদ্ধ হইবে।

শিষ্য। একের দ্বারা অজ্ঞাত সামগ্রীরও জ্ঞান হইতে পারে, ইহাই মাত্র পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা-ঘটিত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য আপনি বলিতেছেন। একের দ্বারা যে সকল পদার্থের জ্ঞান হইতেছে, সে পদার্থ গুলি তাহার বিকার নহে. এরূপ দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যাইত না? অতএব মৃত্তিকা-ঘটিত দৃষ্টান্ত না দিয়া সেইরূপ দৃষ্টান্ত দিলেন না কেন?

গুরু। সেরূপ দৃষ্টান্ত কি গ্রন্থে নাই? পাছে পদার্থ-নির্ণয়ে

লোকের কোনও ভ্রম জন্মে, একারণ মৃত্তিকা-ঘটিত কল্প ত্যাগ করিয়া কিরূপ কল্পে উঠিয়াছেন দেখ,

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং
লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো
নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং।

এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি, অয়স্কান্তমণির সাহায্যে সকল লোহময় পদার্থের জ্ঞান হয়। অথচ সে সকল পদার্থ লোহের বিকার, অয়স্কান্তমণির বিকার নহে। আরও দৃষ্টান্ত দেখ,

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং
কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো
নামধেয়ং কার্ষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং।

নখনিকৃন্তনযন্ত্র কার্ষ্ণায়স-বিকাশের হেতু হইলেও, উপাদান বিধায় হেতু মূল-কার্ষ্ণায়স; নখনিকৃন্তন-যন্ত্র উপাদান-বিধায় হেতু নহে, ইহাই এই দৃষ্টান্তে বুঝান হইয়াছে। দার্ষ্টান্তেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম জগতের হেতু হইলেও. উপাদান-বিধায় হেতু মূল-পদার্থ, অর্থাৎ পরমাণু; ব্রহ্ম উপাদান বিধায় হেতু নহেন।

শিষ্য। দৃষ্টান্ত গুলি জ্ঞানপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল কই?

গুরু। কি গুরুতর দোষারোপ! দৃষ্টান্তগুলি জ্ঞানপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, মাথার দিব্য আছে নাকি? এক বস্তুর দ্বারা অজ্ঞাত সামগ্রীর জ্ঞান হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তে সেই একবস্তু 'লোহমণি' 'নখনিকৃন্তন।' দার্ষ্টান্তে সেই এক বস্তু 'ব্রহ্মাভেদজ্ঞান।' তুমি দৃষ্টান্ত গুলিকে জ্ঞানপর বলিয়াছ বলিয়া আমাকেও কদর্থ করিয়া

সেইরূপ ব্যাখ্যাই রাখিতে হইবে নাকি? অদ্বৈতবাদিগণ যেখানেই শ্রুতি সাধক দিয়াছেন, পূর্ব্বাপর পরিত্যাগ করিয়া লোকের নিকট প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রুতি গুলি সকলই অদ্বৈত-পর। সমগ্র গ্রন্থ আলোচনা করিলে কোন' শ্রুতিই অদ্বৈতপর বলিয়া বোধ হয় না, ইহাই পরিতাপের বিষয়?

শিষ্য। আপনি অদ্বৈতবাদই না হয় খণ্ডন করিতেছেন, কিন্তু ন্যায়ের মতই কি ইহাতে সম্পূর্ণ সংস্থাপিত হইল? 'ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং' এই সকল শ্রুতির দ্বারা পূর্ব্বে পরমাণু সিদ্ধ করিয়াছেন। তাহা করিলে পরমাণুর রূপ রোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ হওয়া উচিত। যেহেতু, আপনার শ্রুতি রহিয়াছে, "যদ্রোহিতং রূপং তদগ্নেঃ, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য।" "অজামেকাং রোহিত শুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি বাক্যেও ঐপ্রকার রূপই সিদ্ধ হয়। ন্যায় শাস্ত্রের কি তাহাই মত? আকাশ জন্মিয়াছে বলিয়া শ্রুতি প্রমাণ দেওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রের কি তাহাই মত? ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। ন্যায়শাস্ত্রের কি ব্রহ্ম বিষয়ে ইহাই মত? অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া 'মুরারে স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ' না দাঁড়াইয়া যায়।

গুরু। তৈজস, জলীয়, পার্থিব পরমাণু যে রূপবৎ, ইহা শ্রুতির তুল্য ন্যায় শাস্ত্রেরও মত। প্রমাণাদির দ্বারা সেই সেই পরমাণুর রূপ যাহা সিদ্ধ হইবে, তাহাই প্রকৃতরূপ। যদি সেই প্রমাণ-সিদ্ধ রূপের বিষয় উল্লেখ না থাকিয়া, অন্যরূপের প্রকাশক বাক্য কোথায়ও উল্লেখ থাকে, তবে তাহা পরিভাষাপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বাক্য দেখিয়া অজ্ঞান হইতে হয় না। সিদ্ধ পদার্থের সহিত বিরোধ-ভঞ্জন করিবার জন্য 'শক্তি' 'লক্ষণা' প্রভৃতি বিবিধ

উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 'আকাশ জন্মিয়াছে' এইরূপ বাক্য পাইলে, অজ্ঞান হইতে হয় না। 'যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে' এই বাক্যের দ্বারা কি আকাশের সূক্ষ্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে? অতএব 'সৌক্ষ্ম্যাৎ' ইহার লাক্ষণিক অর্থ করিতে হইবে। শব্দ দেখিলেই অজ্ঞান হইতে হয় না। "ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত অহো রাত্রাণি—" এই শ্রুতির মধ্যে দেখা যায়, দিন, রাত্রি, সম্বৎসর সকলই জন্মিল। তা-বলিয়া 'মহাকাল' 'জন্য' নহে। যেহেতু প্রমাণ রহিয়াছে, 'অনাদি নিধনঃ কালঃ।' 'কালের বিভাগ জন্মিল' এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির ভিতরই, 'রাত্রি জন্মিল' এ সম্বন্ধে দুইবার উল্লেখ, 'সমুদ্র জন্মিল' উল্লেখ করিয়া আবার 'অর্ণব জন্মিল' উল্লেখ। অতএব অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া সিদ্ধ পদার্থের অবিরোধী করিয়া লইতে হইবে। আকাশের নিত্যত্ব-সাধক প্রমাণ থাকিলে 'আকাশ জন্মিল' এই সকল কথারও মীমাংসা হইতে পারে জানিবে। ব্যাসসূত্র ব্যাখ্যা কালে এ বিষয় সপ্রমাণ করা হইবে। তুমি শ্রুতিগুলির স্থূল অর্থই বুঝিতে পার। দার্শনিক পদার্থ-সাধক অন্যান্য প্রমাণ তোমার বোধগম্য হইবে না। সকল প্রমাণ বঙ্গভাষায় প্রকাশেরও উপায় নাই। তবে একটী কথা ইহা জানিবে, আর্য্যদর্শনকারেরা কেহই শ্রুতি-বিরুদ্ধ দর্শন করেন নাই। শ্রুতি নানাদিকে লাগান যায় বলিয়া, শ্রুত্যর্থ স্থিরীকরণের জন্য একমাত্র নৈয়ায়িকেরাই বিবিধ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম এই প্রমাণ-বাক্য ন্যায়শাস্ত্রের বিরোধী নহে। কারণ এই বাক্যে জানা যায়, ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ নহেন। তিনি আনন্দ-স্বরূপ হইলে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগ

না করিয়া, প্রচলিত পুংলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগেই সে অর্থ আসিতে পারিত। প্রচলিত 'আনন্দ' শব্দ যে পুংলিঙ্গ ইহার প্রমাণ যথা, 'স্যাদানন্দথুরানন্দঃশর্ম্মশাতসুখানি চ।' ইত্যমরঃ। বিশেষ তাৎপর্য্যে প্রচলিত ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে। (আনন্দয়তীতি) 'আনন্দং' সিদ্ধ করিবার জন্য। আ + নন্দ + ণিঙ + ড এইরূপে) ব্যুৎপত্তি করিতে হইবে। অতএব উহার অর্থ 'আনন্দ-জনক' বুঝিতে হইবে। (আ = সম্যক্, নন্দঃ = হর্ষঃ, যস্মাৎ, এইরূপে) বহুব্রীহি সমাস করিলেও ক্লীবলিঙ্গ থাকিতে পারে। সেরূপ করিলেও 'আনন্দজনক' অর্থ আসিবে। ব্রহ্ম যে আনন্দজনক, শ্রুবাদিতে তাহার প্রমাণ। 'বিজ্ঞানং' এই শব্দেরও অর্থ করিতে হইবে, (বিশিষ্টং জ্ঞানং যস্মাৎ অর্থাৎ) জ্ঞানজনক। অদ্বৈত-বাদি পক্ষীয় ব্যাখ্যা কোনও রূপে সঙ্গত নহে। 'জ্ঞানং' বলিলেই 'জ্ঞান-স্বরূপ' বুঝিতে পারা যাইত, 'বি' উপসর্গের প্রয়োগ কেন? সকল জ্ঞানের স্বরূপ নহে, ব্রহ্ম বিশেষ-জ্ঞানের স্বরূপ এই হেতু নিবন্ধন উপসর্গটী প্রদান করা হইয়াছে, এ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। 'বি' উপসর্গের সাহায্যে অপরাপর জ্ঞান ব্যাবর্ত্তন করিতে হইলে, 'স্বপ্রকাশ-বোধ' পর্য্যন্ত ব্যাবর্ত্তিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম 'শিল্প-শাস্ত্র-বোধ-স্বরূপ' ইহাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। কোষ রহিয়াছে 'মোক্ষেধী র্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ'। অতএব এক তুচ্ছ আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে গিয়া, গুরুতর আশঙ্কার সৃষ্টির জন্য 'বি' উপ-সর্গ লক্ষণে প্রবিষ্ট নহে। বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'জ্ঞানজনক' অর্থ করিবার জন্যই 'বি' উপসর্গটী প্রদান করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শরীর পরিগ্রহ করিয়া, ব্রহ্ম যে জ্ঞানদাতা হন, এবিষয়ে প্রমাণ যথা, 'জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ'

ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বুঝা গেল, ব্রহ্মই ঐহিকে আনন্দদাতা ও মুক্তির জন্য জ্ঞানদাতা। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ নহেন তাহাও ঐ বচনে সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। সুতরাং 'জ্ঞান' বা তদ্বাচক 'চিৎ' 'চৈতন্য' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এবং 'আনন্দ' বা তদ্বোধক কোনও শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ থাকিলে অন্ততঃ 'লক্ষণার' দ্বারা 'জ্ঞান-জনক' 'আনন্দ-জনক' এই অর্থ করিতে হইবে। ব্যাসসূত্র দৃষ্টে পাঠক অগ্রেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন, বিনা লক্ষণায়ও ঐ অর্থ সিদ্ধ হইবে। জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ সামগ্রী। ব্রহ্মে রূপক সাজাইবার প্রয়োজন কি? যদি দুইটী শব্দই এক সামগ্রীর বোধক হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হয় না। যদি অমরকোষাদির ন্যায় অভিধান করা প্রয়োজন হয়, তবে জ্ঞান-বাচক আর যে যে শব্দ আছে, আনন্দ-বাচক আর যে যে শব্দ আছে, সে গুলিরও কিছু কিছু উল্লেখ থাকিত। ঐ দুইটী সামগ্রীই ব্যব-হারিক কোষে পৃথক্, পারমার্থিক হিসাবে এক, ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, এ মীমাংসাও যুক্তিযুক্ত নহে। ব্যব-হারিক-কোষে পার্থক্য থাকিলেই, তদ্বিরোধবোধককে লক্ষণাপর বলিতে হয়। নচেৎ 'আয়ুর্ঘৃতং' 'ঘৃতমমৃতং' ইত্যাদি শ্রুতি-বলে আয়ুঃ, ঘৃত ও অমৃত একই পদার্থ হইয়া যায়। এইরূপ বিবিধ স্বরস থাকায় ব্রহ্ম, জ্ঞান, আনন্দ সকলই পৃথক্ সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 'আয়ুর্ঘৃতং' 'ঘৃতমমৃতং' ইত্যাদি শ্রুতি-মত 'আনন্দজনক' 'জ্ঞানজনক' ইত্যাদি অর্থ করিতে হইবে। নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম এই প্রকার শ্রুতির কোনও কোনও অভিজ্ঞ সম্প্রদায় আর এক কৌশলে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। 'অধর্ম্মাজ্ জায়তে দুঃখং ধর্ম্মাদুৎপদ্যতে সুখং' ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহারা

বলেন, যখন 'শুভাদৃষ্টজন্যতাবচ্ছেদকত্বে' 'আনন্দত্ব' জাতি সিদ্ধ, তখন নিত্য-ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ হইতেই পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মে যে 'আনন্দ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা পারিভাষিক, অর্থাৎ ব্রহ্মের 'আনন্দ' একটী নাম মাত্র। সর্ব্বনামের মধ্যে 'সর্ব্ব' শব্দ ধৃত হইয়াছে। শিবেরও একটী নাম 'সর্ব্ব'। উভয়েই কি সাজাত্য আছে বুঝিতে হইবে? সর্ব্বনাম-বাচক-শব্দের মধ্যে 'তৎ' শব্দ ধৃত, ব্রহ্মেরও একটী নাম 'তৎ'। তা বলিয়া কি পরস্পরে একই বস্তু? উক্ত অভিজ্ঞ সম্প্রদায় আরো বলেন 'সুখ' 'আনন্দ' প্রভৃতি যে কয়েকটী নামের দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, আমরাও তদ্দ্বারাই ব্রহ্মকে অভিহিত করিতে পারিব। নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম এই জাতীয় প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া, নিত্যং বিজ্ঞানমামোদং ব্রহ্ম, নিত্যং বিজ্ঞানং মুদ্ ব্রহ্ম, নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দথুর্ব্রহ্ম ইত্যাদি প্রয়োগ যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারিব না। ঐ সকল শব্দের মধ্যে যে গুলির দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই গুলিই মাত্র ব্রহ্মের নাম। যখন সংজ্ঞান্তর হইল তখন 'আনন্দং' এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগেরও স্বারসিকতা রহিল। 'জ্ঞান' 'বিজ্ঞান' 'চিৎ' 'চৈতন্য' 'বোধ' ইত্যাদি প্রয়োগ সম্বন্ধেও ঐ অভিজ্ঞ সম্প্রদায় এই ভাবেরই মীমাংসা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এইরূপ প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া, সত্যং বুদ্ধিরনন্তং ব্রহ্ম, সত্যমুপলব্ধিরনন্তং ব্রহ্ম, সত্যং শেমুষী অনন্তং ব্রহ্ম, এই সকল প্রয়োগ যদৃচ্ছা ক্রমে কেহ করিতে পারিবে না। এই সকল শব্দের মধ্যে যে যে শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, তদ্দ্বারাই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যেহেতু এইগুলি ব্রহ্মের নামমাত্র, সেইহেতু নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম এই শ্রুতিবলে ব্রহ্ম শিল্পশাস্ত্রবোধস্বরূপ হইতে পাইলেন না। এই

সকল বিবিধ যুক্তি নিবন্ধন জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, আনন্দ, সুখ, চিৎ, চৈতন্য, বোধ ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের নাম মাত্র। ইহাদের স্বরূপ তিনি নহেন। এ সকল যুক্তিও ভাবিবার বিষয়। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ এই সকল শ্রুতিবাক্যই মাত্র ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশক। ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব-সাধক বহু যুক্তিই নৈয়ায়িকেরাও প্রদর্শন করাইয়াছেন। ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বাংশ সংস্থাপন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থ সাধক প্রমাণ সকল দৃষ্টি করিতে হইলে, ন্যায়শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন কর। এখানে এইটুকু মাত্র জানিবে, যাহা ভিন্ন বলিয়া দেখিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, ইহারা কেহই ব্রহ্ম নহে। বিভিন্ন 'সত্য', অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীভূত সামগ্রী। তন্মধ্যে কেহ 'জন্য', কেহ 'নিত্য', ইহাই অশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গীতায় পঞ্চদশাধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিতেছেন। যথা,

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

'জন্য' ও 'নিত্য' ভেদে দুইপ্রকার পদার্থ ভগবদ্বাক্যের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অধিক প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

শিষ্য। 'পুরুষ' শব্দে 'পদার্থ' বোধ হয় নাকি?

গুরু। 'পুরুষ' এইশব্দ এস্থলে পরিভাষাপরমাত্র। স্ত্রীপুরুষের পুরুষ নহে। পদার্থকেই 'পুরুষ' সংজ্ঞা বা পরিভাষা প্রদান করা হইয়াছে। অতএব ঐ ভগবদ্বাক্যে বুঝা যাইতেছে যে, সমুদয় বস্তুই ক্ষর অর্থাৎ

অন্ত। কেবল কতিপয় বিশেষ সামগ্রী মাত্র নিত্য। কূটস্থ অর্থাৎ শরীরস্থ (জীবাত্মা), অক্ষর অর্থাৎ নিত্য। অন্য যে পুরুষ, অর্থাৎ ক্ষর ও কূটস্থ অক্ষর ভিন্ন যে পুরুষ, তিনি উত্তম অর্থাৎ উত্তমাক্ষর।

শিষ্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নিত্য বলা হইল। পরমাণু প্রভৃতিকে লক্ষণে ধরা হইল না কেন?

গুরু। 'ক্ষর' 'কূটস্থাক্ষর' ও 'উত্তমাক্ষর' এই কয়েকটী পদার্থকে মাত্র 'পুরুষ' পরিভাষা প্রদান করিয়া লক্ষণ করা হইয়াছে। তদতিরিক্ত পদার্থও আছে বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। কেন তাহা বুঝিব?

গুরু। লক্ষণ কয়েকটীর মধ্যে উত্তমাক্ষরের লক্ষণটী নিপুণতার সহিত দৃষ্টি কর। লক্ষণ করা হইয়াছে উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ। 'অন্যঃ' এই পদের অর্থ করা হইয়াছে 'ক্ষর ও কূটস্থাক্ষর ভিন্ন।' অতএব সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, একমাত্র 'অন্য' শব্দের দ্বারাই উত্তমের অর্থাৎ উত্তমাক্ষরের লক্ষণ নির্ব্বাহ পাইত। লক্ষণে 'পুরুষ' শব্দটী প্রবেশ করাইবার আবশ্যক হইত না। কূটস্থাক্ষর ভিন্ন ও ক্ষর ভিন্ন আরও পদার্থ থাকায়, লক্ষণ পাছে সেই সকল পদার্থে যায় সেই ব্যভিচার বারণ করিবার আশায় লক্ষণে 'পুরুষ' শব্দটী প্রবেশ করান হইয়াছে। আরও যদি নিত্যবস্তু না থাকে তবে লক্ষণে 'পুরুষ' শব্দ প্রবেশ করায় ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত লক্ষণ দাঁড়াইয়া যায়। ইহাতেই বুঝিয়া লও, 'পুরুষ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া সকল পদার্থের লক্ষণ করেন নাই। আরও নিত্য পদার্থ আছে।





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

স আত্মা তত্ত্বমসি ইত্যাদি শ্রুতির প্রদর্শিত ব্যাখ্যায় অদ্বৈতপক্ষ হইতে দোষাশঙ্কা। নবীন ভাবে বিবিধ ব্যাখ্যা প্রদর্শন। বিবিধ সামগ্রীর সত্তাত্ব সংস্থাপন। অব্যাখ্যাত শ্রুতির ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ উপদেশ। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা ও বিরোধী শ্রুতি প্রদর্শন। ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের বিস্তৃত পরিচয়। কুতর্কে দোষ-শ্রুতি। ন্যায়দর্শন-নির্ণীত মুক্তির লোভনীয়তা। বিবিধ দর্শনোক্ত মুক্তির স্বরূপ। উদয়নাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধনিরাস।

শিষ্য। আপনি অদ্বৈতবোধক শ্রুতিগুলিকে জ্ঞানপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেরূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিটীকে জ্ঞানপর বলিলে আপনার উদ্দেশ্য কই সিদ্ধ হইতেছে? কারণ, ঐ শ্রুতিবলে পরমাণু-প্রযোজক বস্তুসমূহকে, এবং "তত্ত্বমসি" এই অংশের দ্বারা জীবকেই মাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে। তদতিরিক্ত পদার্থে কি ব্রহ্মজ্ঞান করিতে হইবে না?

গুরু। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় পরমাণু-প্রযোজকত্ব জন্যবস্তুমাত্রেই বিদ্যমান। অতএব সকল জন্য-পদার্থই ধরা পড়িতেছে। কেবল পরমাত্মাদি কতিপয় নিত্যবস্তু ধরা পড়িতেছে না। ব্রহ্মাভেদ চিন্তা করিবার যে আবশ্যকতা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, সমুদয় ব্যক্ত বস্তুতে এবং জীবাত্মায় সে চিন্তা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অব্যক্ত বস্তু সকল ধরা না পড়িলে কোনই হানি নাই। অদ্বৈতপক্ষীয় ব্যাখ্যায়ই বরং দোষ ঘটিয়াছে। কারণ, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এইরূপ উল্লেখ থাকিলেও অবিদ্যাকে তো এই শ্রুতি হইতে বাহিরে রাখিতে হইবে। অতএব দ্বৈতপক্ষীয় ব্যাখ্যাই নির্দ্দোষ। সাধনাঙ্গের সকল অবস্থা তোমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়াছি। এই সকল শ্রুতি কোন্ অঙ্গে সাধক, কোন্ অঙ্গে বাধক, যথাশাস্ত্র তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তথাপি জ্ঞানপর বলিলে যদি তোমার তৃপ্তি না হয়, তবে অন্যরূপেও অর্থ করা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধ-পদার্থের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া, অথবা অস্বারসিকভাবে, কোনও রূপ ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে না।

শিষ্য। জ্ঞানপর রূপে মীমাংসা না করিয়া অন্যরূপেও কি আপনি মীমাংসা করিতে পারেন ?

গুরু। কেন পারিব না ? তুমি পদার্থসাধক বলিতেছ, আমিও পদার্থসাধক বলিব। পরমাণু-সংস্থাপনের পরেই উক্ত হইয়াছে, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং অর্থাৎ এই সমুদয় বস্তু পরমাণু-জন্য এবং আত্ম-জন্য। তাৎপর্য্য এই, এই সকল সৃষ্টবস্তুর কর্ত্তা আত্মা, এবং উপাদান অথবা পরম্পরা-প্রযোজক পরমাণু। "ঐতদমিদং সর্ব্বং" অথবা "আত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এরূপ উল্লেখ করিলেন না কেন, ইহা অদ্বৈতবাদি-গণের উপর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের উপর এক্ষণে আর

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। ঐতদং=এতদ্‌জন্যং। এই 'এতৎ' শব্দের দ্বারা অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্থাপিত পরমাণু ধাত করা যাইতেছে। আত্ম্যং=আত্মজন্যং। "এষ ইদং সর্ব্বং" "আত্মা ইদং সর্ব্বং" এ সকল উল্লেখ করার পরিবর্ত্তে, যে ভাবে শ্রুতিটী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

শিষ্য। উপক্রম উপসংহারে ঐক্য হইল কই ?

গুরু। এক জ্ঞানের দ্বারা অবিদিত সকল বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য উপক্রম করিলেন। উপসংহারে বুঝাইয়া দিলেন "পরমাণু-প্রযোজক যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর জনক ব্রহ্ম।" অতএব, ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে বৈশিষ্ট্য-মুদ্রায় যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব পাইবে। এক জ্ঞানের (অর্থাৎ এক ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের) অবলম্বনে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান (অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার) হইতে পারে, ইহা উপক্রমে লিখিত হইয়াছিল, উপসংহারে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বৈশিষ্ট্যমুদ্রা কিরূপ ? রূপবৎ ঘটের প্রত্যক্ষ কালে যেমন রূপের প্রত্যক্ষ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ সর্ব্ববস্তুর কর্ত্তৃরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কালে সর্ব্ববস্তুর সাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী। যোগজ-সন্নিকর্ষ-বলে এইরূপ সাক্ষাৎকার যে হইতে পারে, "যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" "সর্ব্বজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" "সর্ব্বলোক মহেশ্বরং" প্রভৃতি বাক্যের ব্যাখ্যা কালেও তাহা বিবৃত করা হইয়াছে।

শিষ্য। আহার্য্যজ্ঞানপর বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এ অংশের সহিত 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই বাক্যের সর্ব্বত্র যোগাযোগ থাকে কই ?

গুরু। যোগাযোগ আছে। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই বাক্যের দ্বারা উপাদানরূপে যে পরমাণু সিদ্ধ হইতেছে, তাহার পরিচয় অব্যবহিত

পূর্ব্বেই আছে। ঐ বাক্যে জগৎকর্ত্তারূপে যে আত্মার উল্লেখ করা হইল, সে আত্মা কে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ বলা হইয়াছে তৎ সত্যং স আত্মা। অর্থাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পূর্ব্বে যে সত্য-পদার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনিই সেই (জগৎকর্ত্তা) আত্মা। 'তৎ সত্যং স আত্মা' ইহা বিভিন্ন বাক্য নহে, একই বাক্য। তৎ সত্যং স আত্মা এই ভাবের প্রয়োগের দ্বারা ছলতঃ ইহাও বুঝা যাইতেছে, সত্যও বিবিধ, আত্মাও বিবিধ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং সত্যং আত্মা" অথবা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং আত্মা" এ ভাবের প্রয়োগ করা না হইল কেন, অদ্বৈতবাদীর নিকট এ জিজ্ঞাস্য সঙ্গত হইলেও, বর্ত্তমান দ্বৈতব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই অংশের সার্থক্য এক্ষণে বিচার করা যাউক। একবস্তু অবলম্বনে সকল বস্তুর জ্ঞান কিরূপে নির্ব্বাহ পায়, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম উপসংহারে অনৈক্য নাই। উপক্রম দৃষ্টে আরও জানা যায়, আরুণির কুলে বৃথা চিন্তায় কেহ কালক্ষেপ করেন নাই। পুত্র শ্বেতকেতুও বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ করেন, ইহা পিতার অভিপ্রেত নহে। অতএব যাহার জ্ঞান, প্রকৃত "জ্ঞান" পদবাচ্য, তাহাও উপসংহারে প্রসঙ্গাধীন পুত্রকে উপদেশ করা পিতার উচিত। "ইদং শরীরং কৌন্তেয়—" ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা কালে, পূর্ব্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবজ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান। আরুণিও সেইজন্যই ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়া সর্ব্বশেষে তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই বাক্যের দ্বারা জীবজ্ঞানের (অর্থাৎ "জীব শরীর ভিন্ন" এই জ্ঞানেরও) আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন। কিরূপে বুঝা গেল, জীব শরীর ভিন্ন? উত্তর এই, যেহেতু তাহাকে সত্য (অর্থাৎ নিত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। কোন্

বাক্যের দ্বারা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল? উত্তর এই, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই বাক্যের "তৎ" শব্দটী পূর্ব্বোপক্রান্ত "সত্যের" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত। "তৎ" শব্দটী অব্যয় হওয়ায় পূর্ব্বোপক্রান্ত 'সত্য' ও 'আত্মা' এই উভয়ের পরিবর্ত্তেও ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। 'তৎ' শব্দের একদেশ-গ্রাহিতায় প্রমাণ যথা, "পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা।" বিশেষ বিচার মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ফলিতার্থ এই, শ্বেতকেতুকে পিতা বলিতেছেন "অহং স্থূলঃ" "অহং সুন্দরঃ" ইত্যাদি জ্ঞান যতদিন জন্মিবে ততদিন তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু, আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন। কেননা শরীর জন্য। কিন্তু হে শ্বেতকেতো! তুমি সত্য (অর্থাৎ নিত্য)। এই উদ্দেশ্যেই তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। "স আত্মা ত্বমসি" "স আত্মা স ত্বমসি" এরূপ ভাবে শ্রুতিটী উল্লিখিত হয় নাই কেন, এ জিজ্ঞাসা অদ্বৈতবাদিগণের নিকট করা যাইতে পারে, আমাদের নিকট করা যায় না।

শিষ্য। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই বাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য আপনি বাহির করিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে সৃষ্টবস্তুর মধ্যে পরমাণুর জ্ঞানই সম্ভব পাইবে। দিক্, গগন, কাল প্রভৃতি আর যাহা যাহা অবশিষ্ট রহিল, সর্ব্বজ্ঞাবস্থায় তাহাদের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার কি ঘটিবে না?

গুরু। জনকতা-জ্ঞান কালে "অন্যথাসিদ্ধিমুদ্রায়" আর আর সকল বস্তুর সাক্ষাৎকারও সম্ভব পাইবে। এ বিষয়ের পরিপাটী মূল-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এখানে এইটী মাত্র বলা যাইতে পারে, গগন, দিক্, কাল, ব্রহ্ম এ সকল পৃথক্ নহে, নৈয়ায়িক-আচার্য্যেরা কেহ কেহ এরূপও সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, আমাদের ব্যাখ্যায় কোনই

অনিষ্ট-সম্ভাবনা নাই। অদ্বৈতপক্ষীয় ব্যাখ্যাই বরং অনেক জটিল। কারণ, সে ব্যাখ্যায় উপক্রম উপসংহারে সুস্পষ্ট ঐক্য নাই। উপসংহারে পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে একাকার-বুদ্ধি করাইতে চাহিতেছেন ইহা যদি তাঁহাদের ব্যাখ্যা হয়, তবে তো তাঁহাদের মতে বলিতে হইবে যে, শ্বেতকেতুর অবিদ্যা দূরীভূত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু পুত্রের অবিদ্যা দূরীভূত করিবেন বলিয়া উপক্রম করেন নাই। অবিজ্ঞাত বস্তু কিরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই পুত্রকে বুঝাইবেন বলিয়া উপক্রম করিয়াছিলেন। যথা, "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম-বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি।" অতএব বুঝা যাইতেছে, অশ্রুত, অসম্মত, অবিজ্ঞাত সকল বস্তু কিরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যাইবে তাহাই পুত্রকে ব্যক্ত করা তাৎপর্য্য। অশ্রুত, অসম্মত, অবিজ্ঞাত সকল বস্তু কিরূপে এক হইয়া যাইবে, তাহা আদেশ করা পিতার তাৎপর্য্য নহে। উপ-ক্রমোক্ত দৃষ্টান্তগুলিও অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, বিজ্ঞাতত্ব সিদ্ধি করাই তাৎপর্য্য। দৃষ্টান্তগুলি এই "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" "যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" "যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইত্যাদি। যেরূপ অবিদ্যা-সাহায্যে তোমরা "সর্ব্বজ্ঞ" "প্রাজ্ঞ" প্রভৃতির উপপত্তি কর, পুত্রের সেইরূপ অবিদ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়াই উপক্রম করা হইল। তবে উপসংহারের সহিত উপ-ক্রমের ঐক্য হইল কৈ? উপসংহারকে যদি ভাবনাপর বল, তবে আমরা প্রথমে যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহারই সহিত প্রকারান্তরে এক-মত হওয়া হইল। উপক্রম উপসংহারে অদ্বৈতব্যাখ্যায় ঐক্য নাই বলিতেছি, তাহার আরো হেতু আছে। "তদৈক্ষত" "তদসৃজত" ইত্যাদি বাক্য দৃষ্টে জানা যায় যে, উপক্রমে নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত

হয় নাই। সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" বাক্যাদির দ্বারা পুত্রকে তবে কি ব্রহ্মের সহিত অভেদ না বুঝাইয়া ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদ বুঝান তাৎপর্য্য? অতএব অদ্বৈত-পক্ষীয় ব্যাখ্যায় উপক্রম উপসংহারে সুস্পষ্ট ঐক্য নাই। এতদ্-ব্যতীত অদ্বৈতবাদিগণ ভূরি লক্ষণার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। সেরূপে ব্যাখ্যা করা কি স্বারসিক? অদ্বৈতবাদিগণের মতে নারদ শুকদেবাদি পর্য্যন্ত জ্ঞানী নহেন। অধিকন্তু তাঁহারা সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন। যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ। অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তমত জ্ঞান যে কাহারও কস্মিন্‌কালে হইয়াছিল, পুরাণেতিহাসে তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তাভাব। অতএব, জ্ঞানপর বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হউক, অথবা অন্যান্য উপায়েই ব্যাখ্যা করা হোক, শ্রুতি-ব্যাখ্যা এরূপে করিতে হইবে, যাহাতে পদার্থ-তত্ত্বের অপলাপ না হয়।

শিষ্য। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই সকল শ্রুতিকেও জ্ঞানপর না বলিয়া অন্যরূপে ব্যাখ্যা করা যায় কি?

গুরু। আমি সাধনাঙ্গের সকল অবস্থা বিশদ ভাবে বর্ণন করিয়া সকল প্রকার শ্রুতিরই যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। তথাপি যদি এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আপত্তি কর, সরল পথে তোমাকে রাখা যাইবে না। ভাল, তুমিও যেরূপ মীমাংসা করিতেছ, আমিও সেইরূপই করিলাম। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ইত্যাকার শ্রুতিসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হউক 'জগৎ ব্রহ্মময়'। জগৎ যে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতময়, এ বিষয়েও আমার বিশেষ প্রমাণ আছে। তদুপরি তোমার প্রদর্শিত শ্রুতিসমূহকে বল করিয়া সিদ্ধ করা গেল, জগৎ ব্রহ্মময়ও বটে।

শিষ্য। ইহা আবার কি মীমাংসা হইল? পারমার্থিক হিসাবে

ধরিলে সকল পদার্থ ব্রহ্মময়ই মাত্র। পঞ্চভূতময়ত্ব লৌকিক ব্যবহার মাত্র।

গুরু। ইহা আবার কি মীমাংসা হইল? পারমার্থিক হিসাবে ধরিলে সকল পদার্থ ব্রহ্মময়ও বটে, অর্থাৎ ষট্‌পদার্থময়। পঞ্চভূতময়ত্ব লৌকিক ব্যবহার মাত্র। উপহাসের কথায় বাদি-নিরাস হয় না। তোমার দীর্ঘকালের সংস্কার নিবন্ধন ব্যাখ্যা-বিশেষের উপর মনের অনুরাগ আছে, এবং সেইহেতু চোখ-মুখ-নাক মাত্র বাঁকাও তাহাতে বাদি-নিরাস হইবে না।

শিষ্য। সকল পদার্থ পঞ্চভূতময় ইহার প্রমাণ কি?

গুরু। পঞ্চভূতের সর্ব্বাংশ সংস্থাপন করা এ স্থানে অনাবশ্যক। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুতে রূপবৎ তিনটী ভূত বিদ্যমান; তাহা ত্রিবৃত্রিবৃদেকৈকাং করবাণি ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ছান্দোগ্যেই সিদ্ধ। ত্রীণি-রূপাণীত্যেব সত্যং ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা সেই সকল ভূতের সত্যত্ব সংস্থাপনও করা হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিতে যত 'সত্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সকলগুলি কাঁচা ঘুঁটী; কেবল মাত্র ঐতদাত্ম্যমিদং*সত্যং এই শ্রুতির 'সত্য' শব্দটী পাকা ঘুঁটী, এরূপ নিয়ম অভিধানে লেখে না। পারমার্থিক হিসাবে লক্ষণা করিয়া কতকগুলি 'সত্যকে' 'মিথ্যায়' দাঁড় করাইতে হইবে, মনের মত কয়েকটী 'সত্যের' অর্থ 'সত্যই' থাকিবে, এ আদেশ শ্রুতির মধ্যেও নাই। অতএব সৃষ্টবস্তু যেমন পঞ্চভূতাত্মক অথবা পূর্ব্বোক্ত রূপবৎ-ভূতত্রিতয়াত্মক, সেইরূপ ব্রহ্মাত্মকও বটে। পারমার্থিক হিসাবে ধরিলে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যবহার করা যাইবে, লৌকিক হিসাবে ব্যবহার করিলে যে ভূতের আধিক্য থাকিবে, সেই ভূতান্তর্গত করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। শ্রুতিপ্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহারই তাহার সাধক। এ ভাবে শ্রুতি ব্যাখ্যা

করিতে হইলে আরও একটী তাৎপর্য্য বাহির করা যায়। ছান্দোগ্যে আকাশকেই ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, দেখা যায়। যথা, 'ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি।' ব্রহ্ম-সূত্রে ব্যাসদেবও মহাকাশকে স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যথা, 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের মতেও দিক্ কাল গগনে ব্রহ্মের অভিন্নতা সিদ্ধ। অত-এব 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টবস্তুর গগনময়ত্বই সিদ্ধ হইতেছে। 'ত্রিবৃত্রিবৃদেকৈকাং করবাণি' 'ত্রীণিরূপাণীত্যেব সত্যং' এই সকল শ্রুতির দ্বারা রূপবৎ-ভূতত্রিতয়ময়ত্ব সিদ্ধ। কেবল বায়ুময়ত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য প্রমাণান্তর বা যুক্ত্যন্তরের অপেক্ষা রহিল। স য এষোঽণিমা এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধি করা যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহাতেও আর আমার আপত্তি নাই। দিক্, কাল, গগন ও ব্রহ্ম একই হওয়ায়, সকল পদার্থের নাশ কালিকসম্বন্ধে ব্রহ্মেই থাকে, ইহা পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকগণের মত। পক্ষধর মিশ্রাদির মতে স্বরূপ সম্বন্ধে যেমন পরমাণ্বাদিতে নাশ থাকে, সেইরূপ মহাকালেও স্বরূপ সম্বন্ধেই নাশ থাকে। ব্রহ্মে ও কালে ঐক্যবোধক প্রমাণ যথা, 'কাল-স্বরূপং রূপং তদ্ বিষ্ণো মৈত্রেয় বর্ত্ততে' ইত্যাদি।

শিষ্য। পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার যদি আপনার থাকে, তবে তাহাকে তো ব্রহ্মমূলক বলা যাইবে না। অতএব 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' লাগে কই?

গুরু। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই বাক্যস্থ 'সর্ব্ব' শব্দের সহিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই সকল বাক্যের 'সর্ব্ব' শব্দের একার্থ করিতে হইবে। সকল বস্তুই যদি ব্রহ্মাত্ম্য হইত, তবে 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' দিতে হইত না, 'ঐতদাত্ম্যং সর্ব্বং' বলিলেই চলিত। সর্ব্ব শব্দের অর্থ-

সঙ্কোচ উভয়বাদিসম্মত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের 'অবিদ্যা' তো ব্রহ্ম নহে।

শিষ্য। আপনি যে সকল বাক্যের অর্থ করিলেন, তদতিরিক্ত বাক্য পাওয়া গেলে তাহার উপপত্তি কিরূপে করিব?

গুরু। যে জাতীয় শ্রুতিবাক্যাদির উপপত্তি এই গ্রন্থে করা হইল, সে জাতীয় শ্রুতি-বাক্য বড় অধিক আর মিলিবে না। ত্রিশ বত্রিশটী বাক্যের অধিক সম্বল অদ্বৈতবাদিগণের নাই। প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অনন্তশাস্ত্রের যাবৎ বাক্য দ্বারা উপপন্ন পদার্থসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অদ্বৈতবাদীরা এই ত্রিশ বত্রিশটী মাত্র শ্রুতিবাক্যকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সাধক দিয়া থাকেন এবং গালগল্প ও কল্পিত দৃষ্টান্ত দ্বারা নবীন ভাবে পদার্থের উপপত্তি করিয়া থাকেন। এই জন্যই মূল অপেক্ষা তাঁহাদের টীকা ভয়ঙ্কর, গীতা অপেক্ষা ভাষ্য ভয়ঙ্কর। মুক্তির পূর্ব্বাঙ্গীভূত সকল অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। কোন্ উপনিষদের কোন্ শ্রুতি কোন্ অবস্থাপর তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই এক্ষণে বিচার করিয়া আবশ্যকীয় শক্তি ও লক্ষণাদির দ্বারা তাহার সমন্বয় করিতে পারিবেন। ব্রহ্মত্বপ্রকারে নিখিল বস্তুর আহার্য্য জ্ঞান হইলে জীবের যে অবস্থা হয়, তাহাকে অনেক সময় 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' 'ব্রহ্মধামপ্রাপ্তি' 'ব্রহ্মভূত' ইত্যাদি ব্রহ্মঘটিত সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা হয়। ভগবদ্গীতায় সেই অবস্থা-ব্যঞ্জক বাক্য যথা,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

ঈশোপনিষদে সেই অবস্থা-ব্যঞ্জক বাক্য যথা,

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

মুণ্ডকোপনিষদে ঐ অবস্থাব্যঞ্জক বাক্য যথা,

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

ঐ অবস্থা প্রকৃত জ্ঞানপর অবস্থা নহে। উহার পর পরাভক্তি বলে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়। ভগবদ্‌ গীতায় এই অবস্থা-ব্যঞ্জক বাক্য যথা,

ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

মুণ্ডকোপনিষদে এই অবস্থা-ব্যঞ্জক বাক্য যথা,

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥

ঈশোপনিষদে এই অবস্থা-ব্যঞ্জক বাক্য যথা,

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

সর্ব্বশেষাবস্থার অর্থাৎ মুক্তির পরিচয়,

মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ ॥

(ভগবদ্গীতা।)

ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

(মুণ্ডকোপনিষদ্।)

পরমং ব্রহ্মবেদব্রহ্মৈব ভবতি।।

(মুণ্ডকোপনিষদ্।)

পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্।)

সিদ্ধ পদার্থের বিরোধী হয়, এমন কোনও বাক্য যদি পাওয়া যায়, তাহা লক্ষণাপর। 'পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই বাক্যের দ্বারা (এবং পূর্ব্বপ্রদর্শিত "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা) জানিতে পারি পরম ব্রহ্ম ও জীব ব্রহ্ম পৃথক্ সামগ্রী। নচেৎ 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' এইরূপ বাক্য উক্ত হইত, অথবা 'পরমং ব্রহ্মবেদ পরমং ব্রহ্মৈব ভবতি' এইরূপ বাক্য থাকিত। 'পরমং সাম্যমুপৈতি' এই বাক্যস্থ 'সাম্য' পদও ভেদ-সাধক। ইহাদের সহিত নিম্নলিখিত মুক্তি-বোধক শ্রুতির একবাক্যতা করিতে হইবে। যথা,

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥

শিষ্য। ইহার অর্থ কিরূপ হইবে?

গুরু। কলা, প্রতিষ্ঠা সকলই নষ্ট হইয়া যায়। শরীরারম্ভক ক্ষিত্যপ্তেজোরূপি-দেবতাগণ তত্তৎপরমাণুতে লীন হন। বিজ্ঞান এবং আত্মগত অপরাপর ধর্ম্ম আত্মায় লীন হয়।

শিষ্য। 'একীভবন্তি' ইহার অর্থ 'বিনষ্টা ভবন্তি' ইহা কিরূপে সিদ্ধ করিলেন?

গুরু। 'এক' এই শব্দের অর্থ সময়ে সময়ে 'একজাতীয়' এইরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা, 'ঐ পাঁচটী ঘটের একই রূপ', 'তোমাদের সকলের একই অবস্থা ঘটিবে' ইত্যাদি। অতএব 'একীভবন্তি' ইহার অর্থ 'একজাতীয়া ভবন্তি' করা অসঙ্গত নহে। এই সাজাত্য লয়-ঘটিত হওয়ায় 'একীভবন্তি' ইহার অর্থ 'বিনষ্টা ভবন্তি' এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে। সিদ্ধ পদার্থসমূহের সহিত একবাক্যতা করিবার জন্য এই লক্ষণা দোষাবহ নহে।

শিষ্য। 'বিজ্ঞানময়' শব্দের অর্থ 'বিজ্ঞান' করিলেন কিরূপে?

গুরু। ঘটাত্মক, পটাত্মক, মঠাত্মক ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায়, 'আত্মা' সংজ্ঞা সকল সামগ্রীকেই প্রদান করা যাইতে পারে। অতএব বিজ্ঞানময় আত্মা শব্দে বিজ্ঞানাত্মক সামগ্রী। জলময় পদার্থ শব্দে জলাত্মক পদার্থই বোধ হইয়া থাকে। শ্রুতিস্থ 'পরে' এই শব্দের দ্বারা জীবাত্মগত অপরাপর ধর্ম্ম পাওয়া যাইতেছে। অথবা, 'বিজ্ঞানময়' এই শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানাত্মক সামগ্রী গ্রহণ করিয়া, 'আত্মাহপরে' এই শব্দের দ্বারা আত্মনিষ্ঠ অপরাপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বলিখিত 'কর্ম্ম' শব্দের দ্বারা 'পাপপুণ্য' বা 'অদৃষ্ট' অর্থ আসিতেছে। মুক্তি হইলে এ সকলই 'অব্যয়ে' অর্থাৎ জীবাত্মায় লীন হয়। কর্ম্মাদি পরম ব্রহ্ম হয় না, লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যবাক্যে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা,

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে॥

পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে অর্থাৎ জীবাত্মা মুক্ত হইলে হৃদয়গ্রন্থি, সংশয়, কর্ম্ম সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বচনের সহিত একবাক্যতা করিবার জন্য পূর্ব্বে 'একীভবন্তি' ইহার অর্থ 'বিনষ্টা ভবন্তি' করা হইয়াছে। কর্ম্মাদি সমুদয় সামগ্রী যদি পরমাত্মা হইয়া যাওয়া শাস্ত্রের আদেশ হইত, তবে 'সর্ব্বে পরাব্যয়ো ভবন্তি' এইরূপ প্রয়োগই থাকিত। 'পরেঽব্যয়ে একীভবন্তি' এরূপ ঘুরাইয়া প্রয়োগ করিতে হইত না। 'পঞ্চবৃক্ষা নৌকা ভবন্তি' 'কাষ্ঠং ভস্ম ভবতি' এইরূপ প্রয়োগই স্বারসিক। 'পঞ্চবৃক্ষা নৌকায়াং একীভবন্তি' 'কাষ্ঠং ভস্মনি একীভবন্তি' এরূপ প্রয়োগ অপ্রচলিত। 'ঘটপটমঠা মৃত্তিকায়াং একীভবন্তি' এরূপ প্রয়োগ যদি সিদ্ধ হয়, তাহা লাক্ষণিক। অতএব যথোচিত লক্ষণা এইরূপ প্রত্যেক স্থলেই করিতে হইবে।

শিষ্য। আপনি পারমার্থিক পদার্থের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছেন। অতএব ইহা কুতর্ক। তর্কের দ্বারা পদার্থ নির্ণয় হয় না। ব্যাসদেব সূত্র করিয়াছেন 'তর্কো'ঽপ্রতিষ্ঠঃ'।

গুরু। এবার রাগিয়াছ। রাগের কথার উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি। তবে এইটুকু বলিতে পারি 'যস্তর্কেণাভিসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ' এই আদেশ যে ব্যাসদেব করিয়াছেন, সে ব্যাসদেব 'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ' এমন কথা লিখিতে পারেন না। যদি তিনিই সত্য সত্য লিখিয়া থাকেন, তবে 'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ' এই সূত্রের মীমাংসা করিয়া দেই শিখিয়া রাখ। 'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'॥ এইরূপ বচন থাকিলেও বেদ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অপ্রামাণিক, স্মৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অপ্রামাণিক, ঋষিমত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অপ্রামাণিক এরূপ অর্থ বুঝিলে চলিবে না। বেদ ভিন্ন ভিন্ন,

স্মৃতি ভিন্ন ভিন্ন, ঋষিমত ভিন্ন ভিন্ন, অতএব যাঁহারা শাস্ত্রার্থ মীমাংসা করিতে অক্ষম, অথচ সাত্ত্বিক তাঁহারা মহাজনের আচরিত নিয়মানুসারেই চলিবেন, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের ইহাই অর্থ করিতে হইবে। 'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ' এই বাক্য সেইরূপ। তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে তর্কের বিবিধ পথ জানা যায়। কুতার্কিকগণ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে সহজেই কুপথে আনিতে পারেন। যেহেতু ঐ সকল অনভিজ্ঞব্যক্তি তর্কের দোষগুণ বিচারে সমর্থ হন না। সেই সকল অনভিজ্ঞব্যক্তি যাহাতে তর্কের মোহে পড়িয়া পথচ্যুত না হন্, এই উদ্দেশ্যে কেবল তাঁহাদেরই জন্য বলা হইয়াছে, 'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ'। তর্কশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনও উক্তি থাকিবে শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্ক পরিহার করানই তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্য। যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদে জানিতে পাই 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।' অর্থাৎ কেবলমাত্র বচনের দ্বারা আত্ম-জ্ঞান হয় না। শ্রুতি দেখাইয়া বৃথা কচাল পাড়িলে আত্ম-জ্ঞান হয় না। কঠোর ব্রত সকল অবলম্বন করিয়া বলহীন হইলেই আত্ম-জ্ঞান হয় না। এমন কি অলিঙ্গ-তপস্যা অর্থাৎ সদনুমান-বিরহিত সন্ন্যাসাদির দ্বারা পর্য্যন্ত আত্ম-জ্ঞান হয় না। শ্রুতির প্রামাণ্য অপেক্ষা সদনুমানের প্রামাণ্য এই স্থানে অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। 'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ' এই ঋষিবাক্যের দ্বারা, 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা, 'যস্তর্কেণাভিসন্ধত্তে' ইত্যাদি ব্যাসবাক্যের দ্বারা তর্কেরই অধিক প্রামাণ্য প্রকটিত হইতেছে। তর্কশাস্ত্রের মীমাংসার সহিত ঐক্য করিয়া উপনিষদ্ অধ্যয়ন না করিলে তাহা অধ্যয়নের মধ্যেই গ্রাহ্য নহে। কারণ ঋষিরা সেইরূপই করিতেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে

প্রমাণ যথা, "তত্রোপনিষদং তাত পরিশেষন্তু পার্থিব। মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাং।" পূর্ণব্রহ্মও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া গুরুর নিকটে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শিক্ষা করেন। ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে প্রমাণ যথা,

সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাং॥
ইত্যাদি।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বেদের ন্যায় অনাদি। জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি করিয়া লোকের উপকারার্থ চারিটী অনাদি শাস্ত্র ব্যক্ত করিলেন। ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ে প্রমাণ যথা,

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবোহস্য দহ্রতঃ॥

আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র তর্কশাস্ত্র কি না, এ বিষয়ে প্রমাণ যথা "আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতৌ তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রয়োঃ।" ইত্যমরঃ। যে চারিটী বিদ্যা ব্রহ্মা ব্যক্ত করিলেন, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তর্ক অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র মুক্তি প্রযোজক। ত্রয়ী অর্থাৎ ঋগ্, যজুঃ, সামবেদ ধর্ম্মপ্রযোজক। বার্ত্তা অর্থাৎ উপাখ্যান (উপনিষদাদি) বৈধকার্য্যে ইচ্ছার দার্ঢ্যের প্রযোজক। দণ্ডনীতি—অর্থবিদ্যা। টীকাকার শ্রীধরস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,

ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিক্রমেণোৎপত্তিমাহ আন্বীক্ষিকীতি।
আন্বীক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষধর্ম্মকামার্থবিদ্যাঃ।
দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ।

টীকাকার বিশ্বনাথ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,

ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিবক্ত্রক্রমেণোৎপত্তিমাহ। আন্বী-ক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষধর্ম্মকামার্থবিদ্যাঃ।

অনাদি সকল বিদ্যার মধ্যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যাই মোক্ষপ্রযোজক। সুতরাং ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। একারণ অদ্যাপি বিদ্বৎ-পরম্পরায় বিদ্বৎসমাজে এই শাস্ত্রের প্রাধান্যই চলিয়া আসিতেছে। আন্বীক্ষিকী ভিন্ন কোনও বিদ্যাই যে মোক্ষপ্রযোজক নহে, তদ্বিষয়ে আরও প্রমাণ যথা, "বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবং।" ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্রই যে মুক্তি প্রযোজক, পূর্ব্বকালে আস্তিক আচার্য্য মাত্রেরই ইহা দৃঢ় ধারণা ছিল। এই কারণেই বোধ হয় এই শাস্ত্রের বিবিধ অংশ গ্রহণ করিয়া গোতম কণাদাদি মহর্ষিগণ এবং মিথিলা বঙ্গদেশ প্রভৃতি প্রাচীন সমাজের সুধী আচার্য্যেরা আমাদের উপকারার্থ উৎকট শ্রম করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষ আপন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার জন্য সকল দর্শনের খণ্ডন-কৌশল প্রদর্শন করাইয়াছেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যে মুক্তিপ্রযোজক একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নৈষধের একাদশ সর্গে প্রমাণ যথা,

উদ্দেশ-পর্ব্বণ্যথ লক্ষণেঽপি
দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ।
আন্বীক্ষিকীং যদ্ দশনদ্বিমালীং
তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ॥
তর্কা রদা যদ্ বদনস্থ তর্ক্যা
বাদেষু শক্তিঃ ক তথান্যথাভূৎ।

পত্রং ক দাতুং গুণশালিপূগং
কবাদতঃ খণ্ডয়িতুং প্রভুস্থং ॥

শিষ্য। তর্কশাস্ত্র যদি প্রকৃতই এরূপ গৌরবের শাস্ত্র হয়, তবে গৌতমসূত্রাদিই মাত্র সেই গৌরব পাইবার অধিকারী। গৌতম-সূত্রাদির আলোচনা দ্বারা পদার্থ-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া উপনিষদাদি ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মমীমাংসা অনায়াসেই তো চলিতে পারে। গঙ্গেশোপাধ্যায়, পক্ষ-ধরমিশ্র, রঘুনাথশিরোমণি, মথুরানাথ, গদাধর প্রভৃতি কোন্ কার্য্যে আসিলেন? ইঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া কালক্ষেপ করা কেন?

গুরু। সমাজে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে যে সব ঘোর মূর্খ আবির্ভূত হইতেছেন, তাঁহাদের আপত্তির ন্যায় এবার তুমি আপত্তি করিয়াছ। গৌতমসূত্রাদিই প্রকৃত শাস্ত্র বটে, কিন্তু অগ্রেই তাহার আলোচনা করিলে তুমি কি কিছু বুঝিতে সক্ষম হইবে? মনে কর সূত্র রহিয়াছে, "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।" ঐ অনুমান প্রভৃতির যে কি তাৎপর্য্য এবং কত চেষ্টায় তাহা সাধন করিতে হয়, তাহা উক্ত আচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থ না অনুশীলন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝা যায় না। মাত্র গৌতমসূত্রাদি পড়িয়া অনুমান, তর্ক, হেত্বাভাসাদির তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা অভিমান রাখেন, আমাদের বিশ্বাস এই, তাঁহারা ("অনু" পূর্ব্বক "মা" ধাতু "টন" করিয়া "অনুমান" পদ সিদ্ধ, "তর্ক" ধাতু হইতে "তর্ক" পদ নিষ্পন্ন, "হেতোরাভাসঃ" এই অর্থে "হেত্বাভাসঃ", এইরূপে) দর্শনশাস্ত্রের পদ সাধিতে শিখিয়াছেন মাত্র। ফল কথা এই, প্রকৃতের অদ্বিতীয় উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই নৈয়ায়িক সমাজে প্রাগুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতির পুস্তক-সমূহের এত গৌরব। বৈয়াকরণও আছে, ব্যাকরণও আছে, সাহিত্যও

আছে, শব্দও আছে. তথাপি শক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা প্রভৃতির এত গৌরব অধ্যাপকেরা কেন করেন বল দেখি।

শিষ্য। ইহাঁদের গ্রন্থ যখন হয় নাই, তখন কি কেহ তবে ন্যায়-শাস্ত্রে পণ্ডিত হইত না?

গুরু। হইবে না কেন? গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বে ঐ সকল উপদেশ অতিসূক্ষ্মদর্শি-গুরুর মুখে থাকিত। বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণ গুরু-সকাশে ঐ সকল উপদেশ শিক্ষা করিয়া অভিজ্ঞ হইত। তখন লোকের এমন স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি ছিল যে, ঐ সকল উপদেশ গুরুর নিকট মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া ধারণা করিতে পারিত। কিন্তু কালক্রমে সে শক্তি লোপ পাইতে থাকায় পরবর্ত্তিগণের জন্য প্রাগুক্ত মহাত্মারা বহু আয়াসে সকল সার-কথা সংগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহারা দোষী? অথবা তাঁহাদের গ্রন্থ দুষ্ট?

শিষ্য। যাহাই বলুন, ন্যায়শাস্ত্রে একটী দোষ ঘটিয়াছে। পদার্থ-উপপত্তির জন্য পরমাণ্বাদি সহকারী কল্পাইলে ব্রহ্মের ক্ষমতাকে লঘু করা হয়। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত ঘটে। ন্যায় শাস্ত্রের মীমাংসায় সেই দোষটী ঘটিয়াছে।

গুরু। এইবার বিষম দোষারোপ করা হইয়াছে। তুমিও প্রতি পদার্থের উপপত্তির জন্য ব্রহ্মাতিরিক্ত অগণন অনাদি ও সাদি অবিদ্যা কল্পাইতেছ, তাহাতে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত করা হইতেছে না কি? ফলে, আমি পরমাণ্বাদি কল্পাইতেছি বলিয়া ব্রহ্মকে কিছুমাত্র লঘু করা হয় নাই জানিবে। অনাদি অবিনশ্বর রাজার অনাদি অবিনশ্বর সম্পত্তি কল্পাইলে তাঁহার রাজত্বার ব্যাঘাত করা হয় না।

কোন্ রাজার অক্ষয়-সম্পত্তি তাঁহার লঘুতার হেতু হইয়াছে। ইহাতে যদি ব্রহ্ম লঘু হন, তোমার মীমাংসায়ও লঘু। শ্রুতিই ব্রহ্মকে লঘু করিয়াছেন বলিতে হইবে।

শিষ্য। এ বিষয় যাহাই হৌক, ন্যায়শাস্ত্রে নির্ণীত মুক্তি একটা হাসির বস্তু। সত্যই উক্ত হইয়াছে 'বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন।' মুক্তজীব যদি ব্রহ্মই না হইল, অর্থাৎ শরীর-পরিগ্রহ বিরহিত হইয়া সুখ দুঃখাদি অনিত্য সামগ্রী বিবর্জ্জিত জীবই রহিয়া গেল, তবে সে মুক্তিতে লোকের প্রলোভন হইবে কেন ?

গুরু। বিরোধী সম্প্রদায়ের উপহাসে মহর্ষি-কণাদাদির কিছুই আসে যায় না। তুমি নির্গুণ ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশ-বোধস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ বলিতেছ বলিয়া ব্রহ্ম হইবার জন্যই বুঝি লোকের লালাশয় জলপ্লাবিত হইবে স্থির করিয়াছ? স্বপ্রকাশবোধের আশ্রয় হইলে বরং কিছু লোভ দাঁড়াইত, বোধের স্বরূপ হইলে লাভ কি? 'বোধো বেত্তি' এরূপ প্রয়োগ কখনও হয় না জানিবে। আনন্দ-ভোগকে যদি তুমি লোভনীয় ভাবিয়া থাক, তবে আনন্দের আশ্রয় হওয়া আবশ্যক। আনন্দের স্বরূপ হইলে তোমার সে লোভ পূর্ণ হইবে না। ক্ষীর, ছানা, মাখমের উপভোগই প্রলোভনের বিষয়। নিজে ক্ষীর, ছানা, মাখম হওয়া প্রলোভনের বিষয় নহে। অতএব এইরূপ মুক্তি তোমার আমার ন্যায় অবিবেকি-ব্যক্তির প্রলোভনের সামগ্রী না হইলেও বিবেকী ব্যক্তির বিশেষ বাঞ্ছনীয়। মুক্তি যে জ্ঞানের স্বরূপ বা আনন্দের স্বরূপ বেদের উপনিবন্ধা অর্থাৎ বেদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা মহর্ষিরা কুত্রাপি একথা বলেন নাই। ঐ ব্যাখ্যা আধুনিক কল্পনা মাত্র। বিবেকী ব্যক্তিরা বুঝিয়া থাকেন "অস্মিন্ সংসার-কান্তারে কিয়ন্তি

দুঃখ-দুর্দ্দিনানি, কিয়ন্তী বা সুখ-খদ্যোতিকা।” তাঁহারা জানেন, সংসার একটী অরণ্যবিশেষ। তাহা আবার দুঃখ-দুর্দ্দিন নিবন্ধন প্রায়শঃই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এক আধটী সুখ-খদ্যোতিকা যাহা আছে, তাহা সেই অন্ধকারকে অন্তরিত করিতে পারে না। সুখ দুঃখকে চিরকালের জন্য অন্তরিত করিতে পারে না, কিন্তু মুক্তি তাহা পারে। একারণ মুক্তি বিবেকি-ব্যক্তির পরম প্রলোভনের সামগ্রী। স্ত্রী-পুত্রাদির নিধনজন্য লোকে অসহ্য ক্লেশ পাইলে, কখনও কখনও আত্মহত্যা করিয়া থাকে। ক্লেশ-নিবারণই তখন একমাত্র লক্ষ্য থাকে। অতএব ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ক্লেশ-নিবারণ যে প্রলোভনের সামগ্রী নহে, এমন বিবেচনা করিও না। এতদ্ব্যতীত, দুঃখাভাব যে একটী শান্তিকর সামগ্রী নহে, এমনও বিবেচনা করা উচিত নহে। ভারাক্রান্ত ব্যক্তির ভার নাশ হইলে বলিয়া থাকে “আঃ বাঁচিলাম।” ইহা কি শান্তির পরিচায়ক নহে? ‘সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ’ এই বাক্যে ভগবান্‌ও বুঝাইয়াছেন, অদৃষ্টের ও আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি জীবের একান্ত ইষ্ট সামগ্রী। পুরীততি নাড়ীতে মনঃসংযোগ নিবন্ধন যে সময় জীব গভীর নিদ্রা যায়, সেই সময় তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না, দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন কিছুই হয় না, সুখ দুঃখ থাকে না, ইহা নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই অবস্থাটী এতই শান্তিকর যে, সেই শান্তি অনুমান করিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি কখনও কখনও বলিয়া থাকেন “কি সুখেই নিদ্রা যাইতেছিলাম।” শ্রুতিও রহিয়াছে “সুখমহমস্বাপ্সম্।” এই ‘সুখ’ শব্দ অবশ্য লাক্ষণিক, কিন্তু শান্তির পরিচায়ক নহে কি? মুক্ত পুরুষের সেই শান্তি নিরবচ্ছিন্ন থাকিবে। একারণ ভগবান্‌ও সেই শান্তিকে লাক্ষণিক “সুখ” রূপে ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যায়। যথা,

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং॥

এই বাক্যে আমরা জানিতে পারি, আমরা যাহাকে সুখ-সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, তাহা সুখের মধ্যেই নহে। মুক্তির পরে যাহা ঘটিবে তাহাই সুখ-পরিভাষা পাইবার যোগ্য, অর্থাৎ তাহাই চিরশান্তিকর সামগ্রী *। যে মীমাংসা করা হইল, ইহাতে যদি লোভ পরিতৃপ্ত না হয়, তবে তোমার নির্ণীত মুক্তিতেও লোভ মিটিবে না। কারণ তোমার মতেও দুঃখাভাবই চরম ইষ্ট দাঁড়াইতেছে। শুধু তোমার মতে কেন, বহু-মতেই ঐরূপ সিদ্ধ। কোন্ কোন্ দার্শনিক-সম্প্রদায় কোন্ কোন্ প্রকার মুক্তি নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক কারিকা মূল 'অদ্বৈত-বাদখণ্ডন' গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বিশেষ-মীমাংসা ঐ মূলগ্রন্থেই দ্রষ্টব্য।

দুঃখস্যাত্যন্তনির্মুক্তিং গৌতমো মুক্তিমুক্তবান্।
নিবৃত্তির্দুরদৃষ্টানাং জগৌ কশ্চন তার্কিকঃ॥ ১ ॥

---

*। কেহ কেহ বলেন, যে নিদ্রায় পুরীততি নাড়ীতে মনঃসংযোগ না হয়, সুখকর স্বপ্ন প্রভৃতি নিবন্ধন প্রীতির উদয় হয়, সেই নিদ্রা তাৎপর্য্যেই বলা হইয়াছে <u>সুখমহমস্বাপ্সাম্</u>। পুরীততিত মনঃসংযোগ হইলে সে অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রভেদ আছে। সুষুপ্তি কালে সুখ দুঃখ জ্ঞান সম্ভবে না। <u>সুখমহমস্বাপ্সাম্</u> এরূপ না থাকিয়া যদি থাকিত "সুখমহং স্বপ্নাপ্সাম্" তাহা হইলেই শ্রুতিটী বিরোধী হইত এবং লক্ষণারও আবশ্যক হইত। "জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাবস্থাসু" ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায়, কেবল "স্বপ্" ধাতুর দ্বারা সুষুপ্তি বুঝায় না। অতএব, <u>ন কিঞ্চিদবেদিষম্</u> ইহার অর্থ "(সেই নিদ্রাকালে) দুঃখকর কোনও বিষয়েরই আমার জ্ঞান ছিল না।" এ মীমাংসাও বিবেচ্য।

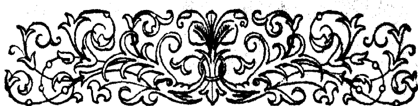
নিত্যানন্দস্য সম্ভোগো মুক্তির্ভট্টস্য সম্মতা।
মীমাংসকোক্তা দুঃখানাং প্রাগভাবানিবর্ত্তনং ॥ ২ ॥
একদণ্ডিমতে মুক্তিরবিদ্যায়া বিমোচনং।
লিঙ্গবিগ্রহবিধ্বংসঃ সা নির্দ্দিষ্টা ত্রিদণ্ডিনা ॥ ৩ ॥
উপরাগস্য মহতো বিরতিঃ সাংখ্য-সম্মতা।
যতস্তদুপরাগস্তু কূটস্থস্যৈব বন্ধনং ॥ ৪॥

শিষ্য। যে শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ-সাহায্যে বৌদ্ধ নিরাস করিয়াছিলেন, সেই শঙ্করাচার্য্য কি তবে ক্ষুদ্র ব্যক্তি? এবং সেই অদ্বৈতবাদ কি তবে শ্রুতি সম্মত নহে?

গুরু। শঙ্করাচার্য্য ক্ষুদ্র হউন আর বড়ই হৌন সে কথার উত্থাপন করা কেন? তবে, এক মতের দ্বারা অন্যমত নিরাকরণ করিলেই যে তাহা শ্রুতি সম্মত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। উদয়নাচার্য্যাদি নৈয়ায়িকেরাই মাত্র, তর্কশাস্ত্রের দ্বারা বৌদ্ধ-নিরাস করিয়াছেন। বৌদ্ধাধিকারে এ বিষয়ের প্রকৃষ্টপ্রমাণ। "ঐশ্বর্য্য মদমত্তো হি মামনাদৃত্য তিষ্ঠসি। আগতে চ পুনর্বৌদ্ধে মদধীনা তব স্থিতিঃ।" এই সকল কবিতা এবং এতদ্-ঘটিত যত কিছু ইতিবৃত্ত অদ্যাপি অধ্যাপক-সমাজে জাজ্বল্যমান থাকিয়া উদয়নাচার্য্যের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। যাগ যজ্ঞ কেন মানিতে হইবে কুসুমাঞ্জলিতে তাহার প্রকৃষ্ট তর্কানুমান প্রদর্শিত। শঙ্করাচার্য্য তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। শ্রুতিই তাঁহার বল। বৌদ্ধেরা যাগ যজ্ঞ বা তদ্-ঘটিত শ্রুতির প্রামাণ্যই স্বীকার করে না। অতএব বৌদ্ধ-বিদ্বদ্গণের নিরাস তিনি কতদূর পরিমাণে করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও ভাবিবার

বস্তু। এতদ্ব্যতীত নৈয়ায়িকগণই বৌদ্ধনিরাসক-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের সেরূপ পুস্তক একখানিও নাই। ফলকথা এই, শাস্ত্র-মীমাংসা কালে লৌকিক-কথার অবতারণা দ্বারা নিগ্রহ করা বিদ্বদ্‌গণের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যেই নহে।





ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ব্যাসসূত্র। ব্যাসসূত্রে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন। ঋষিগণের মীমাংসা পরস্পরের সহিত ঐক্য হইলে প্রামাণ্যের আধিক্য। অদ্বৈতবাদিগণের যাবতীয় অনুমান দুষিবার দার্শনিক-কৌশল প্রদর্শন।

অদ্বৈতবাদী প্রাচীন আচার্য্যগণ যে সকল প্রমাণ আপনাদের মতের সাধকরূপে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, প্রায় তৎসমুদয়েরই ব্যাখ্যা আমরা প্রদর্শন করাইলাম। অদ্বৈতবাদীদিগের স্ব-রচিত বলিয়া যে সকল বচন অনুমিত হয়, অথবা অপ্রামাণিক বিধায় যে সকল বচন স্বয়ং অদ্বৈতপক্ষীয় আচার্য্যেরাও কুত্রাপি উদ্ধৃত করিতে সাহস করেন নাই, আমরাও তাহা ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ কিছু আবশ্যক বোধ করিলাম না। কারণ, কি নিয়ম অবলম্বনে কোন্ জাতীয় শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে, সে বিষয় আমরা বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি। তবে অদ্বৈতবাদী প্রামাণিক আচার্য্যেরা ব্যাসসূত্রেরও অনেকসূত্রের দ্বারা পর-মত খণ্ডন পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। সেই সূত্রগুলির দ্বারা পরমত নিরাকৃত হয় অথবা অদ্বৈতবাদ নিরাকৃত হয়, তাহা সুপ্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে তর্কশোধিত পথে ব্যাস-কৃত সেই সকল সূত্রেরও ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইল।

উদয়নাচার্য্যাদি যে সম্প্রদায়ের পরিপোষ্টা, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত, মহর্ষিগণ-কৃত মীমাংসায় তাঁহার প্রবল বিশ্বাস, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রুতি সমন্বয়কালে সর্ব্বপ্রথমেই লিখিয়াছেন,

কণাদস্যাক্ষপাদস্য যদজ্ঞানমসম্মতং।
মহর্ষিমতবিশ্বাসাৎ কা ভীতিস্তস্য খণ্ডনে ॥

অর্থাৎ যে প্রকার অবিদ্যা গোতম কণাদ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই, মহর্ষিমতে বিশ্বাস থাকায় আমি তাহা খণ্ডন করিতেছি। অতএব আমার ভয় কি ?

ব্রহ্মসূত্রে অদ্বৈতবাদখণ্ডন।

(২য় অধ্যায়। ১ম পাদ হইতে।)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষ-দোষপ্রসঙ্গঃ। তর্কস্থির করিয়া ব্যাপ্তি-নিশ্চয় পূর্ব্বক অনুমান করা দুরূহ। অন্য উপায়ে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-সহচার যোগে যদি অনুমান করা যায়, তবে সে অনুমানের প্রামাণ্য আছে কি না? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন, "না তাহার প্রামাণ্য নাই। সে ভাবে অনুমান করিলেও দোষের মুক্তি হয় না। অর্থাৎ শ্রুত্যাদির স্থূল মীমাংসার দ্বারা যেমন নির্দ্দোষ সিদ্ধান্ত হয় না, ঐ ভাবের অনুমানেও সেইরূপ নির্দ্দোষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।" ব্যাসদেবের এই সূত্রের দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি, তর্ক-সাহায্যে ব্যাপ্তি স্থির না করিয়া, কেবল দৃষ্টান্ত-সহচার যোগে অনুমান করিতে যাওয়ায় অদ্বৈতবাদ প্রধানবাদ প্রভৃতির অনুমানের প্রামাণ্য

নাই। ঐ সকল দর্শনকার বলিতে পারেন, "সূত্রটীর দ্বারা তাঁহাদের অনুমান নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু তর্ক-সহযোগে যাঁহারা অনুমান করেন তাঁহারাই কি রক্ষা পাইলেন? সূত্রস্থ 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই অংশের দ্বারা তাঁহাদেরও অনুমানের অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইল।" আমরা বলি, এই আপত্তি আপত্তিই নহে। সকল অনুমানকে অপ্রামাণিক বলা যদি ব্যাসের অভিপ্রায় হইত, তবে সূত্রের পূর্ব্বাংশ না দিয়া 'অনু-মেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষদোষপ্রসঙ্গঃ' এই অংশ টুকু দিলেই চলিত। তর্কসাহায্য না লইয়া যাঁহারা অন্যপ্রকারে অনুমান করিয়া-ছেন 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়ং' ইহা তাঁহাদেরই পূর্ব্বপক্ষ। 'তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ' ইহা উত্তরপক্ষের কথা নহে। কারণ 'যস্তর্কেণাভিসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ' ইহা যে ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 'তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ' এ অংশ সে ব্যাসদেবের মীমাংসা হইতে পারে না। তর্ক ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে সর্ব্বাংশের সামঞ্জস্য হইতে পারে না, ইহা আমরা পূর্ব্বে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। এবং সূত্রেও অন্য উপায়ে মীমাংসা করিতে করিতে ব্যাসদেব "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দকোপো বা" এবং "দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠা এবং অনুমানের প্রামাণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা অগ্রে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব তর্কপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অনুমান করিতে না পারিলে সে অনুমানের প্রামাণ্য নাই; তর্কপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই মাত্র অনুমানের প্রামাণ্য আছে ইহাই বর্ত্তমান সূত্রের মীমাংসা।

এতেন শিষ্টাপরিগৃহীতা অপি ব্যাখ্যাতা। এই সূত্রটীর দ্বারা শিষ্টের অপরিগৃহীত বস্তু নিরাকরণ করা হইয়াছে।

এইবার ব্রহ্মের সহিত ভেদ-সাধক সূত্র করা হইয়াছে, ভোক্ত্রা-

পত্তেরবিভশ্চেৎ। বিষয়ের সহিত ব্রহ্মের অভেদ বিদ্যমান ইহা যদি বল তবে ভোগ্যের ভোক্তৃত্বাপত্তি। ভেদ নির্দ্ধারণের জন্য পরেই স্বতন্ত্র সূত্র করিতেছেন, স্যাল্লোকবৎ। লোকবৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পরিমাণ-পার্থক্যাদি বিভিন্ন-ধর্ম্ম নিবন্ধন সর্ষপ-পর্ব্বতাদির ভেদ তুমি লোকে প্রত্যক্ষ করিতেছ, অলৌকিক পদার্থে অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মেও সেইরূপ পরিমাণ পার্থক্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মনিবন্ধন ভেদ আছে জানিবে।

লোকব্যবহারও নানারূপ আছে, শ্রুতিও নানারূপ আছে। কিরূপ শ্রুতির দ্বারা ভেদাভেদ নিশ্চয় করিতে হইবে তাহাও এক্ষণে বলিতেছেন, তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। অমুক-বস্তু অমুকারম্ভক, এইরূপ ব্যবহার যেখানে পাইবে, সেখানে অভেদ কল্পনা করিবে। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং' এইরূপ শব্দ থাকায় ঘটাদিতে মৃত্তিকার অভেদ নিশ্চয় করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে 'তদৈক্ষত' 'তদসৃজত' ইত্যাদি। সকল বস্তু যে ব্রহ্মারম্ভক এরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। এ কারণ ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ নাই। দৃষ্টান্তে 'আরম্ভণ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া দার্ষ্টান্তে যাহাতে অভেদ কল্পিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সূত্রে ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন 'আরম্ভণ' শব্দের ব্যবহার দেখিয়া অভেদ নিশ্চয় করিবে।

যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। ইত্যাদি শ্রুতি দৃষ্টেও ব্রহ্মকে উপাদান কারণরূপে স্থির করা উচিত হয় না। উপাদান কারণের ন্যায় নিমিত্ত কারণেও পঞ্চমী প্রয়োগ হইতে পারে। যথা, "ধর্ম্মাদুৎপদ্যতে সুখং" এবং "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে" ইত্যাদি। বিশেষতঃ উক্ত শ্রুতি যে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তার পরি-

চায়ক, অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্ম-পর তাহা পরবর্ত্তী অংশসমূহ পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায়। যথা "যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি। ব্যাস-সূত্রেও "অথাতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে উপক্রম করিয়া পরে সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যথা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রহ্ম উপাদান বিধায় কারণ ইহা কুত্রাপি দেখা যায় না। অতএব ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ নির্দ্ধারণ করা উচিত নহে। এই সকল কারণেই ব্যাসদেব লিখিয়াছেন "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদি।

অভেদ স্থির করিবার উপায়ান্তরও লিখিত হইতেছে. ভাবে চোপলব্ধেঃ। সত্ত্বাচ্চাবরস্য। যে দ্রব্যের সত্তা পরিলক্ষিত হইলে যে উপাদানের সত্তা নিয়তই পরিলক্ষিত হয়. সেই দ্রব্যেও. সেই উপাদানের অভেদ বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। এ কারণ, ঘটে ও কুলালে, ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ নাই। কিন্তু ঘটে মৃত্তিকার অভেদ বিদ্যমান।

জগৎ ব্রহ্মোপাদানক নহে ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, উপাদান বিধায় সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও সামগ্রী থাকা উচিত। নচেৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। উপাদান-বিধায় বা কর্ত্তৃ-বিধায় কোনও সামগ্রী ছিল কি না কে মীমাংসা করে? কারণ শ্রুতি বলিতেছেন 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ'। ভ্রামক অর্থ এই. সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, শূন্যমাত্র ছিল। ব্যাসদেব বলিতেছেন, ও কিরূপ শ্রুতি-মীমাংসা হইল? অসদ্ব্যপদেশান্নেতি-চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ। অসৎ-ব্যপদেশ থাকিলেই শূন্য-বাদ সৃষ্টি করিতে হইবে না। বাক্য-শেষ অর্থাৎ 'ততো বৈ সদজায়ত, 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' এই সকল অংশ অনুশীলন করিলে জানা যায়; সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অন্য ধর্ম্ম পুরস্কারে' 'অসৎ' থাকে। অন্য ধর্ম্ম কিরূপ? 'অসৎ' শব্দের অর্থ সৎ ভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন। অতএব পরমাণ্বাদি

পাওয়া গেল। সুতরাং "অব্যক্তত্বাদি-ধর্ম্মান্তর-রূপে" ভূতের অবস্থান সৃষ্টির পূর্ব্বেও থাকে। ভগবদ্গীতায়ও প্রমাণ যথা, 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।' এ বিষয়ের বিশেষ বিচার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

উপাদান-বিধায় পরমাণ্বাদি ছিল, ইহা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু কর্ত্তৃবিধায় ব্রহ্ম ছিলেন ইহার সংস্থাপন হইল কই? এই আশয়ে ব্যাসদেব বলিতেছেন, যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। যুক্তিও আছে, অন্য শ্রুতিও আছে।

বিভিন্ন পদার্থ সিদ্ধ হইল। কোন্ স্থলে অভেদ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাহাও সামান্যাকারে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়া অভেদ বুঝান এখনও হয় নাই। তাই ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন, পটবচ্চ। অর্থাৎ সূত্র ও পটের দৃষ্টান্তে অভেদ স্থির করিতে হয়। ব্যাসদেবের এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কার্য্য-কটে অভেদ বিদ্যমান। কিন্তু ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ স্থির করিতে পারা যায় না।

অদ্বৈতবাদি-পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থিত হইতেছে, ভেদ-ব্যবহারের উপপত্তির জন্য ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিব কেন? উপাধিভেদে ব্রহ্মেই লাঘবতঃ ভেদ স্বীকার করিব। ইহাতে ব্যাসদেব বলিতেছেন, ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মেই উপাধিবশে ভেদ স্বীকার করিলে, বলিতে হইবে ব্রহ্ম সুখ-দুঃখ-নরকাদি-সৃষ্টির দ্বারা আপনারই অহিত করিয়াছেন। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদ সিদ্ধি এই সূত্রের দ্বারা হইল।

এই দোষ দিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ হইল না। সে কারণ দোষান্তর দিতেছেন, অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ। অশ্মবচ্চা-

স্বুপপত্তেঃ। অর্থাৎ বিশেষভাবে ভেদ-নির্দ্দেশ আছে। প্রস্তরকে বিভিন্ন ভাবে গঠিত করিলে, তাহাতে প্রস্তর-ভেদ সংস্থাপন করা চলে না।

'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতির উপসংহার দৃষ্টে আমরা স্থির করিয়া থাকি, কি ঘট পটাদি লৌকিক পদার্থ, কি শিবদুর্গাদি ব্রহ্ম পদার্থ সমুদয়ই পরমাণু-মূলক ও ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক। কিন্তু, উপসংহারে ব্রহ্মের হস্তপদাদি করণের সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। অদ্বৈতবাদী আপত্তি করিতে পারেন, পরমাণু যোজিত হয় কিরূপে? অর্থাৎ উপসংহার দৃষ্টি করিলে ইহাই স্থির করা উচিত যে, ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক সৃষ্টি নির্ব্বাহ পায় না। এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা ব্যাসদেব এই ভাবে করিতেছেন, উপসংহারান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবৎ। অর্থাৎ উপসংহার দৃষ্টে স্থির করিও না যে সৃষ্টি অসম্ভব। দুগ্ধ দধি-হিমানীরূপে পরিণত হইবার কালে তৈজস পরমাণ্বাদি ঈশ্বরেচ্ছাধীন আপনা আপনি যোজিত হয়। হস্তপদের অপেক্ষা করে না।

এই দৃষ্টান্তে ব্যাসদেবের পরিতোষ না হওয়ায়, অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন, দেবাদিবদপি লোকে। দেবতারা ইচ্ছা করিলেই লৌকিক বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে উপাদান যোজিত হয়, হস্তপদাদি করণের যেমন অপেক্ষা থাকে না, ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেইরূপই জানিবে।

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া মাত্র লৌকিক নিয়মে এতক্ষণ বাদীর আপত্তি খণ্ডন করা হইল। এইবার তর্কসিদ্ধ দোষ প্রদর্শন করান হইতেছে, কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দকোপো বা। অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিলে তাঁহাতে রূপ, রস, গন্ধাদির আপত্তি। অথবা ব্রহ্মোপাদানক দ্রব্যের নিরবয়বত্ব

আপত্তি। প্রথম আপত্তির তর্কের আকার, "(রূপহীনং) ব্রহ্ম যদি রূপবদারম্ভকং স্যাৎ তদা রূপহীনং ন স্যাৎ। (রসহীনং) ব্রহ্ম যদি রসবদারম্ভকং স্যাৎ তদা রসহীনং ন স্যাৎ। ইত্যাদি।" দৃষ্টান্ত, জল মৃত্তিকাদি। দ্বিতীয় আপত্তির তর্কের আকার, "যদি ঘটাদিকং সর্ব্বং (সাবয়বং) দ্রব্যং একমাত্রোপাদানকং স্যাৎ তদা সাবয়বং ন স্যাৎ। দৃষ্টান্তঃ, ঘটাদীনাং রূপরসাদয়ঃ, আকাশস্য শব্দাঃ, জীবানং সুখ-দুঃখাদয়ঃ। ইত্যাদি।"

ভেদ সাধনের জন্য তর্কসম্মত দোষ অদ্বৈতবাদিগণের মীমাংসার উপর ব্যাসদেব অর্পণ করিলেন। এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতেছে ঐ তর্ক সৎতর্ক হইয়াছে বলিল কে? ব্যবহার নাই, শ্রুতি নাই, এমন বিষয়ে তর্ক দেখাইলেও কি তাহাকে সৎতর্ক বলিতে হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন, শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ। ভেদ-সংস্থাপনে যে তর্কসিদ্ধ দোষ প্রদর্শন করাইলাম, তদ্বিষয়ে শ্রুতিমূলক ব্যবহার আছে। তাৎপর্য্য এই, শ্রুতি নানাবিধ। ব্যব-হারও নানাবিধ। এ ক্ষেত্রে শ্রুত্যনুকূল তর্ক যে পক্ষে পাওয়া যাইবে, সেই পক্ষই প্রকৃত শ্রুত্যর্থ অবধারণ করিতে পারিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রুত্যনুকূল তর্ক, কুতর্ক হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের পুস্তকগুলি লইয়া ন্যায়পক্ষে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য কি? সে গুলির অদ্বৈতপক্ষে যেমন ব্যাখ্যা রহিয়াছে; ন্যায় পক্ষেও সেইরূপ একটা ব্যাখ্যা থাকুক, ইহা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উদ্দেশ্য নহে। অদ্বৈত-ব্যাখ্যায় পুস্তকগুলির কদর্থ করা হইয়াছে কি না এবং দ্বৈতব্যাখ্যায় প্রত্যেক স্থানে কত স্বরস আছে তাহাই অভিজ্ঞগণের নিকট প্রদর্শন করান ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাসসূত্রের যে অংশের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইল, অদ্বৈতবাদীরা কি তাহার ব্যাখ্যা

করেন নাই? করিয়াছেন সত্য। সূত্রগ্রন্থ সমূহ এতই জটিল-ভাবে লিখিত থাকে যে, পূর্ব্বাপর দুই চারি পৃষ্ঠা করিয়া ভাব পূরণ না করিলে তাহাদের ব্যাখ্যা হয় না। কাযেই শুধু অদ্বৈতবাদ-সমর্থন কেন, ব্যাসসূত্রের অনেক সূত্র লইয়া চিকিৎসা-বিদ্যা, অস্ত্র-বিদ্যা, খগোল-বিদ্যা প্রভৃতিরও সমর্থন করা যাইতে পারে। এ কারণ সূত্রাবলম্বনে পদার্থ নির্ণয় করিতে হইলে, গভীর অনুভব আবশ্যক। ন্যায়রত্ন মহাশয় কিরূপ অনুভবের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত সূত্রগুলির ন্যায়পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিচক্ষণগণের চিন্তা করিবার বস্তু।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, ভাব-পূরণ করিয়া ব্যাখ্যা করা চলে বলিয়াই অদ্বৈতবাদীরা অনেক সূত্র স্বপক্ষে টানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু যে যে সূত্রে ভাব-পূরণ করিয়াও নিস্তার পাইবার উপায় নাই, অদ্বৈতবাদিগণের হস্তে সেই সূত্রগুলির দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। 'কৃৎস্ন প্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দ কোপো বা' এই সূত্রের দ্বারা ব্যাসদেব অদ্বৈতবাদে তর্ক-সিদ্ধ দোষ অর্পণ করিয়াছেন। মস্তকের উপর বজ্রলেপবৎ দোষ পৌছিয়াছে বলিয়া, শঙ্করাচার্য্যাদি ঐ সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্ররূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সূত্রটী কি অপরাধ করিয়াছে বুঝি না। ঐ সূত্রটীতে প্রথমান্ত এবং পরবর্ত্তী সূত্রে পঞ্চম্যন্ত প্রয়োগ দেখিয়া কি এই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে? সেরূপ হইলে, অবিমোক্ষদোষপ্রসঙ্গঃ, তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ, অশ্মবচ্চানুপপত্তিঃ, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ইত্যাদি সহস্র সহস্র সূত্রের সেরূপ দুর্গতি না করা হইল কেন? ফলে, সাধ্য হেতুর স্থলে প্রথমান্ত ও পঞ্চম্যন্তের প্রয়োগ দোষাবহ নহে। তদ্ব্যতীত, পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা উত্থাপন করিতে হইলে নঞাদির ব্যবহারই দার্শনিকগণ করিয়া থাকেন। তদনুসারে ব্যাসসূত্রে 'চেৎ' 'চেন্ন' 'ইতি ন' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ যে যে স্থলে

পরিদৃষ্ট হয়, সেই সেই অংশকেই পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা বিবেচনা করা উচিত হয়। সম্পূর্ণ বিধি রহিয়াছে, তুমি তাহাতে 'নঙ্' অধ্যাহার করিয়া নিষেধ-রূপে পর্য্যবসান করিতে পার না। সূত্র রহিয়াছে 'অয়ং বিষধরঃ', হেতু দেখাইতেছেন 'হরিত্বাৎ'। 'হরি' শব্দের অর্থ সর্পও হয়, বিষ্ণুও হয়। কিন্তু 'সর্প' অর্থ গ্রহণ করিলে তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয় না। কাযেই 'বিষ্ণু' অর্থ তুমি গ্রহণ করিলে, এবং 'অয়ং বিষধরঃ' এই অংশকে পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা নির্দ্দেশ করতঃ, 'অয়ং বিষধর ইতিচেন্ন' এইরূপ গঠন করিয়া লইলে। ইহা কি শাস্ত্রীয় মীমাংসা? 'দেবদত্তঃ পচতি' এইরূপ প্রয়োগ পাইলে 'ওদনং' এই কর্ম্মের অধ্যাহার করিয়া লইতে পার বটে, কিন্তু 'দেবদত্তঃ পচতি' এই বাক্যকে 'দেবদত্তো ন পচতি' এই বাক্যরূপে পরিণত করিতে পার না। 'আয়ুর্ঘৃতং' এই শ্রুতি পাইলে, "ঘৃত আয়ুঃ নহে", এ মীমাংসা করিবার তোমার উপায় নাই। ঘৃত আয়ুঃ নহে বলিয়া, ঘৃত আয়ুর্জনক এইরূপ লক্ষণা তোমাকে করিতে হইবে। নঙ্ পূরণ করিয়া লইয়া, কুত্রাপি বিধিকে নিষেধরূপে পরিণত করা বৈধ নহে। বিশেষতঃ যদি 'নঙ্' পূরণ না করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তো ঐ কার্য্যটী একেবারেই অকর্ত্তব্য। সূত্র-বাক্য অতীব জটিল। ভাবপূরণ করিতে করিতে ব্যাখ্যা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অতএব উহারই মধ্য হইতে অব্যভিচারী সূত্র যাহা কিছু বাহির করা যাইবে, তদনুকূলেই অন্যান্য সূত্রের ভাব-পূরণ আবশ্যক। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে একটী মাত্র সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। এইরূপ বহুসূত্রেরই ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, ব্যাসসূত্রকে অতি দুর্ব্বল ভাবে অদ্বৈত-পক্ষে টানিয়া লওয়া হইয়াছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় আরো বলেন, ব্যাসদেবও যেমন মহর্ষি, গৌতমও

সেইরূপ মহর্ষি, কণাদও সেইরূপ মহর্ষি। কোনও নূতন মত সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইলে অগত্যা আবশ্যকমতে স্বপক্ষোপযোগি-ব্যাখ্যা প্রদর্শন করাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি ঋষি-মীমাংসা পরস্পরে ঐক্য করিয়া ব্যাখ্যা করিবার উপায় থাকে, প্রামাণিকতা হিসাবে তাহাই সর্ব্বাগ্রে সাধুগণের গ্রাহ্য। বিশেষতঃ গৌতম কণাদের সিদ্ধান্ত যেরূপ তর্কাবলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেরূপ তর্ক আর কোনও সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইতে পারে না।

শ্রুতিসমূহের নানারূপ অর্থ করা যাইতে পারে, বিভিন্ন আর্য্যদর্শন সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ। ব্যাসসূত্রাদি গ্রন্থও সকল দিকে লাগিতে পারে। তবে অব্যভিচারী এমন কি নিয়ম অদ্বৈতবাদী প্রদর্শন করাইতে পারেন, যদ্দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্তে প্রামাণ্য-সংস্থাপন করা যায়? অদ্বৈত-বাদীর অনুমানের প্রামাণ্য নাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাসসূত্রের দ্বারা অগ্রেই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কি ঐ ব্যাখ্যায় ভ্রম করিয়াছেন? না, তিনি ভ্রম করেন নাই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অতীন্দ্রিয়-বিষয় অনুমান করা দূরের কথা, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইহাই সদনু-মান কি না অদ্বৈতবাদীরা তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন না। পর্ব্বতে বহ্নিসংশয়। কাযেই পর্ব্বতটী বাদ রাখিয়া, তাঁহাদিগকে সহচার বা দৃষ্টান্ত খুজিতে হইবে। অর্থাৎ খুজিয়া দেখিতে হইবে, পর্ব্বত ব্যতীত অন্যান্য যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থানে বহ্নি থাকে কি না? এরূপ অন্বেষণ করিলে যদি অনুমান সিদ্ধ হয় বল, তবে তুমি যে সময় ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমিতি করিতে চাহিবে, আমি অন্য সামগ্রী দেখা-ইয়া পর্ব্বতে বহ্ন্যভাব অনুমান করাইয়া দিতে পারিব। আমি বলিব

পর্ব্বতোবহ্ন্যভাবাতিরিক্তপক্ষবৃত্তি-
ধর্ম্মাতিরিক্ত-ধর্ম্মবান্ প্রমেয়ত্বাৎ।

তুমি পর্ব্বতটী বাদ রাখিয়া খুঁজিয়া দেখ, যেখানে যেখানে আমার হেতু বিদ্যমান, সেই সেই স্থানেই আমার সাধ্য আছে। অতএব তুমি বহ্নি অনুমান করিতে গেলে আমি তোমাকে প্রকারান্তরে বহ্ন্যভাবও অনুমান করাইয়া দিতে পারি। অতএব 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইহা সদ্ধেতু কি না, তুমি যখন বুঝাইতে পার না, অতীন্দ্রিয় বিষয় কিরূপে অনুমান করিবে? যে 'পক্ষে' যে 'সাধ্য' তুমি অনুমান করিতে যাইবে, আমি 'প্রমেয়ত্বাদি' হেতু দেখাইয়া সেই 'পক্ষে' তৎসাধ্যাভাবাতিরিক্ত-পক্ষবৃত্তিধর্ম্মাতিরিক্ত-ধর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া তোমার অনুমানে দোষ দিব। এই এক নিয়মে অদ্বৈতবাদ-সমুদ্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত অনুমান আছে, সকল অনুমান দুষ্ট হইয়া যাইবে। এ কারণ লৌকিক নানা উপায়ে ভেদ সিদ্ধ করিয়া ব্যাসদেবও অবশেষে তর্কসিদ্ধ আপত্তিই অদ্বৈতবাদিগণের উপর আরোপ করিয়াছেন, ইহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এখন বোধ হয় দার্শনিকেরা বুঝিলেন পূর্ব্বোক্ত ব্যাসসূত্রগুলির ব্যাখ্যা ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ। অতএব সেই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার অনুকূলে ব্যাসসূত্রের অন্যান্য স্থলেরও কিরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হয়, তাহা পর পর পরিচ্ছেদে কতক প্রদর্শন করান হইতেছে।





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাসসূত্রে পরমাণু। অদ্বৈতবাদ-সাধক যাবতীয় দৃষ্টান্ত দূষিবার কৌশল। ব্যাসসূত্রে আকাশ। ব্যাসসূত্রে জীবাত্মা। ব্যাসসূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ।

ব্যাসসূত্রে পরমাণুসংস্থাপন।

(২য় অধ্যায়। ২য় পাদ হইতে।)

মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং। অর্থাৎ মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ, হ্রস্ব ও পরমাণুযোগে উদ্ভূত। এই সূত্রস্থ 'মহৎ' ও 'দীর্ঘ' শব্দ ভাবে নির্দ্দেশ। যথা ভাষা পরিচ্ছেদে, "কাল খাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ।"

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ। অর্থাৎ কি অদ্বৈতবাদ, কি প্রধানবাদ কোনও মতেই ব্রহ্মে বা প্রধানে আরম্ভক ক্রিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। উত্তরোত্তর মহৎ ও দীর্ঘ দ্রব্য হইতে হইলে উপাদানের ক্রিয়া আবশ্যক। এ কারণ ব্রহ্মে বা প্রধানে তদুপাদানত্বের অভাবই আছে। পরমাণু ও হ্রস্ব দ্রব্যের দ্বারা মহৎ ও দীর্ঘ দ্রব্য

সৃষ্ট হইতেছে, এ সূত্র সঙ্গত। কারণ ইহারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহাদিগের ক্রিয়া সম্ভবে।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ। অর্থাৎ মহৎ বা দীর্ঘ হইতে হইলে উপাদানে উপাদেয় ক্রমশঃ সমবেত হইতে থাকে। 'সমবায়' স্বীকার করায় সে কার্য্যের উপপত্তি হইল।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ। সমবায় ও পরমাণুকে নিত্য বলিয়া জানিবে। তাহার হেতু এই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে 'ন কর্ম্ম-বিভাগাদিতিচেন্নানাদিত্বাৎ' এই সূত্রের দ্বারা সৃষ্টি-ধারার অনাদিত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণু ও সমবায়ের অনাদিত্ব সিদ্ধ। নচেৎ সৃষ্টি সম্ভব পায় না। তদুপরি, এই সূত্রে হেতু দর্শাইলেন 'ভাবাৎ'। ভাব-পদার্থ অনাদি হইলে তাহার নাশও নাই। ন্যায়-শাস্ত্রের ইহাই মীমাংসা।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ। সৃষ্টবস্তুতে কতই বিপর্য্যয় সাধিত হইতেছে। ইহাতে 'না' বলিবার উপায় নাই, যেহেতু আমরা চোখে দেখিতেছি। পরমাণুতে পাকাধীন-রূপরসাদি স্বীকৃত আছে বলিয়াই রূপরসাদির এরূপ বিপর্য্যয় পরিদৃষ্ট হয়।

উভয়থা চ দোষাৎ। প্রধানবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয় মতেই দোষ ঘটিয়া যায়। অর্থাৎ সমবেত দ্রব্যের রূপরসাদির প্রতি সমবায়ি-দ্রব্যের রূপরসাদির কারণতা। ইহার বিচার ন্যায়শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। ঈশ্বর ও প্রধানে রূপরসাদি না থাকায় উভয়মতেই সৃষ্টবস্তুতে রূপরসাদি বিষয়ে বিপর্য্যয় সাধিত হইতে পারে না।

তবে কি প্রধানবাদে বা অদ্বৈতবাদে সৃষ্টবস্তুর উপপত্তি করা হয় না? ব্যাসদেব বলিতেছেন, হইবে না কেন? অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা। যে ভাবে (গন্ধ সহযোগে) উপপত্তি করা হয়,

তাহা বেদপুরাণে কুত্রাপি নাই। এ কারণ তাহা অত্যন্ত অগ্রাহ্য। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, তাহাতে পরস্পরে সৌসাদৃশ্য আছে। নিরাকার বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মে সকলেরই চিরকাল সমান ভ্রম চলিয়াছে, এ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য কি? রজ্জুতে সর্প ভিন্ন মহিষ ভ্রম হয় না জানিবে *।

---

* ভ্রম সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ নিয়ম এই, ধর্ম্ম ধর্ম্মী উভয়েই একেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলে (মানস ভ্রম সম্ভব পায় পাউক, কিন্তু) লৌকিক ভ্রম হইতেই পারে না। আকাশে নীলিমার ভ্রম হইতেছে, এই আপত্তি আপত্তিই নহে। সুদূরবর্ত্তি আলোকাদিতে ঐরূপ নীলিমাদির ভ্রম হইয়া থাকে। স্তনের দুগ্ধের পান লইয়া 'পীতঃ স্তনঃ' এইরূপ ব্যবহার যেমন সিদ্ধ হয়, পুষ্পের গন্ধের ঘ্রাণ লইয়া 'আঘ্রেয়ং পুষ্পং' এইরূপ ব্যবহার যেমন সিদ্ধ হয়, জলে কর্পূরাদির গন্ধ লইয়া যেমন 'সুগন্ধি জলং' এই ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আকাশের পূর্ব্বোক্ত আলোকাদির নীলিমজ্ঞান লইয়া 'নীলং নভঃ' এই ব্যবহার সিদ্ধ হয় মাত্র। 'অহং সুন্দরঃ' এই প্রয়োগ সম্বন্ধেও কিছুই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। 'অহং সুন্দরঃ' 'অহং সুখী' ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায়, দেহ এবং তদধিষ্ঠাতা উভয়ত্রই 'অস্মৎ' শব্দের শক্তি। (শক্তিবাদ গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।) 'সুন্দরোঽহং সুখী' এই জাতীয় প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। 'সমবায়' সম্বন্ধে সুখ যেমন আত্মায় থাকে, 'অবচ্ছেদকত্ব' সম্বন্ধে সুখ সেইরূপ শরীরেও থাকে। 'অস্মৎ' শব্দের শরীরেও 'শক্তি', ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অতএব 'সুন্দরোঽহং সুখী' এরূপ জ্ঞান ভ্রম নহে। বেদ পুরাণেও একত্র ঐরূপ ব্যবহার সকল দৃষ্ট হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে, 'রাঘবং', এই শব্দের উপর 'নীলাম্ভোধরকান্তিকান্তং' সীতাং পশ্যন্তং' এই উভয় বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাসদেবের ধ্যানে, 'ব্যাসং' এই শব্দের উপর 'বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুদ্ধবুদ্ধিং' এবং 'কৃষ্ণত্বিষং' এই উভয় বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠীর ধ্যানে, 'ষষ্ঠীং' এই শব্দের উপর গৌরবর্ণাং' 'সুতপ্রদাং' এই উভয় বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বহুস্থলেই এইরূপ আছে। জ্ঞান, যানকর্তৃত্ব প্রভৃতি সমবায় সম্বন্ধে আত্মার ধর্ম্ম হইলেও 'অবচ্ছেদকত্ব' সম্বন্ধ ঐগুলি

বিশেষতঃ ভ্রমের একটী বিশেষ নিয়ম এই, যে বস্তুতে যে বস্তুর ভ্রম হইবে, সেই উভয় বস্তুই সিদ্ধ থাকা প্রয়োজন। স্বপ্নেরও সেই নিয়ম। অতএব স্বপ্নের সহিতও জাগতিক বস্তুর তুলনা হইতে পারে না। লাল-নীল-সবুজ-বর্ণের মনুষ্য চতুষ্পদ-বিশিষ্ট-ডিম্ব প্রসব করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন তুমি দেখিতে পার। তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ, লাল, নীল, সবুজ, বর্ণ প্রসিদ্ধ, মনুষ্য প্রসিদ্ধ, চতুষ্পদ প্রসিদ্ধ, ডিম্বও প্রসিদ্ধ। কেবল, স্বপ্নে প্রসিদ্ধ সামগ্রীগুলির অযথা সমাবেশ পরিদৃষ্ট

শরীরেরই ধর্ম্ম হওয়ায় একত্র দ্বিবিধ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। 'অবচ্ছেদকত্ব' সম্বন্ধের 'বৃত্তিনিয়ামকতা' বিষয়ে ন্যায়শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে। এই সকল অভ্রান্ত বাক্যকে ভ্রান্তবাক্য বলিতে যাহাদের সাহস হয় হৌক, সকলে কিন্তু সে সাহস না করিতে পারে। অতএব ধর্ম্ম ধর্ম্মী উভয়ে এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলে লৌকিক ভ্রম হইতেই পারে না, ইহা ঐ সম্প্রদায়ের মত। সর্পে রজ্জুভ্রম, আলোকাদিতে নীলিমভ্রম, শঙ্খে পীতভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম, এ সকল (চাক্ষুষ ভ্রম) হওয়ায় আশ্চর্য্য কি? বায়ুতে রূপের অথবা ঘটে গুরুত্বের চাক্ষুষ কখনই সম্ভব পায় না। অতএব ব্রহ্মে ঘট পটাদির চাক্ষুষ কিরূপে সম্ভব পাইবে? ফলকথা, এ সকলও চিন্তা করিবার বিষয়। অধিকতর বিস্ময়কর প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্ত। সূর্য্য এক হইলেও বহু প্রতিবিম্বিত হন সত্য, তা বলিয়া ব্রহ্ম কি সেই দৃষ্টান্তে বহু ভাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন? মৌলিক-বস্তু সাকার হইলে সে ভাবে "বহুত্বের" উপপত্তি করা বরং সম্ভব পায়? কিন্তু নিরাকার-মূল অবলম্বনে সে ভাবে "বহুত্ব" উপপন্ন করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ, এক বস্তু বহুরূপে প্রতিভাত হইলে তাহাদের চাক্ষুষ যদি বা সম্ভব পায়, (শীতোষ্ণাদি বিভিন্ন ধর্ম্মের) স্পর্শ সম্ভাবনা থাকে না। অতএব জলে বা দর্পণে প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ঘট পটাদির বহুত্বের উপপত্তি করা সঙ্গত নহে। এইরূপ বিচারের দ্বারা জানা যায়, কস্মিন্ কালেও যাহা সঙ্গত হইতে পারে না, শ্রুতির বিরুদ্ধ অর্থ করতঃ তাহাই অদ্বৈতবাদিগণ সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এ সকল বিচারও চিন্তনীয়।

হইল। অতএব যদি ঘট, পট, মঠ, তরু, লতা, গিরি, কুঞ্জ, নদী, নির্ঝর প্রভৃতি সম্পূর্ণ অলীক পদার্থ হয়, তবে ব্রহ্মে এ সকল বিষয়ের ভ্রম হইবে কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণের সকল গল্পই এইরূপ। আমরা ঘট-পট-মঠাদি দেখিতেছি, এ সকলই আমাদের ভ্রম হইতেছে। এ ভ্রম অল্পই বলিতে হইবে। কারণ, যদি তপোবলে নারদাদির মত সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারি, তখনই সর্ব্বপ্রকার ভ্রমে আচ্ছন্ন হওয়া যাইবে। শিব দুর্গা বিষ্ণু প্রভৃতি যাহাদিগকেই সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়, সকলেই ঐরূপ সর্ব্বপ্রকার ভ্রমে আচ্ছন্ন। অদ্বৈতবাদিরা 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দের উপপত্তি করেন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার মোহাবৃত হইলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় ইহা কোন্ বেদ পুরাণে লিখিত? শুধু বেদ পুরাণে কেন, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল, প্রভৃতি যে কোনও জাতির যে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে সর্ব্বপ্রকার মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ বলে না, প্রকৃষ্টরূপ অজ্ঞকে প্রাজ্ঞ বলে না। তুমি পরিদৃশ্যমান নিখিল বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ। কিন্তু বেদ পুরাণে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাযেই মিথ্যাকে প্রাতিভাসিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য প্রভৃতি হরেক রকম সংজ্ঞা প্রদান করিয়া বেদ পুরাণের সহিত মিলাইতে চাও। মিথ্যাকে 'সত্য' পরিভাষা, অগ্নিকে 'জল' পরিভাষা তুমি দিতে পার। কিন্তু বেদ তাহা করিবেন কেন? এইরূপ করিয়া কি শ্রুতি-সম্মত বলিয়া গর্ব্ব করা উচিত হয়। সর্পে রজ্জু বুদ্ধি হইলে তাহা ভ্রম বলিয়াই বেদ পুরাণে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেও একটা সত্যের মধ্যে ইহা কোন্ শ্রুতির আদেশ? শ্রুতির পনর আনা তিন পাই অগ্রাহ্য করিয়া, একপাই মাত্র রাখিবার জন্য এত বিবাদ কেন জানি না। বেদ পুরাণে আধ্যাত্মিক কত গল্পই আছে। কিন্তু পদার্থ উপপত্তি করিবার অগ্রে

তুমি যেরূপ গল্প গাহিয়া লও, সেরূপ গল্প কেহ কখনও শোনে নাই। আমরা ঘট পটাদি চোখে দেখিতেছি। কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত হইল যে, দেখা শুনা একটা কথার কথা মাত্র। অমনি পদার্থগুলি বুঝাইবার জন্ত বক্তৃতা আরম্ভ হইল। "ব্রহ্ম চৈতন্তস্বরূপ। বিশেষ কোনও উপাধি-বশে তিনি তোমার নিকট অন্তঃকরণ রূপে প্রতিভাত। চক্ষুঃ কর্ণ পথে সেই অন্তঃকরণ বহির্গত হইয়া ঘট পট মঠাদি বিশেষ বিশেষ উপাধিতে গমন করতঃ তদাকার প্রাপ্ত হইতেছে, অমনি তুমি বলিতেছ 'ঘট দেখিতেছি' 'পট দেখিতেছি' 'মঠ দেখিতেছি'। তোমার অন্তঃকরণ ঘট, পট, মঠ, লাল, নীল, সবুজ, হইয়া যাইতেছে বলিয়া অসম্ভব বিবেচনা করিও না। প্রণালী-পথে জলস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রে গমন করিলে তাহা ক্ষেত্রাকারেই পরিণত হয়।" মানিয়া লও, তোমার অন্তঃকরণ জলস্রোতঃ। মানিয়া লও, তোমার চক্ষুঃ কর্ণ প্রণালী-বিশেষ। তবে আর সিদ্ধান্ত অসঙ্গত রহিল কিরূপে? ঔপন্তাসিক কুহক বিস্তার করিতে হইলে এই সকল অমোঘ হেতু কার্য্যকারী বটে, কিন্তু এই সকল উপায় শ্রুতি-পরিগৃহীত নহে, দার্শনিকতা হিসাবেও ইহাদের স্থান অতি নিম্নে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যের দ্যুতির হ্রাস হয় না, লোকে তাহার মলিনতা অনুভব করে মাত্র। এ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে খাটিবে কেন? মেঘাবরণ নিবন্ধন সূর্য্যমণ্ডলে কি দ্যুতির হ্রাস হয়? বিশেষতঃ ব্রহ্ম নিরবয়ব, অবিদ্যাও নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু কেহ কাহারও আবরক হয় না। দিক্ কাল আকাশ প্রত্যেকেই বিশ্বব্যাপী। কেহ কাহারও আবরক নহে। সর্ব্বত্র বায়ু সত্ত্বেও, আকাশ তাহার আবরক নহে। পুষ্পের সকল অবয়বাবচ্ছেদে রূপ-রস-গন্ধ বিরাজিত। কেহ কাহারও আবরক নহে। সাবয়ব-ঘটিত দৃষ্টান্ত নিরবয়ব বস্তুতে খাটিবে কেন? অবিদ্যার দোহাই দিয়া অসম্ভব

সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া, উদয়নাচার্য্য প্রমুখ নৈয়ায়িক-আচার্য্যগণ অবিদ্যার যেরূপ স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই অন্বেষণ করা উচিত। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা এই সূত্রের দ্বারা ব্যাসদেবও এ ভাবে পদার্থ-উপপত্তির অতি নিন্দা করিয়াছেন।

ব্যাসসূত্রে আকাশ।

(২য় অধ্যায়। ৩য় পাদ হইতে।)

ন বিয়দশ্রুতেঃ। আকাশ জন্য নহে। যেহেতু তাহার শ্রুতি নাই।

অস্তি তু। গৌণ্যসম্ভবাৎ। শ্রুতি আছে বটে, তাহা গৌণার্থপর।

শব্দাচ্চ। নিত্যত্ববোধক শ্রুতি আছে বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম করা হইল। নিত্যত্ব-বোধক শ্রুতি যথা, 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য।' 'স যথানন্তোঽয়মাকাশ এবমনন্ত আত্মা।' সূত্রস্থ 'চ' শব্দের দ্বারা 'যুক্তি' এই অর্থও অধ্যাহার করা যায়। যুক্তি এই, ধ্বংস প্রাগভাব কল্পনে গৌরব। লাঘবতঃ নিত্যত্ব-সিদ্ধি।

ব্যাসসূত্রে জীবাত্মা।

(২য় অধ্যায়। ৩য় পাদ হইতে।)

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। জীবাত্মা ক্ষিত্যাদির মত সাদি নহে। কারণ শ্রুতিতে তাহার উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। শ্রুতি-সমূহের দ্বারা তাহার নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হয়।

জ্ঞোহ্তএব। শ্রুত্যধীনই জানা যায়, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞানের (ব্রহ্মের) স্বরূপ নহে। 'অজ্ঞোহহং' এই ব্যবহার দর্শাইয়া জীবেরে অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম কল্পাইয়াছেন। তাহাও এই সূত্রে 'জ্ঞ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্যাসদেব ছলতঃ খণ্ডন করিয়াছেন।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং। আত্মা নিত্য এ বিষয়ের প্রমাণ এই, শরীর নষ্ট হইতেছে; কিন্তু আত্মার উৎক্রান্তি, স্বর্গগমন, মর্ত্ত্যে আগমন প্রভৃতির শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়।

স্বাত্মনাচোত্তরয়োঃ। বিশ্বব্যাপি আত্মার গতি আগতি কিরূপে সম্ভবে? উত্তর এই, শরীরের গতি আগতি লইয়াই আত্মার গত্যাগতি ব্যবহার। পরকীয় ক্রিয়ায় আত্ম-ক্রিয়া ব্যবহারের প্রমাণ যথা, 'অশ্বেন গচ্ছতি', 'পচামি' ইত্যাদি। 'স্বমেবাত্মা অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা যস্য' এইরূপে 'স্বাত্মা' এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারাই 'শরীর' এই অর্থ আনিতে পারিয়াছি। এই উদ্দেশ্য গ্রন্থের না হইলে 'স্ব' বা 'আত্মা' এই একটী শব্দ প্রয়োগ করিলেই চলিত। 'উত্তরয়োঃ' ইহার অর্থ 'গত্যাগত্যোঃ'। পূর্ব্বসূত্রস্থ 'উৎক্রান্তি' শব্দের অনাবশ্যকতা আমাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদীরাও এই সূত্রে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

নাণুরতচ্ছ্রুতেঃ। জীব অণু নহে। যেহেতু সে ব্যবহার শোনা যায় না। অতঃপর আশঙ্কা উঠিতেছে, লোক-ব্যবহার শোনা না যাউক্, শ্রুতিতে কখনও 'অণু' বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা, 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ' ইত্যাদি। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য পরেই স্বতন্ত্র সূত্রে বলিতেছেন ইতরাধিকারাৎ। অর্থাৎ ইতরকে অধিকার করিয়া আত্মার অণুত্ব ব্যবহার। যেমন ঘটকে অধিকার করিলে ঘটাকাশ, কর্ণ-বিবরকে অধিকার করিলে শ্রুতি, ইত্যাদি ব্যবহার নিবন্ধন আকাশের অল্পত্ব ব্যবহার হইতে পারে, সেইরূপ অণুতর

কীটাদির শরীর অধিকার করিয়া আত্মার অণুত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। আত্মা অণু হইলে সৌভরি, রক্তবীজ প্রভৃতির এককালীন বহু শরীরে যুগপৎ ভোগ হইতে পারিত না। কায়ব্যূহ-ধারণও শাস্ত্রসঙ্গত। সুতরাং আত্মাকে অণু বলিলে চলিবে না। এই ব্যাখ্যা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতানুযায়িনী। অদ্বৈতবাদীরা এই সূত্র ও শ্রুতি অবলম্বন করিয়া জীবের অণুত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সে ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অননুমোদন করেন না। কারণ তাঁহার স্বীয় অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারেও জীবের অণুত্ব সিদ্ধ করা যায়। 'তত্ত্বসারঃ' নামক গ্রন্থে ইতিপূর্ব্বে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঐ 'তত্ত্বসারঃ' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

জীবের ন্যায় 'অংশের' উল্লেখও ব্রহ্মসূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা, অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি। অর্থাৎ নানা ব্রহ্মাংশের বিষয়েও নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণাদিও আছে। ইহাতে বুঝা গেল, লক্ষ্মণ, বলরাম, পরশুরাম, অনন্তদেব প্রভৃতি রাম-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গাদির তুল্য পূর্ণব্রহ্ম নহেন। তাঁহার অংশমাত্র। ইহাঁরা আমাদের তুল্য জীব নহেন, ইহাই এই সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে।

দাশিকতাবাদিত্বমধীয়ত ইত্যেকে। কেহ কেহ বলেন যে, অবতার দশটী মাত্র, ইহা বেদাদিতে অধীত হয়। আমরা কিন্তু প্রমাণ পাইয়াছি "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ।" ব্যাসদেবও পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছেন "অংশো নানা"। এ কারণ, এই সূত্রের উপর ব্যাসদেব নির্ভর করিলেন না। "একে" এই পদের দ্বারা ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ, ইত্যাদি বাক্যেরও অর্থ এই দুই সূত্রের সহিত ঐক্য করিয়া করিতে হইবে।

অতএব, ঐ বাক্যস্থ দ্বিতীয় "জীব" শব্দটীর অর্থ জীবনবিশিষ্ট। অর্থ এই, "আমার সনাতন অংশ জীবলোকে গিয়া জীবনসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়।" পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মণ, বলরাম, পরশুরাম প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অদ্বৈত-বাদীরা অর্থ করিয়া থাকেন, "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবের স্বরূপ (অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপ) হইয়া থাকে।" এরূপ তাৎপর্য্য হইলে "জীবলোকে" এই অংশটুকু না দিলেও চলিত। "আমার জীবভূত অংশ জীবলোক গঠন করে" এ মীমাংসা উক্ত বাক্য হইতে বাহির করা উচিত নহে। ঐ বাক্যটীর দ্বারা অনুভব করা উচিত হয় যে, "জীবলোক" যেন প্রসিদ্ধ আছে। সেই জীবলোকে ব্রহ্মের অংশও জীবনসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এ সকলের যে ব্যাখ্যা করেন, সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কোনও ক্রমেই চলিতে পারে না। কারণ, অন্যত্র ভগবান্ স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন যে,

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অদ্বৈতবাদিকৃত পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা যদি সাধু হইত, তাহাহইলে ভগবান্ এ ভাবেই মাত্র আবির্ভাব-তত্ত্ব ব্যক্ত না করিয়া আবির্ভাব সম্বন্ধে ইহাও বলিতেন,

পরদারোপভোগার্থং গৃহীতুং স্বং পরস্য চ।
চিরং নরক-ভোগার্থং সম্ভবামি ক্ষণে ক্ষণে॥

ফল, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল অবলম্বনে জীবে ব্রহ্মে ঐক্যসাধন করা অদ্বৈতবাদিগণের কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সুস্পষ্ট ভেদসাধক বহুপ্রমাণ শ্রুতি ব্যাখ্যা কালে আমরা দর্শাইয়াছি এবং অভেদ সিদ্ধি হইতে

পারে না ইহা সপ্রমাণ করিয়াছি। ব্যাসদেবও সেই মীমাংসা করিয়াছেন, ইহা পরে বিশদরূপে প্রকাশ পাইবে। তৎসমুদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া আমরা আমাদের মীমাংসা করিলাম।

ব্যাসসূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়।

(৩য় অধ্যায়। ২য় পাদ হইতে।)

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি। আকার-সম্বন্ধ ও নিরাকার-ভাব থাকিলেও, ব্রহ্মে মায়াবত্ত্ব ও মায়ারাহিত্য উভয় ধর্ম্ম নাই, ইহাই সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়।

ন ভেদাদিতিচেৎ; ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ। মায়াবত্ত্ব ও মায়ারাহিত্য এই উভয় লিঙ্গ না থাকিলেও আকার ভেদ এবং সাকার নিরাকার ভেদ যখন কল্পাইতে হইতেছে, তখন অভেদ থাকিতে পারে না, ভেদই সিদ্ধ হইতেছে, যদি এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হয়, তাহার সমাধান এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শরীরধারী হইলেও এবং সাকার নিরাকার হইলেও ব্রহ্ম প্রত্যেক নহেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নহেন। কারণ কোনও রূপ ভেদবোধক বচন নাই।

অপিচৈবমেকে। ভেদবোধক বচন তো নাইই, অধিকন্তু কোনও কোনও ঋষি ভেদদৃষ্টির স্পষ্টতঃই নিন্দা করিয়াছেন। যথা, "শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। অভেদবুদ্ধ্যা বর্ত্তেত ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ।" "শ্রীরামস্তারিণী সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপা চ কালিকা।" ইত্যাদি।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ব্রহ্মের রূপ নাই। কারণ, তিনি শিব দুর্গাদি দেহের অধিষ্ঠাতা মাত্র।

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ। ব্রহ্ম মানিবার আবশ্যক কি, একথা বলিতে পার না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভূত সকল পরমাণ্বাদিরূপে অব্যক্ত থাকে। ব্রহ্মই তাহাদিগকে প্রকাশ করেন। 'প্রকাশবৎ' এই বাক্যের 'প্রকাশ' শব্দ ণিজন্ত ভাবে সিদ্ধ। অর্থ 'প্রকাশনা'।

আহ চ তন্মাত্রং। সৃষ্ট্যাদিতে প্রকাশক আর কেহ ছিলেন না। শ্রুতি ইহা বলে। শ্রুতি যথা, 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' 'নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ' ইত্যাদি।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ। ব্রহ্ম যখন নিখিল বস্তু প্রকাশ করেন, তখন সূর্য্যাদির সহিত তাঁহার দৃষ্টান্ত চলে। তাৎপর্য্য এই, অন্ধকারে ভূত সকল অব্যক্ত থাকিলে সূর্য্য তাহাদিগকে প্রকাশ করেন। পরমাণ্বাদিরূপে অব্যক্ত থাকিলে ব্রহ্ম তাহা প্রকাশ করেন; অর্থাৎ, ভূত সৃষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষোপযোগী করেন। সুতরাং প্রকাশকতা-শক্তি দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত উভয়ত্রই বিদ্যমান।

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং। ব্রহ্ম জলাদির মত হইলে উপাধি-ভেদে বিভিন্নাকার ধারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ না হওয়ায় ব্রহ্মই সকল বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে পারেন না। এই সূত্রেও অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন।

ব্রহ্ম জলবৎ নহে এবং তাঁহাতে হ্রাস বৃদ্ধিও স্বীকৃত হইল না; তবে "হিমালয়ে উমা বাড়িতে লাগিলেন" "তরুণবেশী শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাসলীলা করিলেন" এ সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয় কিরূপে? এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্ব-মন্তর্ভাবাৎ। অর্থাৎ ব্রহ্মের হ্রাস-বৃদ্ধি-ভাগিত্ব শরীরান্তর্ভাবে। অতঃপর বলিতেছেন, উভয়সামঞ্জস্যাদেবং। সাকার নিরাকার

উভয়রূপী ব্রহ্মে এইরূপ বিচারপূর্ব্বক সামঞ্জস্য করিয়া লইলে সর্ব্বাংশ নির্দ্দোষ হইবে। 'মহাকাল ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংশ করিলেন' 'বিবসনা শ্যামা রণোন্মাদিনী হইয়া পতি-বক্ষে নৃত্য করিলেন' 'ঋষিশাপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র মোহাভিভূত হইলেন' 'লক্ষ্মী অশোকবনে শোকাকুলা হইলেন' 'গোপাল নবনীর লোভে কাঁদিতে লাগিলেন' এ সকল বাক্যের মীমাংসার জন্য পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে লোকবত্তু লীলা কৈবল্যং এই সূত্রের অনুশীলন কর। পূর্ণ ব্রহ্মকে অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম সাজাইও না।

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য এইবার উপক্রম করা হইতেছে, প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ব্রবীতি চ ভূয়ঃ। এই পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ ব্রহ্ম কি না এ বিষয়ে নিষেধও আছে, উল্লেখও আছে।

তবে, ব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে বুঝিব, চারিটী সূত্রের দ্বারা ক্রমশঃ তাহার সমাধান করিতেছেন, তদব্যক্তমাহ হি। ব্রহ্মকে অব্যক্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। ব্রহ্মের যে তাহাই স্বরূপ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারাও ইহা আরাধনাকালে যোগীরা জানিতে পারেন। কেবল বাক্য দ্বারা স্বরূপ-নির্দ্দেশ হয় না। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারাই যে স্বরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে তাহা এই সূত্রে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এ কারণ 'শ্রোতব্যঃ' এই অংশের পর 'মন্তব্যঃ' এই অংশ আদিষ্ট হইয়াছে। 'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ' লিখিয়া 'মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ' লিখিতে হইয়াছে। 'যস্তর্কেণাভিসন্ধত্তে' ইত্যাদি এবং 'দৃষ্ট্বাচান্বীক্ষিকীং পরাং' 'বিনাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবং' প্রভৃতি বাক্য দ্বারাও পুনঃ পুনঃ তর্কশাস্ত্রেরই প্রামাণ্য

নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। 'অনুমান এবং প্রত্যক্ষভেদে উপাসনা দ্বিবিধ' এই অর্থও এ সূত্রের করা যাইতে পারে। সে পক্ষে অভেদে তৃতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে ব্রহ্মে ব্যক্ত সমুদয় সামগ্রীর ভেদই আছে। ব্রহ্ম সমুদয় সামগ্রীর সহিত অভিন্ন এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়, উপক্রমে ইহা লিখিত হইয়াছে। সে বিষয়ের মীমাংসা হইল কই? এই আশয়ে বলিতেছেন, প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং। প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ। ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহের তুল্য প্রতীয়মান হইলে আর বিশেষ-বুদ্ধি থাকিতে পায় না। ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান বস্তুর সহিত অভিন্ন নহেন, কিন্তু তৎতুল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, ইহা 'প্রকাশাদিবৎ' এই শব্দের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সাদৃশ্যবোধক শব্দ ভেদ-সাধক, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে ব্রহ্ম কখনও 'প্রকাশাদিবৎ' অর্থাৎ প্রকাশমান বস্তু প্রভৃতির তুল্য হন বলিয়াই প্রকাশাদিরূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের সেইরূপ 'প্রকাশ' সাধকের আনুষ্ঠানিক অভ্যাস নিবন্ধন হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অংশেও বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মের স্বরূপ উহা নহে, সাধকের চেষ্টার ফল মাত্র। কোন্ অবস্থায় ব্রহ্ম 'প্রকাশাদিবৎ' হন, তাহা শ্রুতি-সমন্বয় কালে আমরা বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি।

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গং। অভ্যাসের দ্বারা কখনও এই অবস্থা হয় বলিয়াই অনন্তরূপে তাঁহার নির্দ্দেশ করা হয়। উপক্রমে কহিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মে ভেদ অভেদ দ্বিবিধ ব্যবহার আছে। কোন্‌টী স্বরূপ, কোন্‌টী আরোপ, তাহা এক্ষণে প্রতিপাদন করা হইয়া গেল। অতএব কোন্ শ্রুতি স্বরূপ-বোধক, কোন্ শ্রুতি অবস্থা-

বিশেষের পরিচায়ক, সুধীগণ যেন ব্যাসসূত্র অনুসারে তাহা বিচার করিয়া লন।

ব্রহ্ম নিখিল বস্তুর স্বরূপ নহে সত্য, কিন্তু সাকার নিরাকার উভয়রূপে ব্রহ্মের নির্দেশ আছে। ব্রহ্ম কি তবে ভিন্ন ভিন্ন? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, উভয়ব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ। অর্থাৎ সাকার নিরাকার উভয় নির্দ্দেশ থাকিলেও ভেদ সিদ্ধ হয় না। অহি কুণ্ডল পাকাইয়া পরিচ্ছিন্ন ভাবেই থাক্, আর তৎপরিবর্ত্তে বিস্তৃত ভাবেই থাক্. তাহা সেই এক অহি ভিন্ন আর কিছু নহে।

অন্য দৃষ্টান্তও দিতেছেন, প্রকাশাশ্রয়বদ্বাতেজস্ত্বাৎ। দীপ্তিও তেজঃ, তদাধার দীপশিখাও তেজঃ। তেজঃ ভিন্ন ইহারা অন্য কিছুই নহে। সাকার নিরাকার ব্রহ্মও তদ্রূপ।

এই সকল দৃষ্টান্তে পরিতোষ না হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র স্মরণ করাইবার অভিলাষে লিখিতেছেন, পূর্ব্ববদ্বা। অর্থাৎ "ন ভেদাদিতি চেৎ, ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" "অপিচৈবমেকে" ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র স্মরণ কর।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাসসূত্রে 'এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই শ্রুতির পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যা এবং লয়ের ক্রম। ব্যাসসূত্রে পরমাণু। দ্ব্যণুক, পরমাণু সংস্থাপনের দার্শনিক তর্ককৌশল। ব্যাসসূত্রে মুক্তজীব। জীবে ও ব্রহ্মে ভেদসাধক বিবিধ প্রমাণ ও দার্শনিক তর্ককৌশল।

ব্যাসসূত্রে লয়ের ক্রম-বর্ণন।

(৪র্থ অধ্যায়। ২য় পাদ হইতে।)

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ। মনঃ বিদ্যমান থাকিতে বাক্য লয় হয়, এইরূপ দেখা যায় এবং শ্রুতিও আছে। শ্রুতি যথা, 'বাঙ্মনসি'।

অতএব সর্ব্বাণ্যনু। অপরাপর ইন্দ্রিয়েও বাগিন্দ্রিয়েরই অনুসরণ করে ইহাও বুঝিতে হইবে।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ। তৎপশ্চাৎ প্রাণ বিদ্যমানে মনোবৃত্তি লীন হয়, উত্তরোত্তর পর্য্যালোচনা করিলে ইহা জানা যায়। শ্রুতি যথা 'মনঃপ্রাণে'। এই 'মনঃ' শব্দ লাক্ষণিক ইহা দ্বৈত-অদ্বৈত উভয় বাদীরই সম্মত। কারণ অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন 'মনঃ' তৈজস

পদার্থ। কিন্তু এই সূত্রস্থ 'মনঃ' তাহা নহে। যেহেতু শ্রুতিতে অগ্রেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে 'অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ'।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ। প্রাণ তদীয় অধ্যক্ষ বিদ্যমান থাকিতেই লীন হয়। সৃষ্টি-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, অন্নের (ক্ষিতির) অধ্যক্ষ জল। জলের অধ্যক্ষ তেজঃ। অতএব এই সূত্রে বুঝা গেল তেজঃ বিদ্যমান থাকিতে প্রাণ লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিও বলিতেছেন 'প্রাণস্তেজসি'। 'প্রাণ' শব্দে এ স্থানে বায়ুবিশেষ বুঝিতে হইবে না। যেহেতু শ্রুতিতে অগ্রেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে 'আপোময়ঃ প্রাণঃ।'

ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ। পরবর্ত্তী লয় ভূতেই হইয়া থাকে। সে সময় অন্য কোনও অন্য দ্রব্য বিদ্যমান থাকে না ইহাই এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে তাহাদেরও নাশ লিখিত হইত। পরবর্ত্তী লয় এই বাক্যের দ্বারা তেজোলয় বুঝিতে হইবে। ভূত এই শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম ভূত অর্থাৎ পরমাণু বুঝিতে হইবে। 'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং' এই শ্রুতিরও ব্যাখ্যা করিবার সময় বুঝাইয়া দিয়াছি, তেজঃ তদীয় পরমাণুতেই পর্য্যবসিত হয়। 'পরদেবতা' শব্দে ব্রহ্ম নহে, উহা পারিভাষিকমাত্র। নচেৎ 'স য এষোঽণিমা' এই অংশ দেওয়া চলিত না। এ বিষয়েরও বিচার শ্রুতি-সমন্বয় কালে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাসসূত্রেও 'ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ' থাকায় তেজোলয় যে ব্রহ্মে নহে. ইহা আরো স্পষ্টতররূপে জানা যাইতেছে। 'ভূত' শব্দে ভৌতিক-পরমাণু ধরা যাইতে পারে।

ক্ষিতি, জল প্রভৃতি কোন্ কোন্ সামগ্রী অগ্রে, কোন্ কোন্ সামগ্রী পশ্চাৎ লয় প্রাপ্ত হয় তাহাই প্রদর্শন করান, এই সকল সূত্রের উদ্দেশ্য। তাহারাও পরমাণুতেই পর্য্যবসিত হয় বুঝিতে হইবে। 'ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ' এই সূত্রের 'ভূত' শব্দের অর্থ তৈজস-পরমাণু। স্পষ্ট

সকল ভূতই কি এই তৈজস পরমাণুতেই লীন হয়? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলা হইতেছে নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি। শ্রুতি ও প্রমাণ উভয়ই প্রতিপন্ন করিয়া থাকে যে, এক জাতীয় ভৌতিক পরমাণুতে সকল প্রকার ভৌতিক জন্য-পদার্থ লীন হয় না। অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, এক ব্রহ্মেই সকল বস্তুর লয়। ইহা তাঁহাদের অতি ভ্রান্তি। যেহেতু ব্যাস এই সূত্রে স্পষ্টই বলিলেন "নৈকস্মিন্।" বহুপরমাণুতে পর্য্যবসিত হয় ইহাও "ভূতেষু" এই বহুবচনান্ত শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাণু স্পষ্ট ভাবেই স্বীকৃত হইল। কিন্তু, আশঙ্কা উঠিতেছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব কল্পাই কেন? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন, সূক্ষ্মং প্রমাণতস্তথোপলব্ধেঃ। সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান, অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা এ বিষয়ের উপলব্ধি হয়। সেই প্রমাণ প্রদর্শন করাইতে হইলে, প্রথমতঃ ত্রসরেণুর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত চরম সূক্ষ্ম সামগ্রীর জন্যত্বানুমান আবশ্যক। তাহার আকার এই,—ত্রসরেণবো জন্যাঃ সাবয়বদ্রব্যত্বাৎ। তর্ক যথা,—ত্রসরেণবো যদি নিরবয়ব দ্রব্যাণি স্যুঃ তদা বাহ্যেন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষবিষয়া ন স্যুঃ। দৃষ্টান্ত—আকাশ, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ত্রসরেণুর অবয়বের জন্যত্ব-নির্ণায়ক তর্ক; যথা—ত্রসরেণবো যদি নিত্যমাত্রসমবেতা নিত্যমাত্রোপাদেয়া বা স্যুঃ, তদা শ্রবণান্যবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যা ন স্যুঃ। দৃষ্টান্ত—শব্দ, আত্মবিশেষগুণ। এইরূপে দ্ব্যণুকের জন্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তাহার উপাদানকে লাঘবতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ধ্বংস প্রাগভাব কল্পাইলে সেই ধ্বংস প্রাগভাবের অনবস্থা দোষ ঘটিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা যে নিত্য বস্তু সংস্থাপিত হইল তাহা ব্রহ্ম নহে। এ বিষয়ের তর্ক 'কৃৎস্ন প্রসক্তি-

নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা' এই সূত্রে ব্যাসদেবই প্রদর্শন করাইয়াছেন। ঐ সূত্র পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নোপমর্দ্দেনাতঃ। অন্ন-সামগ্রীর ধ্বংসনিবন্ধন সূক্ষ্মসামগ্রীর ধ্বংস হয় না।

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা। তৈজস সূক্ষ্ম পদার্থই এই জন্ম জগতের উপপত্তি করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা, 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং।' 'ঐতদাত্ম্যং' এই শব্দের অর্থ 'তৈজস-পরমাণু জন্যং' এ বিষয় শ্রুতি-মীমাংসা-কালে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যে সূক্ষ্ম ভূতকে আমরা পরমাণু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, অদ্বৈত-বাদীরা তাহাকে পরমাণু বলেন না। তাঁহারা বলেন উহার নাশ আছে। নোপমর্দ্দেনাতঃ এই সকল সূত্রের অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, জীব যতদিন মুক্ত না হইয়া শরীরান্তর পরিগ্রহ করেন, ততদিন স্থূল-শরীরের ধ্বংসে পঞ্চ-ভূতাত্মক-সূক্ষ্মশরীরের ধ্বংস হয় না। এই সূক্ষ্মশরীর অনাদি হইলেও প্রলয়ে তাহার নাশ আছে ইহাই তাঁহাদের মত। তাঁহাদের ভ্রম নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন তানি পরে তথা হ্যাহ। সূক্ষ্ম-সমূহ পরে অর্থাৎ প্রলয়েও সেইরূপই থাকিবে শাস্ত্র ইহা বলিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদীরা এই সূত্রের অর্থ স্বতন্ত্র ভাবে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অর্থ এই 'সূক্ষ্মসমূহ পরমব্রহ্মে লীন হয়, শাস্ত্র এইরূপ বলিয়া থাকে।' 'তথা' শব্দের অর্থ 'লীন' এরূপ হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্বে লয়ের কথা উল্লেখ নাই। 'সূক্ষ্ম ধ্বংস হয় না' এইরূপই বরং পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। 'তথা' শব্দের দ্বারা তদ্রূপই অর্থ করা উচিত। 'সূক্ষ্ম' পরমব্রহ্মে লীন হয় এ বিষয়ে বিশেষ কোনও শ্রুতি অদ্বৈতবাদী দিতে পারেন নাই। যাহা দিয়াছেন, সে শ্রুতির মধ্যে কিরূপ গূঢ়

রহস্য বিদ্যমান, তাহা শ্রুতিসমন্বয় কালে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপূর্ণ তদ্বিষয়ে অনুমানও আছে। সেই অনুমানের আকার এই,

সূক্ষ্মপদার্থঃ নাশাপ্রতিযোগী অনাদি ভাবত্বাৎ।

অদ্বৈতবাদিগণ ইহার বিরোধি অনুমান করিতে পারেন। সে অনুমানের আকার এই,

সূক্ষ্মপদার্থঃ নাশপ্রতিযোগী, ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ।

আমরা পূর্ব্বে যে নিয়ম প্রদর্শন করাইয়াছি তদ্দ্বারা পরীক্ষা করিলে দার্শনিকগণ বুঝিতে পারিবেন অদ্বৈতপক্ষীয় অনুমানটীর প্রামাণ্য নাই। দ্বৈতপক্ষীয় অনুমানটীরও প্রামাণ্য নাই, এ কথা যেন কেহ না বলেন। যেহেতু দ্বৈতপক্ষে তর্ক আছে। বাধক না থাকিলে সে বস্তুকে নিত্য বলাই উচিত, যেহেতু অনন্ত ধ্বংস প্রাগভাবাদি কল্পাইতে হয় না। এজন্য অনাদি-ভাব মাত্রেই নিত্য, ইহা নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দ্বৈতপক্ষে তর্ক থাকায় দ্বৈতপক্ষীয় অনুমানই সুষ্ঠু। এ বিষয়ের বিশেষ বিচার মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ফলে, পরমাণু যে নিত্য দ্রব্য ইহা ব্রহ্মসূত্রের পরমাণু সংস্থাপন কালে এবং পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে শ্রুতিসমন্বয় কালে আমরা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি।

এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতে পারে, যদি পরমাণু স্বীকার করা হইল, তবে মহাপ্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হইবে না কেন? সেই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ উক্ত হইয়াছে, অবিভাগোবচনাৎ। অর্থাৎ পরমাণু থাকিলেও সে সময় ক্রিয়া থাকে না, এ বিষয়ে মহাজন-পরম্পরার বাক্য আছে। মহাপ্রলয় যে, "জন্য ভাবানধিকরণ কালই" এ অংশে

অদ্বৈতবাদীরও বিবাদ-সম্ভাবনা নাই। এই সূত্রস্থ "বিভাগঃ" শব্দটী অপাদান-বাচ্যে সিদ্ধ। এ কারণ, (বিভজ্যতে যস্মাৎ, অর্থাৎ) যাহা হইতে বিভাগ হয় সেই বস্তু এই শব্দের দ্বারা লব্ধ হইতেছে। "আদৌ ক্রিয়া ক্রিয়াতো বিভাগঃ" ইত্যাদি ন্যায়শাস্ত্র-সিদ্ধ প্রমাণ দৃষ্টে জানা যায় যে, ক্রিয়া হইতেই বিভাগোৎপত্তি। অতএব পূর্ব্বোক্ত অর্থ অসঙ্গত নহে।

ব্যাসসূত্রে 'আনন্দ' শব্দের মীমাংসা।

(১ম অধ্যায়। ১ম পাদ হইতে।)

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। ব্রহ্ম আনন্দময়, এ বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।

অনেক স্থলে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা মৃত্তিকাময়ো ঘটঃ। ব্রহ্মকে কি আনন্দের বিকার বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে? যদি তাহা হয় তবে 'নিত্য' হন কিরূপে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ সূত্র করা হইয়াছে, বিকারশব্দান্নেতিচেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। 'আনন্দময়' শব্দটী বিকারবোধক, সুতরাং ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতে পারে না, এই পূর্ব্ব-পক্ষ করিও না। প্রাচুর্য্যার্থে পূর্ব্বোক্ত 'ময়ট্' প্রত্যয় সিদ্ধ। যথা অন্নময়ো যজ্ঞঃ।

ব্রহ্ম প্রচুর আনন্দের স্বরূপ ইহাই কি তবে বুঝিতে হইবে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন, তদ্ধেতু-ব্যপদেশাচ্চ। ব্রহ্ম প্রচুর আনন্দের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। তিনি প্রচুর আনন্দের স্বরূপ নহেন। 'নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' এই বাক্যের ব্যাখ্যা কালে আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি, ব্রহ্মে যত

'আনন্দ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে গুলি ণিজন্ত করিয়া তদুত্তর কৃৎ-প্রত্যয় করতঃ সিদ্ধ। এক্ষণে অভিজ্ঞগণ বুঝিতেছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন ব্যাসদেবও তাহাই বলিলেন। শ্রুতিও তাহাই আছে। যথা, 'এষ হ্যেবানন্দয়তি।'

সুখ নিশার ধর্ম্ম নহে। জীবের ধর্ম্ম। কিন্তু নিশা যদি প্রচুর ভাবে তাহা জন্মাইতে পারে, তবে 'সুখ-নিশা' 'সুখময়ী নিশা' এরূপ প্রয়োগ হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ নিয়ম। আনন্দ জীবের ধর্ম্ম। ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম প্রচুর ভাবে তাহার জনক হন বলিয়া 'আনন্দো ব্রহ্ম' 'আনন্দময়ং ব্রহ্ম' এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত, সুখ 'জন্য' পদার্থ, ইহা 'ধর্ম্মাৎ সুখং' ইত্যাদি শ্রুতি বলে জানা যায়। 'ধর্ম্মাৎ সুখং' এই শ্রুতির ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদীরা করেন 'ধর্ম্মাৎ জীব-সুখং।' এরূপ অর্থ করিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইল এবং কার্য্যকারণ-ভাবে গৌরব দাঁড়াইল। 'আনন্দ' বা 'আনন্দময়' শব্দের 'আনন্দজনক' অর্থ দ্বৈতবাদিগণকেও করিতে হইতেছে বটে কিন্তু ঐ অর্থ লাক্ষণিক নহে। আপ্ত-বাক্য ও সূত্র-নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা শক্যার্থ। অতএব দ্বৈতব্যাখ্যায়ই স্বরস অধিক। শ্রুতি-সমন্বয় কালে এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে।

ব্যাসসূত্রে মুক্তজীব-বর্ণন।

(৪র্থ অধ্যায়। ৪র্থ পাদ হইতে।)

সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে জীব নিজরূপে অধিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ শরীরাদি কোনও রূপ উপাধি-বিশিষ্ট আর থাকেন না। শ্রুতি যথা, "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ। প্রতিজ্ঞা বাক্যে বলা হইয়াছে ঐরূপ হইলে জীব মুক্ত হয়।

আত্মাপ্রকরণাৎ। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্থ জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ 'আত্মা'।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ। জ্যোতিঃ ও আত্মা একপর্য্যায়ক ইহা দেখা গিয়াছে। যথা, 'পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' 'জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং' ইত্যাদি।

চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে যাহা 'নির্ব্বাণ' মুক্তি, তাহারই বিষয় এ স্থলে লিখিত হইল। আরও কয়েক প্রকার মুক্তি এবং কয়েক জন মহর্ষির সিদ্ধান্ত ব্যাসসূত্রে কথিত হইয়াছে।

মুক্তি-বিষয়ক শ্রুতিগুলির অর্থ আমরাও যাহা করিলাম, শারীরক-ভাষ্য ভামতী প্রভৃতি দৃষ্টে জানা যায়, অদ্বৈতবাদীরাও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তবে প্রভেদ এই, 'স্বেন রূপেণাভিসম্পদ্যতে' এই শ্রুতির অর্থ অদ্বৈতবাদীরা করিয়া থাকেন 'ব্রহ্মরূপেণাভি-সম্পদ্যতে'। আমরা তাহা করি নাই। আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি 'মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' 'পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যাদি শ্রুতিই মুক্ত-জীবের স্বরূপ-নির্দ্দেশক, অন্য শ্রুতি লাক্ষণিক। অতএব ঐ সকল শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় মুক্তজীব ব্রহ্মতুল্য হন, কিন্তু ব্রহ্ম হন না। এই সাদৃশ্য কিম্বিধায় তাহাও সবিশেষ প্রমাণীকৃত হইয়াছে। 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনা-শিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।' এই ভগবদ্-বাক্যে জানা যায়, জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য ব্যবহারিক নহে। কারণ উপাধি-অভিপ্রায়ে ঐ বাক্য উক্ত হইলে, দেহ দেহী উভয়কেই 'অন্তবন্ত' বলা হইত। আর ধর্ম্মি-তাৎপর্য্যে ঐ বাক্য উক্ত হইলে উভয়কেই 'নিত্য'

বলা উচিত ছিল। এ বিচারও পূর্ব্বে বিশদ-ভাবে করা হইয়াছে। ঐ ভগবদ্‌বাক্যটীতে দেহীকে লক্ষ্য করিয়া 'নিত্যস্য' 'অনাশিনঃ' এই উভয় বিশেষণ যখন প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন 'জীব' ও 'জীবত্ব' উভয়েরই অনাশিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নচেৎ 'অনাশিনঃ' এই বিশেষণটী দিবার আবশ্যক ছিল না। নাস্তি নাশো যস্য তৎ অনাশং। 'অনাশং বিদ্যতেঽস্য' এই অর্থে 'অনাশী' সিদ্ধ। অতএব "জীব-পদার্থতাবচ্ছেদকও" যে অবিনশ্বর তাহাও উক্ত বাক্যেই সপ্রমাণ হইতেছে। 'অনাশস্যাপ্রমেয়স্য' এইরূপ উল্লেখ না করিয়া যখন 'অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য' উল্লেখ রহিয়াছে, তখন দ্বৈতপক্ষীয় ব্যাখ্যায় স্বরসই দাঁড়াইয়াছে। 'অব্যয়' এই কথাটীর দ্বারা যদি ইষ্ট সিদ্ধি হয়, তবে অব্যয়ী এরূপ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। ফলে, ঐরূপ প্রয়োগের স্থলে যদি সদ্‌ব্যাখ্যা না করা যায়, তবে অগত্যা কোনও রূপে ব্যাখ্যা করিতে হয়। কিন্তু যদি উপায় থাকে, তবে সর্ব্বাংশের সার্থক্য দেখান উচিত। সে যাহাহউক, ভগবদ্‌বাক্যে 'নিত্যস্য' 'অনাশিনঃ' এই দ্বিবিধ প্রয়োগে দ্বিরুক্তি-দোষ পরিহারার্থ লক্ষণা করা অপেক্ষা, যথাশ্রুত অর্থ আমরা যাহা করিলাম, তাহাই গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে কি? জীব অণুস্বরূপ নহেন, কিন্তু সীমারহিত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী। 'অপ্রমেয়স্য' এই বিশেষণের দ্বারা এ বিষয় স্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীরা নিশ্চয়ই বলিবেন, গীতার পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহের লক্ষণা না করিলে, স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। তাঁহারা স্বরূপ-নির্দ্দেশক বাক্যগুলির লক্ষণা করিয়া প্রকৃত লাক্ষণিক বাক্যকে স্বরূপ-নির্দ্দেশক বলিয়া অবধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে গোলযোগ ঘোচে কিরূপে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন,

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নামক দ্বিবিধ উপায় এই সকল বস্তুর স্বরূপ এইরূপই প্রদর্শন করাইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞ হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং তৎসহ নিখিল বস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়, এবং তৎপরে পৃথক্ ভাবেও জীব-সাক্ষাৎকার হয়, ইহা শ্রুতিসমন্বয় কালে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ ঐ সময়ই লোকে জানিতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষের দ্বারা সকল বস্তুর নির্দ্ধারণ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এ কারণ, সাধারণের জন্য 'অনুমান' নামক অন্যবিধ উপায় আদিষ্ট হইয়াছে। সে উপায়ে জানা যায়, অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত শ্রুত্যর্থ অশুদ্ধ এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমজনক, অর্থাৎ জীব উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম নহেন। অনুমানের আকার যথা,

জীবত্বং অবিনাশি, অনাদিভাবত্বাৎ।

অবশ্য ইহার বিরোধি অনুমানও আছে। এ কারণ, তর্কের দ্বারা অনুমানের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অনাদি-ভাবকে অবিনাশী বলিলে কতদূর লাঘব আছে, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব তর্ক বশতঃ দ্বৈতপক্ষীয় অনুমানেরই প্রামাণ্য, বিরোধি অনুমানের প্রামাণ্য নাই বুঝিতে হইবে। জীব উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম নহেন, এ বিষয়ে আরো তর্ক যথা,

জীবপদার্থতাবচ্ছেদকং যদি স্বাশ্রয়নিষ্ঠভেদব্যবহার-প্রযোজকং স্যাৎ, তদা ব্রাহ্মপ্রলয়বৃত্তিনাশপ্রতিযোগি স্যাৎ।

এই তর্কের আরো কতিপয় প্রকার-ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

> জীবপদার্থতাবচ্ছেদকং যদি স্বাবচ্ছিন্নশক্তিমৎপদ-প্রতিপাদ্যস্বাশ্রয়নিষ্ঠভেদব্যবহারপ্রযোজকং স্যাৎ, তদা ব্রাহ্মপ্রলয়বৃত্তিনাশপ্রতিযোগি স্যাৎ।

উদাহরণ যথা, কর্ণত্ব, দিঙ্নিষ্ঠ পূর্ব্বত্ব পশ্চিমত্ব, মহাকালনিষ্ঠ ক্ষণত্ব দিনত্ব মাসত্ব বর্ষত্বাদি। কর্ণত্বের আশ্রয় কর্ণ অর্থাৎ গগন। সেই গগন 'কর্ণত্বাবচ্ছিন্নশক্তিমৎপদপ্রতিপাদ্যও' বটে। আবার গগন-নিষ্ঠ ভেদ-ব্যবহারের প্রযোজকও কর্ণত্ব। তাহার কারণ এই, "তৎকর্ণ এতৎ-কর্ণত্ববান্ ন" এইরূপ ভেদ-ব্যবহার করা যাইতেছে। যেহেতু 'কর্ণ-বিবরাবচ্ছিন্নত্ব-বিশিষ্ট' গগনত্বের নাম কর্ণত্ব, সেইহেতু খণ্ডপ্রলয় অর্থাৎ ব্রাহ্মপ্রলয় প্রভৃতিতে তাহার নাশ আছে। সকল দৃষ্টান্তগুলি এই ভাবে লাগাইয়া লইতে হইবে। যদি উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মত্বের নাম 'জীবত্ব' হয়, তবে জীবত্বেরও সেই দশা। অব্যভিচারী নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, খণ্ডপ্রলয়েই সকল জীব মুক্ত হইতে পারেন। অর্থাৎ তৎপরে জীব আর বিদ্যমান থাকিতে পারেন না।





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সুধীসমাজে নিবেদন। স্বাধীন দার্শনিকগণের সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রভেদ ও অদ্বৈতমত খণ্ডনের পবিত্র উদ্দেশ্য বর্ণন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের মীমাংসাকালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সতর্কতা। দার্শনিকতা ও ধার্ম্মিকতার পার্থক্য। ধর্ম্মজীবন গঠন পক্ষে সার উপদেশ।

প্রায় দেখা যায়, অশাস্ত্রজ্ঞেরাও শ্রুতিসাধক দেখাইয়া আত্মমত পুষ্টি করিতে চাহেন। তাহা বৈধ নহে। সরল প্রাণে যেরূপ বুঝা যায়, সেইরূপ একটা ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যাকে কথঞ্চিৎ কাব্য-ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রব্যাখ্যা, সকল স্থলে সে নিয়মে হয় না। শাস্ত্রে আছে,

মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেদন্যযোনিষু।

বল দেখি, সরল ভাবে ইহার কিরূপ অর্থ আসিতেছে? শ্রুতি রহিয়াছে,

অতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে।

শ্রুতি রহিয়াছে,

উদিতেজুহোত্যনুদিতে জুহোতি।

বল দেখি, শাস্ত্র বাক্য পাইবামাত্র কাব্যের ন্যায় অর্থ করিতে যাওয়া সঙ্গত কি না? অতএব শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে পূর্ব্বাপর মীমাংসা-প্রণালী দৃষ্টি করিতে হয়। এক বিচারের একাংশ স্থূল ভাবে বুঝিয়া অপরাংশে অগ্রসর হইতে নাই। কোনও স্থান দুর্ব্বোধ হইলে, উপযুক্ত গুরুসাহায্যে অথবা অন্য কোনও উপায়ে মীমাংসকের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। ধৈর্য্য-চ্যুতি হইলে চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া পরে আবার আলোচনা করিতে হয়। শাস্ত্রবাক্য দ্বারা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তৎপরে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই ভাবে শাস্ত্রবাক্য ব্যবহারে অধিকারী হইয়া যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কৃত দ্বৈতব্যাখ্যায় দোষোদ্-ভাবন করতঃ কোনও প্রকৃত অভিজ্ঞ ব্যক্তি মীমাংসিত-প্রমাণগুলির অদ্বৈতব্যাখ্যা প্রদর্শন করান, কেবল তাহাই আমরা শ্রদ্ধা সহ দৃষ্টি করিব। এই প্রসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বরচিত একটী শ্লোক বিনীত ভাবে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অদ্বেষাদ্ দৃশ্যতামেষ নীতিভিজ্ঞৈঃ স্বপ্রণীতবৎ।
ঈদৃগ্ দৃষ্টেহ দোষশ্চেৎ স মে শিরসি নৃত্যতু॥

দার্শনিক-জগতের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, অনেক দেশে অনেক দার্শনিক স্বীয় অভিনব দার্শনিক-মত প্রকাশ করিয়া স্বদেশে গ্লানি-ভাজন হইয়াছিলেন। তথাপি নিজ সিদ্ধান্ত গোপন করেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সেরূপ এক অভিনব সিদ্ধান্ত নহে। যাহা দার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয় গৌতম-কণাদাদির মত, তাহাই তাঁহার

মত। ঐ অদ্বিতীয় দার্শনিকগণের মতের সুব্যাখ্যায় অসীম নৈপুণ্য দেখাইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় দার্শনিকগণের মধ্যে আমাদের চক্ষে ধন্য হইয়াছেন। আর শ্রুতিসমূহের সদ্‌ব্যাখ্যা করতঃ তদর্থ লোক-হৃদয়ে সম্যক্ সন্নিবেশিত করিয়া, এবং ব্যাসসূত্রাদি লইয়া যাহাতে যথেচ্ছ ভাবে মীমাংসা না হয় তদ্‌বিষয়ে যত্ন দেখাইয়া, আমাদের চক্ষে বিশেষ গৌরবের দার্শনিক হইয়াছেন ও জগতের নিতান্ত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন গ্রন্থের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝাইতে যাইয়া তিনি নিজেই যে কয়েকটী কারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,

ইতঃ স্যাত্তর্কবিদ্যায়ামনুরাগবিবর্দ্ধনং।
অদ্বৈতবাদিগর্ব্বস্য ভবেদেতেন মর্দ্দনং ॥
ইতো ব্রহ্মণি সাকারে পরা ভক্তিরুদেষ্যতি।
শিবাদি-পঞ্চদেবেষু ভেদবুদ্ধির্বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥
ব্যামোহ-হীনং ব্রহ্মৈব বিষ্ণুশক্তীশ-বিগ্রহং।
জগ্রাহ, সংগ্রহাদস্মাদবেষ্যন্তীদমাস্তিকাঃ ॥
মহামোহসমূহস্য প্রাপ্ত্যা চির-তপস্যয়া।
ভ্রান্তিঃ সর্ব্বত্র যুক্তানামুন্মত্তোক্তিরিয়ং ন কিং ॥
অদ্বৈতবাদরসিকস্যাস্থা নাস্ত্বত্র কিন্তুতঃ।
জলৌকসামনাস্বাদাদ্ রসালং কিং ঘৃণাস্পদং ॥
রচনেয়ং নবত্বেন ন দ্বেষ্যা দূরদর্শিভিঃ।
পুরা পরকৃতগ্রন্থঃ কদাপ্যাসীন্নবো ন কিং ॥

নবৈষা রচনা বাচাং প্রাচামাচারবোধিকা।
সন্তঃ সন্তোষবন্তস্তৎ সন্তু নৈনাং দ্বিষন্তু বা ॥

যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধ পদার্থসমূহের অপলাপ করতঃ অসঙ্গত ভাবে পদার্থ কল্পনা করিয়া তৎপক্ষে শ্রুতিসমন্বয় করতঃ কোনও রস তুলিতে চেষ্টা করিলে সে রস অলীক মাত্র, তাহা নিম্ন-লিখিত কবিতায় স্থায়রত্ন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন,

বেদান্তবাক্‌কণমথাপ্যনুমানলেশ-
মদ্বৈতবাদবলদং ন বিলোকয়ামঃ।
তস্মাত্তথাপি রসরাশিপিপাসবশ্চে
দাকাশসারসরসং রসিকাঃ পিবন্তু ॥

ভগবতীও যে পদার্থ আমরাও তাহাই, ভক্ত-দার্শনিকের প্রাণে এ মীমাংসা বড়ই বাজিয়া থাকে। স্থায়রত্ন মহাশয় অন্নপূর্ণার স্তবে কোনও স্থানে লিখিয়াছেন,

त्वय्येव देवि वरदे त्रिजगत्प्रभुत्वं
दासा वयन्तु भवदङ्घ्रियुगस्य नित्यं ।
इत्थं चिरावगतिखण्डनपण्डितानां
नाद्वैतवादगहनं वयमाश्रयामः ॥

মর্ম্মার্থ।

ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী তুমি ব্রহ্মময়ী তারা।
শ্রীপদ-কমলে তোর কিঙ্কর আমরা ॥

ভেদ-বুদ্ধি বিনাশিয়া এ চির-বিশ্বাস
খণ্ডাইতে যে পণ্ডিতে করে অভিলাষ,
তা'দের মা তত্ত্ব-কথা দাসেরা না শোনে
প্রবেশিয়া সুভীষণ অদ্বৈত-গহনে॥

অনেকে বলিতে পারেন, অজ্ঞানাবস্থায় বৈদান্তিকেরা কি 'প্রভু' 'দাস' বুদ্ধি খণ্ডাইতে চাহিয়াছেন? উত্তর এই, যুক্তি-জালের দ্বারা এক রকমের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, তত্ত্ববিরোধি কার্য্যে সহস্র প্ররোচনা কর না কেন, সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্য্যকারী হইবে না। অর্থাৎ সেরূপ করিলে সর্ব্বজনীন জ্ঞানের দ্বারা যাহা যাহা সিদ্ধ, তদ্বিষয়ে বুদ্ধির কোনও রূপ বৈলক্ষণ্য না ঘটিতে পারে, কিন্তু কেবল যুক্তিজাল ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা যে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত, বিভিন্নমুখী যুক্তিজাল এবং শাস্ত্রবাক্যের বিভিন্ন-মুখিনী ব্যাখ্যার বহুলপ্রচারে সে বিশ্বাস ধীরে ধীরে শিথিল হইবে। সেরূপ হইলে, স্বর্গ নরকে, পাপপুণ্যে, আচার অনাচারে পার্থক্য-বুদ্ধি, শিবদুর্গাদির পরব্রহ্মত্বে বিশ্বাস, এ সকল ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবে। বিবরের মধ্যে সর্প আছে, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, তৎপরে হাজার কেন বল "গর্ত্তের সর্পকে মৎস্য জ্ঞান করতঃ উহাতে হস্তপ্রবেশ করাও", সে আদেশ সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যকারী হয় না। আর যদি কার্য্যকারীও হয়, তথাপি 'প্রভু' (কর্ত্তা) 'দাস' (অধীন) একই পদার্থ ইহা উচ্চারণ করাতেও পাপ। যেহেতু ব্রহ্মের প্রভুত্ব-বিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানাবস্থার নহে। তত্ত্বজ্ঞান কালেও ঐরূপ বুদ্ধি থাকে, তাহা 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং' ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা-কালে পূর্ব্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদির মীমাংসায় ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও

সাবধান। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান বিষয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মধ্যে কখনও ভিন্ন ভিন্ন মত দাঁড়াইয়া যায়, তবে ন্যায়রত্ন মহাশয় এমন মীমাংসা করিতে ভালবাসেন, যদ্দ্বারা কোনও পণ্ডিতই বলিতে পারিবেন না যে, সে ভাবে কার্য্য করিলে ক্রিয়াটী পণ্ড হইয়া যাইবে। বিজয়াদশমীর মুহূর্ত্তভঙ্গ-স্থলে পূর্ব্বদিনে দেবী-বিসর্জ্জন অথবা তদ্দিনেই বিসর্জ্জন, ইহার মীমাংসা লইয়া পূর্ব্বাবধি গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জন হওয়াই বিধেয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ বিশ্বাস থাকিলেও উভয়মতের সামঞ্জস্য করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া শ্রীশ্রী৺ অপরাজিতা পূজা করতঃ পূর্ব্বদিনে দেবী-বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃকল্প স্থির করেন। এই মীমাংসায় উভয়-মতাবলম্বীদিগের বিবাদ মিটিয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সকল অনুষ্ঠানেই ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ সাবধান হইতে চেষ্টা করেন, এবং সেরূপ মীমাংসায় ধর্ম্মভীরু সকল অধ্যাপকেরই অনুমোদন পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত এই যে, কোনও কার্য্য করিয়া ফেলা হইয়া গিয়াছে, আর শোধনের উপায় নাই, এমন স্থলে যদি এক পক্ষ বলেন কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন অগত্যা সে কথা শুনিতে হয়। যে ক্ষেত্রে উভয় দিক্ বজায় রাখিয়া মীমাংসা করা চলে না, সে ক্ষেত্রেও বিচার পূর্ব্বক এক পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও একরূপ মীমাংসা করিলে উভয়বাদীর সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে সেই মীমাংসাই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য করা উচিত।

সংস্কৃতবিদ্যার তিনটী সামগ্রী জগতে অনুপম। কাব্যে কবিগণের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, দর্শনশাস্ত্রে আর্য্যদর্শনকারগণের অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা, বেদ-পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ধর্ম্মজীবনের অনুশাসন-প্রণালী। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে এই তিন অনুপম সামগ্রীরই প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে। তিনি

কবি-জীবনে কাব্যরসাস্বাদ করেন, দার্শনিক-কর্কশতায় সে জীবন কলুষিত নহে। তত্ত্ব-পথে মানব-যুক্তি কতদূর পৌঁছিতে পারে, ন্যায়রত্ন মহাশয় দার্শনিক-জীবনে তাহারই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার ঋষি-জীবন একমাত্র বেদ-পুরাণ-তন্ত্রাদিকে মূলভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। দার্শনিকগণ অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিগণকে আত্ম-মতে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের যুক্তির অন্তরালে যদি কোনও তত্ত্ববিহীনতা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে, তাহা হয়তো তাঁহারা নিজেও অনুধাবন করিতে পারেন না। এ কারণ, দার্শনিককে কখনও চার্ব্বাকমত প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। ধার্ম্মিকতা ও দার্শনিকতা স্বতন্ত্র সামগ্রী। দর্শনানভিজ্ঞ ব্যক্তিও পরমধার্ম্মিক হইতে পারেন। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই মহাবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া দর্শনকার স্বয়ং ব্যাসদেব যে উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥' এই মহাবাক্যের দ্বারা সর্ব্বদর্শনোপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ধর্ম্মজীবন-গঠনে তাহার উপরই মূল-ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। সে জীবনে আচারানুষ্ঠানেরই প্রয়ো-জনীয়তা, দার্শনিকগণের পরস্পরের বাদ-প্রতিবাদ কলহ-বিদ্বেষ সে অংশে ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ নহে। ধর্ম্মজীবন গঠনোপযোগী আচারানুষ্ঠান কি ভাবে নির্ণয় করিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা ন্যায়রত্ন মহাশয় উপদেশ দিতেছেন,

प्रक्षाद्योऽथ भगीरथप्रभृतयस्त्रोत्तानपादात्मजौ
देवीभक्तियुतौ समाधिसुरथौ शिष्टान् परिज्ञाय तान्।
भो भो मित्र पवित्र तद्‌गत-सदाचारः सदा शिष्यतां
वागजालैर्विजिगीषु दर्शनकृतां युक्तौ मनो मार्प्यतां ॥

মর্ম্মার্থ।

প্রহ্লাদ পরম ভক্ত, ভক্ত ভগীরথ,
ভক্ত ধ্রুব, দেবীভক্ত সমাধি সুরথ।
সেই সব সাধকেরে জেনে মহাজন,
শাস্ত্রে খোঁজ' তাহাদের কিবা আচরণ।
সে পবিত্র সদাচার সদা শিক্ষা করি'
হে মিত্র, চলিবে তুমি সেই পথ ধরি'।
দার্শনিক প্রত্যেকেই জিগীষার বলে
নিজ নিজ মতে পেতে গেছে বাক্যজালে।
সে স্ব-স্ব-প্রধান কোন' যুক্তিজাল ধরে'
ধর্ম্মতত্ত্ব স্থির কিছু কর' না অন্তরে॥

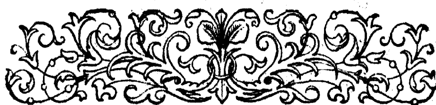
**चित्तं शोधय वेदबोध्यविधिना गौरीं गिरीशं हरिं
ध्यात्वा सत्यपरायणैर्मुनिगणैर्ध्यातं स्तुतं यत्पदं ।
योगैर्ब्रह्मनिरूपणं न सुकरं तत्तत्त्वबोधाशया
द्वैताद्वैतविचारवाग्विरचनं कस्येदमाराधनं ॥**

মর্ম্মার্থ।

চিত্তেরে শোধন কর শক্তি, শিব, হরি,
বেদবিধি অনুসারে আরাধনা করি'॥
পুরাকালে মহা ঋষি মহামুনিগণ,
করেছে তাঁদেরি স্তব চরণ-বন্দন॥
মিথ্যা না জানিত তা'রা সত্য-পরায়ণ,
তাঁদেরি দৃষ্টান্তে কর পথ নিরূপণ॥

যোগেও দুষ্কর যেই ব্রহ্মের নির্ণয়,
হায় ভ্রান্তি, তাঁরি তত্ব করিতে নিশ্চয়,
দর্শনেতে দ্বৈত আর অদ্বৈত বিচারে,
দার্শনিক পরস্পরে দোষাদোষি করে॥
সে সব বিবাদ, যুক্তি, জল্পনা, কল্পনা,
বুঝাইয়া দাও মোরে কা'র আরাধনা॥





বিংশ পরিচ্ছেদ।

দার্শনিকের ইতিবৃত্তে দর্শনালোচনার আবশ্যক। রচিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ। বঙ্গসাহিত্যে সমাদর। তাহার উন্নতি অবনতির আলোচনা। ছন্দের বিশেষ নিয়ম। নব্য ও প্রাচীন বঙ্গ কবিগণের প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহানুভূতি। অবৈধ সাহিত্য-সমালোচনায় অপকারিতা। জীবনচরিতে স্বাধীন মত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা। ভট্টপল্লীতে পূর্ব্বাপর বঙ্গ-কবিতার আদর। উপন্যাস সম্বন্ধে মত। পুরাণাদির প্রতি অযথা কটাক্ষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

আমরা এই গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক-বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম, উহা এই গ্রন্থের পক্ষে কোনও রূপ অনুপযোগী বলিয়া বোধ করি না। রাজ-জীবনচরিতে রাজনৈতিক-চিত্রণ, বীরের ইতিবৃত্তে যুদ্ধ-বিবরণ যেমন প্রয়োজনীয়, শাস্ত্রসঙ্কুল ভারতে দার্শনিক-শক্তি শাস্ত্রতত্ত্বে কত কৌশল প্রদর্শন করাইতে পারে, দার্শনিকের জীবনে তাহা দেখান সেইরূপ প্রয়োজনীয়, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এ কারণ, বঙ্গভাষার সাধারণ-পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে কি না, এ বিচার না করিয়া

শাস্ত্রজ্ঞগণের প্রতি দৃষ্টি করতঃ কতকটা শাস্ত্রীয় কথা এই গ্রন্থে সমাবেশিত করিতে হইয়াছে, এবং অনন্যোপায় হইয়া কতকগুলি সংস্কৃত ও বৈদিক ভাষা উল্লেখ এবং দার্শনিক সংজ্ঞাপর শব্দও স্থানে স্থানে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ভরসা করি, বঙ্গভাষার পাঠকগণের ইহাতে বিরক্তি হইবে না।

সকল জ্ঞানবান্ জাতির ভাষায়ই দুই শ্রেণীর গ্রন্থ আছে। এক শ্রেণী পাঠকের শক্তির অনুকূল করিয়া লিখিত। গ্রন্থের অনুকূলে পাঠকের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে অপরশ্রেণী সংকলিত। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ সাধারণ-পাঠকের প্রীতি সম্পাদনে অধিক উপযোগী; দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ অনেকস্থলে গুরূপদেশ-সাপেক্ষ। কিন্তু তাহা পাঠকের জ্ঞান-বর্দ্ধনা পক্ষে উক্ত প্রথম-শ্রেণীর গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক-কার্য্যকারী। বঙ্গভাষার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ অপেক্ষা, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থই অধিক পছন্দ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাষার পক্ষে উপকারী ভিন্ন অপকারী হইবে না, এই বিশ্বাসেও দার্শনিক বিচার-প্রক্রিয়া আমরা এই পুস্তকে যথাসম্ভব প্রকাশ করিয়াছি। তবে, যে সকল অব্যভিচারী নিয়মের দ্বারা দর্শন-শাস্ত্র, বিশেষতঃ ন্যায়দর্শন পরিচালিত, তাহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। শ্রুত্যর্থ লইয়া আজকাল অভিজ্ঞ বিষয়িলোকের মধ্যে অনেকে আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই বৈচিত্র্য-মাত্র এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল আবশ্যক-বোধে প্রকৃত-পথে শ্রুতিসমন্বয় হইয়াছে কি না, ইহা অভিজ্ঞগণের নিকট সপ্রমাণ করিবার জন্য পদার্থসাধক দুই চারিটী মাত্র তর্কানুমানের আকার ব্যাস-সূত্র ব্যাখ্যা-কালে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। সে গুলির ভিতর কি কি বস্তু আছে, ইহা জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় বঙ্গভাষার একজনও পাঠক

যদি যোগ্য-ব্যক্তির উপদেশ অপেক্ষা করেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান-বৃদ্ধিরই হেতু হইবে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠিনতর দার্শনিক-সামগ্রী বঙ্গভাষায় প্রকাশ পাইবে। বঙ্গদেশের ন্যায়দর্শন উৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া দেশবাসীর মধ্যে অনেকের ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু কেন উৎকৃষ্ট, তাহা সকলে হয়তো জ্ঞাত নহেন। ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা বঙ্গভাষার পাঠকগণের একান্তই কর্ত্তব্য। কারণ, দেশের গৌরববর্দ্ধক সামগ্রীর মহিমা সেই দেশবাসী প্রত্যেকে বুঝিতে শিক্ষা না করিলে দেশের গৌরব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই স্থলে অপর একটী কথা আমাদের বক্তব্য আছে। অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন দৃষ্টে ন্যায়রত্ন-মহাশয়কে কেহ যেন শঙ্করাচার্য্যের বিদ্বেষী বলিয়া স্থির না করেন। দার্শনিকেরা জ্ঞাত আছেন, যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তিনি সে সম্প্রদায়ের বিরোধি-মত খণ্ডন করিতে হইলে সম্পূর্ণ বিপক্ষতার ভান অবলম্বন করিয়াই সে কার্য্য করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্যকেও গৌতম-কণাদাদি মহর্ষিগণের উপর পর্য্যন্ত কটাক্ষ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই, ঋষিরা বা ঋষিকল্প-ব্যক্তিরা যে বিভিন্ন দর্শনের স্রষ্টা, সে সমুদয় দর্শনই উপকারার্থ রচিত হইয়াছে, ইহা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সর্ব্বদর্শন-বিষয়ে সার মীমাংসা। ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান দার্শনিক বিচারে হইতে পারে না। তাহা বহু তপস্যা-সাধ্য। গৌতম কণাদ বিবেচনা করিয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে যখন নানা তাৎপর্য্য বাহির করা যায়, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ যখন শ্রুতি-সাহায্যে বুঝিবার উপায় নাই, তখন শ্রুতির এরূপ তাৎপর্য্য আমরা উপদেশ করিব যদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায় উপাসনা বিষয়ে লোকের মতি দৃঢ় হইবে। 'সকলই ব্রহ্ম' এরূপ তত্ত্বকথা শ্রুতি হইতে বাহির

করা অপেক্ষা ভেদসিদ্ধিই তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনে অধিক উপযোগী জ্ঞান করিয়াছিলেন। জৈমিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ ইহা স্থূলভাবে প্রায় সকলেরই জ্ঞান আছে। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে জ্ঞান আমি যদি যাগ-যজ্ঞ-মন্ত্রাদিতে করাইয়া দিতে পারি, তবেই জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' করিয়া বিপথে পরিভ্রমণ করিলে কোনও ফলই হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "মন্ত্রই ব্রহ্ম। আর ব্রহ্ম নাই জানিও।" তিনি বিধিপ্রত্যয়-ঘটিত শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন। এবং তদনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতির তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিলেন। যেরূপ ভাবে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিলে কোনও অনিষ্ট হইবে না, অথচ জীবের প্রকৃত উপকার হইবে, সকল আর্য্যদর্শনকারই তদুপযোগী দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিগণের কোন্ কার্য্য কি ফল উৎপন্ন করিতেছে স্থূলবুদ্ধি বশতঃ আমরা তাহা না বুঝিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের সৎকার্য্যের উপকারিতা কোনও না কোনও বিষয়ে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিশ্চয়ই সাধিত হইতেছে। ঋষিকল্প-শঙ্করাচার্য্যও সেইরূপ কোন' সদুদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিয়া থাকিবেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইহাই বিভিন্ন আর্য্যদর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ-মীমাংসা। কিন্তু সমাজে তিনি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ন্যায়শাস্ত্রেরই পরিপোষ্টা হইতে বাধ্য। সুতরাং অদ্বৈতবাদী মহোদয়গণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিতে পারেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় 'অদ্বৈতবাদখণ্ডন' নামক গ্রন্থ ব্যতীত, তত্ত্বসার জীবতত্ত্ব-নিরূপণ ও শক্তিবাদ-রহস্য নামক আরও তিন খানি দার্শনিক-গ্রন্থ এবং রসরত্ন ও কবিতাবলী নামে দুইখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'অদ্বৈতবাদখণ্ডন' এবং 'জীবতত্ত্বনিরূপণ' অদ্যাপি মুদ্রিত

হয় নাই। অপর চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া পূর্ব্বে অধ্যাপকসমাজে বিতরিত হইয়াছিল। এই ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত বিদ্বৎসভায় আলোচনার উপযোগী অনেক পূর্ব্বপক্ষ, শাস্ত্রীয় গূঢ় সন্ধান, জটিল বিষয়ের মীমাংসা, বহু প্রচলিত মীমাংসায় দোষোদ্‌ভাবন পূর্ব্বক সুষ্ঠু ভাবে তাহার সমাধান, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ন্যায়রত্ন মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিজ ছাত্রদিগের মধ্যে সেই সকল গূঢ় বিষয়ের আলোচনা করাইয়া থাকেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের প্রতিও বিশেষ যত্ন আছে। ছাত্রগণের অধ্যাপনা শেষ হইলে, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে যে সময় তিনি বন্ধুগণের সহিত বিশ্রাম করেন, সেই সময়ে বাঙ্গালা উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকসমূহ ছাত্রেরা তাঁহাকে শুনাইয়া থাকে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রও নিয়মিতরূপে ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রবণ করেন। ভাল বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা পাইলে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। তিনি বলেন, দেশীয় সংবাদপত্রগুলিই বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে আধুনিক রুচি অপেক্ষা প্রাচীন রুচির পক্ষপাতী। গদ্যাংশে বঙ্গসাহিত্য যে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার মত-দ্বৈধ নাই। বালক-সাধারণে সুস্পষ্ট মনোভাব লিপিবদ্ধ করিতেছে, ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ সকলই তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, বাঙ্গালা কবিতায় পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বহু সৌষ্ঠবহানি হইয়াছে।

তিনি বলেন, ভাবাংশে নির্ভর করিলেই কবিতা হয় না। অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করাও ছন্দোময় শরীরের তাৎপর্য্য। কবিতা-

সুন্দরীর অঙ্গ-শোভা প্রকৃত কবির হৃদয়ে এতই জড়িত থাকে যে, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র অক্ষরের ইতরবিশেষে নহে, অনাকাঙ্ক্ষিত অঙ্গে বিরাম, অনুচিত অঙ্গে বিরাম-হানি, অসঙ্গত যতি-বিশ্লেষণ প্রভৃতি সংঘটিত হইবা মাত্র, প্রকৃত কবি মর্ম্ম-ব্যথা অনুভব করেন। গদ্য যেমন ভাবগত বিরাম অপেক্ষা করে, ছন্দের তেমনি অঙ্গগত বিরামেরও আবশ্যক আছে। কি মিত্রাক্ষর, কি অমিত্রাক্ষর, সকল ছন্দেই অঙ্গগত শব্দাকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা করিয়া কবিকে চলিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গকবি মাইকেল মধুসূদনের কাব্যও, ছন্দোগত এই সকল গুণ হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। এক ভাষার অনুকরণে ভাষান্তরে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। পূর্ব্বে কোন' কোন' সংস্কৃত-পণ্ডিত সংস্কৃত-কাব্যের অনুকরণে 'স্রগ্ধরা' 'শার্দ্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি ছন্দে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা-কবিতা রচনা করিতেন। তাহা অশ্রাব্য হইত। বাঙ্গালা ছন্দের শব্দগত বিরাম চতুর্দ্দশ অক্ষরেও সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে ছন্দে অষ্টমাক্ষরের পর অঙ্গগত বিরামের প্রায়শঃই প্রয়োজনীয়তা আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, অনেক প্রাচীন ছড়া ও বঙ্গকবি হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' প্রভৃতি কবিতায় 'হসন্ত' ও 'অজন্ত' হিসাবে ধরিলে, অক্ষরের ন্যূনাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হওয়ায় তাহাতে ছন্দঃপাত নাই। পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট পাঁচালির চলন ছিল। তাহা 'শ্রাব্য-কাব্যের' অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। যেহেতু, ছন্দের অনাকাঙ্ক্ষিত অংশে উচ্চারণ-গত এমন বিশ্লেষ রাখিয়া, এবং আকাঙ্ক্ষিত-অংশে হসন্তোচ্চারণাদির দ্বারা অতিরিক্ততার ও প্লুতোচ্চারণাদি দ্বারা ন্যূনতার পরিহার পূর্ব্বক, এমন সুন্দর ভাবে ঐগুলি শুনান হইত যে, ছন্দঃপাত-জন্য বেদনা কাহাকেও অনুভব করিতে হইত না।

কিন্তু পাঠ্যকাব্যে ছন্দোগত সকল গুণই পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে। অতএব চতুর্দ্দশ অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া প্রতি ছত্রে বসাইয়া গেলেও, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অযথা স্থানে ছন্দঃপরিসমাপ্তি হইয়া না পড়ে এমন ব্যবস্থা করা উচিত। মিত্রাক্ষর ছন্দের পরিশেষে শব্দালঙ্কারের অনুরোধ থাকায়, আবৃত্তি-কালে শব্দগত সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করাইয়া, অর্থকালে অর্থগত আকাঙ্ক্ষা অন্বেষণ করা হইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষরে সে অনুরোধ না থাকায়, অর্থগত আকাঙ্ক্ষার বিরামেই শব্দগত বিরাম লইবার নিয়ম। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, মাইকেল যদি গণিয়া গণিয়া এক এক ছত্রে চতুর্দ্দশ অক্ষর রাখিয়া ছত্র-বন্ধন করার পরিবর্ত্তে, কবিতা-সুন্দরীর যে কোনও অবয়ব গ্রহণ করতঃ শব্দগত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করাইয়া অর্থগত বিরাম স্থাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বরং ছন্দোবন্ধন হইত।

কেহ কেহ মধুসূদন প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়, ঐ ভাবে শব্দাকাঙ্ক্ষার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু মধুসূদন যে নিয়মে অক্ষর-বিন্যাস করতঃ যে ভাবে ছেদ-সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত পাঠকগণের পাঠ অনেক-স্থলে স্বীয় কল্পনাপ্রসূত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অমিত্রাক্ষরে যাহাতে ছন্দোগুণ বর্ত্তে, তদ্বিষয়ে বরং নাটককার গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অধিক লক্ষ রাখিয়াছেন দেখা যায়। যেহেতু, তাঁহারা চতুর্দ্দশ-অক্ষরে নামমাত্র অঙ্গবদ্ধ করিয়া সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই ভিতর অযথা নিয়মে ছন্দঃপরিসমাপ্তি করিবার পরিবর্ত্তে, শব্দগত আকাঙ্ক্ষার সহিত যাহাতে ছন্দোময় অংশের বিরাম সংসৃষ্ট থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর-রচয়িতৃগণের পক্ষে এ অংশে দৃষ্টি রাখা একটী প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে। এতদ্ব্যতীত কোন্ বিষয়ে ঈদৃশ

বন্ধন অধিক কার্য্যকারী হইবে, কোন্ বিষয়ে অন্ত ছন্দের প্রয়োজন, কোন্ বিষয়ে গম্ভ উপযোগী, রঙ্গমঞ্চে তাহারও তাঁহারা ব্যবহার দেখাইয়াছেন। তবে, সাহিত্যের উন্নতির জন্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন উৎসর্গ করার পরিবর্ত্তে, অনেক সময় পরমুখাপেক্ষী হইয়াই এই সম্প্রদায়কে কার্য্য করিতে হইয়াছে। একারণ, ছন্দোময় অবয়বের পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল তাঁহারা সকল স্থানে সমাবেশিত করিতে পারেন নাই। ছন্দে নাটক লিখিবার আশায় বালকেরা যেমন ছন্দোগুণ-বিশিষ্ট বন্ধনের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছ ছত্রবন্ধন মাত্র করিয়া থাকেন, উক্ত নাট্যকার সম্প্রদায়কে নানা স্থানে সেইরূপ করিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, আমরা এ স্থলে ছন্দোবিষয়ক যে নিয়মের উল্লেখ করিলাম, ছন্দের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে এ অংশও আলোচ্য, ন্যায়রত্নমহাশয়ের ইহাই মত। কেবল এই অংশের উৎকর্ষ অপকর্ষই যে কাব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্দ্দেশ করিবার অধিকারী, ইহা তিনি বলেন না। আত্মশক্তির বিশেষত্ব দেখাইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি যাহার নিকট যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, শক্তিগত তাঁহার বিশেষত্ব সেই আসনই তাঁহার জন্ম রক্ষা করুক, এ সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছুমাত্র বিবাদী নহেন। অতএব আবশ্যকবোধে অংশবিশেষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত লিপিবদ্ধ করা হইল বলিয়া, মধুসূদনের উপর তিনি উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন, ইহা যেন কেহ না মনে করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় গুণের মর্ম্মগ্রাহী। হেমচন্দ্রের আর্থিকতা, মনীষিতা, চরিত্রসৃষ্টি ও ভূরিদৃষ্টি সহ বর্ণনা-পারিপাট্য, বহুচরিত্রে নবীনচন্দ্রের তেজস্বিতা ও উদারতা-সৃষ্টি, বহুস্থানে রবীন্দ্রের হৃদয়বত্তা, এ সকলেরই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, তিনি প্রাচীন রুচির পক্ষপাতী বলিয়া কস্মিন্‌কালেও প্রকৃত গুণের অবজ্ঞাতা নহেন।

কিন্তু তিনি যথেচ্ছতার অবজ্ঞাতা। অভিজ্ঞ হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গসাহিত্য-সেবীরা অনেকে এক্ষণে ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম বিভ্রাট্ বাধাইয়া কবিতাদি রচনা করিয়া থাকেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সে সকল রচনার উৎসাহদাতা নহেন। একদা সেইরূপ ভাবে রচিত কতকগুলি কবিতার শোভা সন্দর্শন করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বঙ্গভাষার উন্নতিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকটী রচনা করেন।

त्वां संसेव्य नवीन-काव्य-रचना नव्यापि सेवाङ्गना
क्षीणस्थूलतयातिदुष्टचरणा हीना सुवर्णादिना ।
नोवालङ्करणं जलोदरमिव स्थूलं तदीयोदरं
तत्तां भोक्तुमहं कदापि न यते भो वङ्गभाषोन्नते ॥

মর্ম্মার্থ।

বঙ্গভাষা-সেবকের পাইয়া রচনা
কবিতা-ললনা কিবা হয়েছে নবীনা!
হায়, কিন্তু বামা-অঙ্গে করি নিরীক্ষণ
কোথাও হয়েছে সরু, ফুলেছে চরণ!
গাত্রে নাহি সে স্থবর্ণ অলঙ্কার আর,
স্ফীতোদর, ঘটেছে বা উদরী তাহার!
আহা নব্যা নারী, তবু সম্ভোগেতে মতি
নাহি হয়, হায় বঙ্গভাষার উন্নতি!!

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যেরূপ মত লিখিত হইয়াছে, বঙ্গকবি হেমচন্দ্রের অভিপ্রায়ও শেষাবস্থায় ঐরূপই হইয়াছিল। শেষাবস্থায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ ব্যবহার করিতেন না। কাশী-

ধামে অবস্থান কালে, দেখিবার জন্য ন্যায়রত্ন-মহাশয়কে তিনি নিজের একখানি গ্রন্থাবলি প্রেরণ করেন। তাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দোঘটিত অংশসমূহ বাদ দিয়া, যে যে স্থানে অর্থিকতা সহ ছন্দঃপারিপাট্য প্রকাশ পাইয়াছে, কাব্যের সেই সেই অংশ এবং 'বাজিমাৎ' 'ভারতোদ্ধার' প্রভৃতি খণ্ড-কবিতা সকলই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান। শব্দাকাঙ্ক্ষার সহিত যোগা-যোগ করিয়া বিরাম সংস্থাপন না করিতে পারিলে, চতুর্দ্দশ অক্ষরে ছত্র সাজান বিফল, এ বিষয়েও তাঁহার অনুমোদন দেখা গিয়াছিল। শাব্দিক-আকাঙ্ক্ষায় ও বিরামে সম্বন্ধ রক্ষা করতঃ একখানি নাট্যকাব্য রচনা করিয়া, কোনও গ্রন্থকার হেমচন্দ্রকে শুনাইবার জন্য কাশীধামে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। অমিত্রাক্ষরের ঐরূপ বন্ধনে তিনি তৎকালে অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঘটনাবৈচিত্র্য অপেক্ষা, ভাষা ভাব ও বর্ণনাগত-বৈচিত্র্যেরই ন্যায়-রত্ন মহাশয় অধিক পক্ষপাতী। ঘটনাগত-বৈচিত্র্যের প্রভাবে যে সকল পুস্তকের প্রভাব পরিব্যাপ্ত, ঘটনাবলী জ্ঞাত হওয়ার পর সে সকল পুস্তক লোকে সর্ব্বদা আর অধ্যয়ন করে না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে যে গ্রন্থের উৎকর্ষ সিদ্ধ, তাহার অনেকাংশ লোকে মুখস্থ না করিয়া থাকিতে পারে না। দাশরথি, রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামবসু, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতির রচনা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ের রুচি অপেক্ষা প্রাচীন রুচিরই ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু অধিক পক্ষপাতী। এরূপ সমালোচনা সেই রুচিরই ফল বলা যাইতে পারে।

লৌকিক-ভাবে ঘটনাবলী বর্ণনা অপেক্ষা, পারমার্থিক-বর্ণনারই ন্যায়রত্ন মহাশয় অধিক পক্ষপাতী, এবং ভাবের মধ্যে বাৎসল্যভাব ও

ভক্তিভাবের বর্ণনায় তাঁহার সমধিক অনুরাগ। এ কারণ, আদিরসের গ্রন্থে অথবা বর্ত্তমান উপন্যাসাদি পাঠে তিনি যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন, ৺দাশরথি প্রভৃতির পাচালী শ্রবণে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ করেন।

সমালোচক-হিসাবে ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী। সাধারণের সহিত কোনও বিষয়ে তাঁহার মতের অনৈক্য হইলে, তিনি আত্মমত গোপন করার পরিবর্ত্তে, ক্ষুদ্র কবিতা যোগে এমন সরস ভাবে স্বরূপ বর্ণনা করেন যে, প্রবীণ অভিজ্ঞগণের চক্ষে তিনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রতিভাত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের ছন্দোবিবর্ষিণী প্রতিভা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কুহক অর্পণ করিতে পারে নাই। একদা কতিপয় যুবক তাঁহার বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্য তাঁহাকে 'মেঘনাদবধ' কাব্য শুনাইতে বসে। কিছুক্ষণ শুনিলে পর তাহারা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় অধিক কথা না বলিয়া, হাসিতে হাসিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।

নব্যাং মধুধ্বনি সুসজ্জিত পাদযুগ্মাং
বিস্মায় বঙ্গকবিতাং নবসভ্যসেব্যাং।
একত্র নূপুরমিতাং বলয়ং পরত্র
পাদে চ নদ্ধনবতীং যুবতীং স্মরামি॥

মর্ম্মার্থ।

দু'চরণে আজি হায় বঙ্গ-কবিতার
মরি কি মধুর মিল মধুর বাহার!

নব-রূপ ধরিয়াছে নব-ভাবনায়,
নব-সত্ত্যে সেবা করে, প্রাচীনে না চায়!
চরণের শব্দে হয় কতই স্মরণ ;
একবার এক নারী করে' আগমন,—
এক পা বালায় শোভে, এক পা নূপুরে,
নেচে গিয়াছিল বামা, মনে পড়ে তারে!! *

একজন সংস্কৃতভাষা-সেবী নৈয়ায়িক-পণ্ডিতের বঙ্গভাষায় যত্ন দেখিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভট্টপল্লী জন্মস্থান। ঐ পল্লীতে বহুকালাবধি সংস্কৃতভাষার উন্নতির সহিত বঙ্গ-ভাষারও চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। দুই একজন নিপুণ বঙ্গভাষার কবিও ঐ স্থানে অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। আমাদের সামান্য জ্ঞানে, ঐ কবিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশেষত্ব ছিল। সেই হেতু, কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা পূর্ব্বোক্ত-শ্রেণীর কবির মধ্যে ৺আনন্দচন্দ্রশিরোমণি মহাশয়ের রচিত দুই একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, পাঠকের কবিতাগুলি পাঠকালীন বিরক্তি হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণেরে অবলম্বন করিয়া কবি লিখিয়াছেন,

পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার জীবজন্তু সবাকার
করিতে পরম উপকার,

* মিত্রাক্ষর ছন্দের উভয় চরণে শব্দের মিল থাকে। সেই মিলগুলিকে মধুসূদন-দত্ত কবিতাসুন্দরীর নিগড়রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-পাঠকগণ সেরূপ না বুঝিয়া ঐ মিলগুলিকে কবিতার অলঙ্কার বলিয়া বিশ্বাস রাখেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইহাই যে ইচ্ছা, কবিতাটীর দ্বারা ফলতঃ তাহাও উপদেশ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণরূপে অবতার দীনবন্ধু গুণাধার,
ধরি' মনোরঞ্জন আকার!
দৃষ্টি-পথে এলে ব্রহ্ম যোগী ছাড়ে যোগধর্ম্ম,
রাজ্যকর্ম্ম ছাড়িলেন যম,
ধর্ম্মিষ্ঠ হইল পুষ্ট, তাপিতের গেল কষ্ট,
নষ্ট হ'ল নাস্তিকের ভ্রম!
সাধু সবে করে' যুক্তি সার করে কৃষ্ণভক্তি,
মুক্তি হ'ল দাসীর সমান,
শুধু ভক্তিভাবে নয় কতজন ভবে লয়
কত ভাবে ভাবিয়ে নির্ব্বাণ!
জরাসিন্ধু আদি জন বৈরিভাবে দিল মন
স্নেহভাবে নন্দ নন্দরাণী,
বৃন্দাবনে যত রাখাল সুহৃদ্ভাবে ভেবে গোপাল
পরকালে পেলে চক্রপাণি!
এইরূপে কত ভাবে কত জন মাধবে ভেবে
মরে' ভবে নাহি এল আর
গোপিকা ভেবে অন্তরে কাম-ভাবে শ্রীনাথেরে
ব্রহ্মভাব পেলে সারাৎসার!!

* * *

সুহৃত্ত-প্রিয়া দূতীর উক্তি—

শুনেছি সই প্রেম সিন্ধু, নাহি তার কূল,
অকূলে ভাসিবে সখি হইবে আকুল!
গুরুজনার গঞ্জনা তার তরঙ্গ তুফান,
আতঙ্কে কাঁপিবে অঙ্গ হারাবি পরাণ

অতলস্পর্শ তার পরের মন রাখা,
সেখানে সাতার ভার, ভার বেচে থাকা!
প্রেমসিন্ধু জলে অঙ্গ না হবে শীতল,
বিরহ-বাড়ব তাহে প্রবল অনল!
সুধার সমান বটে আঁখির মিলন,
কলঙ্ক-বিষেতে বেড়া, না হবে গ্রহণ!

*　　*　　*

শ্রীরাধার উত্তর—

তুমি সই সুবোধ হ'য়ে অবোধ হ'লে হায়,
আমার কি আর সে বোধ আছে, প্রবোধ দিবে কা'য়?
কুলশীলে আমার কি সই তোমার যত্ন বেশি,
সাধে কি প্রমাদ-সাধ করি গো রূপসি?
আগে অমন ভাব্‌তেম কত, মন ছিল সই বশ,
আপ্‌নার আপ্‌নি নয় তো এখন, রয় কেমনে বশ'?
পরে সবি ব'ল্‌তে পারে না জেনে পরের প্রাণ,
পরের পিপাসা পরের না হয় অনুমান।
কি জ্বালা অন্তরে দূতি জানাব কেমনে,
অঙ্গ জ্বলে' যায় হায়, সে অঙ্গ বিহনে!
ইচ্ছা করে পাখী হ'য়ে শূন্যে উড়ে যাই,
শ্যামরায় কোথা হায়, কিরূপেতে পাই!
ইচ্ছা করে সাগর-পারে করি সই গমন,
ইচ্ছা করে সাগর ছেঁচে তুলি সে রতন!
ইচ্ছা করে হারে তারে গাথিয়া সজনি
হৃদয় মাঝারে রাখি দিবস-রজনী!

ইচ্ছা করে কুঙ্কুমে তায় মিশাইয়া মাখি
ইচ্ছা করে কাজল ক'রে কালার চোখে রাখি।
ইচ্ছা করে বুক বিদরে' বাহির করে' প্রাণ,
প্রাণের স্থানে রেখে তারে ত্যজি আপন প্রাণ!
ইচ্ছা সেই জলধরে ধরিয়া সজনি
প্রেমজলেতে শীতল করি জ্বলন্ত পরাণী!
ইচ্ছা করে শ্যামশরীরে মিশাইয়া যাই,
তবে তো বিচ্ছেদ খেদ সকলি এড়াই!

* * *

দূতীর পরিহাস—

করবি কি সই, কুলবতী করেছে বিধাতা,
অন্তরে মিশাতে হবে অন্তরের ব্যথা!
কুলবতী জনার এমন ইচ্ছা ক'ত্তে নাই,
ইচ্ছা তুচ্ছ কর' নইলে ঘটিবে বালাই!
কুলবতীর প্রেমে ইচ্ছা, দীনের ইচ্ছা ধনে,
বামনের চাঁদ ধ'ত্তে ইচ্ছা, পঙ্গুর ইচ্ছা রণে!
কুজোর ইচ্ছা চিৎ হ'য়ে শোয়, খোড়ার ইচ্ছা ছোটে,
বোবার ইচ্ছা কথা কয়, সতত মুখ ফোটে!
কালা করে শুনতে ইচ্ছা, কাণার ইচ্ছা চায়,
ইচ্ছা ক'রলে করবি কি সই বিধি বাদী তায়!
মূর্খের ইচ্ছা মান বাড়াতে, দুঃখীর ইচ্ছা সুখ,
চোরে করে ধর্ম্ম ইচ্ছা, সে কেবলি চুক!
দাঁড়ের পাখী ইচ্ছা করে উড়ে যায় কানন,
সে যেমন বোঝে না পায় কঠিন বন্ধন!

তেমতি সুন্দরি তোরে কুলের কুলুপ
বিধাতা দিয়াছে, তারে কেটিবে কিরূপ?

* * *

অভিসারোদ্যতা নায়িকার প্রতি সখীগণের রহস্য—

একি ধনি! বিনোদিনি! দেখালি নতুন,
ভাল ভাল ভালবাসায় হয়েছ নিপুণ!
সরোবর অগ্রসর পিপাসার কারণ,
ভ্রমরের অন্বেষণে পদ্মিনীর ভ্রমণ!
চকোরেরে সুধা দিতে ভূমে নাম্‌ল চাঁদ,
নদ-নদীর কাছে যেতে সমুদ্রের সাধ!
চাতকে দেখিতে মেঘের উৎকণ্ঠিত মন,
যাচকেরে যেচে বেড়ায় অমূল্য-রতন!
লৌহ-সন্নিধানে ধায় অয়স্কান্তমণি,
নারী যায় পুরুষের কাছে তেমতি বাখানি!! †

বঙ্গদেশের প্রধান উপন্যাস-লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বিষয়ে লেখনী-চাতুর্য্যের ন্যায়রত্ন মহাশয় সুখ্যাতি করেন। তবে উপন্যাস-গ্রন্থ সকল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চক্ষে তাদৃশ হিতকর নহে। উপন্যাসে কথঞ্চিৎ উপদেশের আভাস আছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, উপন্যাস বালক-বালিকাগণকে অনেকক্ষেত্রে এমন একটী স্থানে পৌছিয়া দিতে চাহে, যে স্থানে পৌছিলে কোনও জাতি অতি উচ্চ-স্থানে উঠিল ভাবিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে পারে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় নর-নারীগণের পক্ষে সে স্থানে উপনীত হওয়া আরো অনেক উচ্চস্থান

† পাচালীতে অক্ষরের ন্যূনাধিক্য বিষয়ে যাহা বক্তব্য, বলা হইয়াছে।

হইতে নিম্নে নামিয়া আসা ব্যতীত আর কিছুই, নহে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায়, পুরাণের কৌশলপূর্ণ উপদেশ বড় হিতকর। তাঁহার বাল্যাবস্থায় স্ত্রীলোকগণকে ঐ সকল উপদেশপূর্ণ পুরাণাদি পাঠ করিতে দেখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সে রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রী-সমাজে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, মহাভারত পুরণাদি গ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়াছে। এখনকার নব্যা স্ত্রীলোকগণের হাতে প্রায় বঙ্কিমবাবুর বা অপর কোন' উপন্যাস-লেখকের গ্রন্থ আছেই। আবার কেবল তাহাই নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিয়া স্ত্রীলোকগণ কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করিতে বসে, এবং উক্ত পুস্তকের উপদেশানুসারে মহাভারতাদি গ্রন্থে কতপ্রকার দোষ বাহির করিয়া থাকে। ইহা লক্ষ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মনে হয়, বঙ্কিমবাবু যদি উপন্যাস-লেখা সমাপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহাহইলে বড় ভাল হইত। ইহাতে তাঁহার গৌরব অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকিত। পাঠক, একবার চিন্তা করিবেন, যে মহাভারত ও ভাগবত হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে ব্রহ্মদেশের সীমা পর্য্যন্ত, বিশাল হিন্দু-ভূখণ্ডে হিন্দু নর-নারীগণ স্বর্গসাধক ও মুক্তিপ্রযোজক বোধে পাঠ করিয়া থাকেন, যে গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষর আপামর জ্ঞানী ভক্তিপূতচিত্তে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া, "পুণ্য সঞ্চয় করিলাম" এই জ্ঞানে কৃতার্থ ও ধন্য হন, আত্মবুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ হইলেই সেই মহাভারত ভাগবতাদি গ্রন্থকে কথায় কথায় "আষাঢ়ে" "ঔপন্যাসিক" "রূপক" "অসঙ্গত" "অপ্রকৃত" "অতিরঞ্জিত" ইত্যাদি যথেচ্ছ বাক্যে বিদ্রূপ করা, হয় বিধর্ম্মী, না হয় বাতুলের কার্য্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে কোনও কালেই প্রস্তুত নহেন।

সেইজন্য আমরাও এই গ্রন্থের সমালোচনা করিব না। তবে, আবশ্যক-বোধে সাধারণ দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

নিজের বুদ্ধিতে সঙ্গত বোধ হইলেই তাহা ঋষিকৃত, এবং নিজের বুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ হইলেই তাহা প্রক্ষিপ্ত, যুক্তিপরায়ণগণের এই যুক্তিতে নির্ভর করা উচিত নহে। প্রক্ষেপকারেরাও আমাদেরই ন্যায় লৌকিকবুদ্ধিসম্পন্ন। যেরূপে প্রক্ষেপ করিলে লৌকিকবুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ না হয়, কেহ কিছু প্রক্ষেপ করিলে সেইরূপেই ঐ কার্য্য করা সম্ভব। কারণ, ধরা পড়িবার জন্য কেহই প্রক্ষেপ করে না। অতএব লৌকিক-বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত বোধ হয়, প্রক্ষিপ্ত থাকিলে তাহার ভিতরেও থাকিতে পারে। যখন লোকবুদ্ধির অতীত কার্য্যাবলী বর্ণনা না করাই তাহাদের পক্ষে অধিকসম্ভব, তখন অলৌকীক কার্য্যাবলী নির্ভীক মহর্ষিগণেরই রচিত, লৌকিক-যুক্তিপরায়ণগণের পক্ষে ইহাই তো বিশ্বাস করা উচিত। স্থূলকথা এই, স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাজন-পরম্পরার শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধায় দৃষ্টি করিয়া, দীর্ঘকাল শাস্ত্রমীমাংসা-রীতি অনুশীলন করিয়া এবং ধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া, তৎপরে ধর্ম্মগ্রন্থ মীমাংসায় হস্তার্পণ করা উচিত, ইহাই ন্যায়রত্ন মহাশয় বিবেচনা করেন। যদ্যুক্ত ক্ষুদ্র শব্দে পর্য্যন্ত অসামঞ্জস্য বাহির হইলে "শক্তি" "লক্ষণা" প্রভৃতি কত প্রকার মীমাংসা-কৌশল শাস্ত্রকারেরা প্রদর্শন করাইলেন, কিন্তু আত্মবুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ হইবা মাত্র, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিবার পদ্ধতি কোনও প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞই অবলম্বন করেন নাই।

দেবলীলা ও ঈশ্বরলীলা লৌকিক-বুদ্ধির অতীত। অলৌকিক-কার্য্যকারিত্বই ঐ সকল লীলার সৌন্দর্য্য। যোগবলে মহর্ষিরা ঐ সকল

জানিতে পারিতেন। এ কারণ, লৌকিক-বুদ্ধিতে যাহা অসঙ্গত মনে হয়, ঋষি-বুদ্ধিতে তাহা সঙ্গত। ভগবৎ-লীলাদিতে শ্রদ্ধা শিক্ষা দিবার জন্যই ঋষিদিগের জন্ম এবং মহাভারতাদি গ্রন্থের সৃষ্টি। শ্রদ্ধা যে কি অমূল্য গুণ, তাহা লিখিবার শক্তি আমাদের নাই। সেই শ্রদ্ধার যে মহাভারত-ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে উৎপত্তি, যে গ্রন্থাদি হইতে সেই শ্রদ্ধাস্রোতঃ বহির্ভূত হইয়া আর্য্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অসামঞ্জস্য বা প্রক্ষিপ্ততা দোষ অর্পণ করা যে কি ভ্রমজনক, তাহা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কল্পনায় আসে না। তিনি বলেন, আমি আজীবন ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অনুশীলন করিয়া অশীতিবর্ষে উপনীত হইতে চলিলাম, তথাপি কল্পনা করিয়াও বুঝিতে পারি না, মহাভারতাদি গ্রন্থের একছত্রেও অসামঞ্জস্য আছে কি না।

মহাভারতাদির উপর কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কেবল এই বৃদ্ধাবস্থারই কাতর, তাহা নহে। যাবৎকাল কৃষ্ণচরিত্র বা তাদৃশ গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে, তাবৎকাল তিনি দুঃখিত। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের উপক্রমে লিখিয়াছেন

> আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। * * *। তাই আমি ইয়োরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সব ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, * * তাঁহাদের আমি কিছু করিতে

পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় ও দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।

এইরূপে ইয়োরোপীয় মতের প্রতিবাদে ও ধর্ম্মগ্রন্থসংস্থাপনে ব্রতী হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, কোনও সময় তাহা শ্রবণ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "উপন্যাস-লেখায় এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদ্বেষে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ দক্ষ, ধর্ম্মগ্রন্থ-সংস্থাপনে সেরূপ কোনও দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের বাদি-নিরাসপ্রণালী এবং ধর্ম্মগ্রন্থ-সংস্থাপন-কৌশল কিরূপ হাস্যজনক, ন্যায়-রত্ন মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকগুলির দ্বারা তাহা সম্যক্ রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

तृप्तिस्तर्पणतो मृतस्य किमिदं सम्भाव्यते धीमते-
र्मन्ये क्षिप्तचयेन शास्त्रनिचये प्रक्षिप्तमेतद्वचः।
तद्‌ भो वङ्गगता भवन्तु भवतामास्था हि शास्त्रोदिते
शास्त्रस्त्वेदमितिप्रबोधविधुरं जानीत गौरं नरं॥

মর্ম্মার্থ।

মর্ত্ত্যে ব'সে জল ঢেলে করিছ তর্পণ
পরলোকে সুখী হবে মৃতব্যক্তিগণ,
এ কথা মনেতে মোর না লয় সঙ্গত,
শাস্ত্রেতে প্রক্ষিপ্ত ইহা ক্ষিপ্তের রচিত।
হেন সুমীমাংসা যদি রহিয়াছে তবে,
আর কেন? শাস্ত্রে তবে শ্রদ্ধা কর সবে।

৩৯

না লইও কভু আর যুক্তি বিলাতীয়,
আছে কি মীমাংসা-বোধ পাশ্চাত্য-জাতির ?

মৃৎপিণ্ডেষু দৃষদসু দেবযজনং বহ্নৌ হবিঃক্ষেপণং
কিং স্বর্গাদি দদেশ্বরং বিধিবচঃ প্রক্ষিপ্তমেতৎপরং।
তদ্ভো বন্ধুগণা ভবন্তু ভবতামাস্থা হি শাস্ত্রোদিতে
শাস্ত্রঞ্চেদমিতিপ্রবোধবিধুরং জানীত গৌরং নরং॥

মর্ম্মার্থ।

মৃত্তিকা-প্রস্তরে কর দেবতা-অর্চ্চন
বহ্নি মাঝে করিতেছ হবিঃ-বিক্ষেপণ,
ইহা স্বর্গে তুলে দেবে বুদ্ধিতে না ধরে,
প্রক্ষিপ্ত নিশ্চয় ভবে, রচে ক্ষিপ্ত নরে।
হেন সুমীমাংসা যদি রহিয়াছে ভবে,
আর কেন ? শাস্ত্রে তবে শ্রদ্ধা কর সবে।
না লইও কভু আর যুক্তি বিলাতীয়,
আছে কি মীমাংসা-বোধ পাশ্চাত্যজাতির ?

কর্ত্তৃত্বং জগতাং করাদি-রহিতে ব্যাপারশূন্যেশ্বরে
যদ্বাক্যং বদতিস্ম বিস্ময়করং নো তস্য বেদাগতা।
তদ্ভো বিজ্ঞতমা ভবন্তু ভবতামাস্থা হি শাস্ত্রোদিতে
শাস্ত্রঞ্চেদমিতি-প্রবোধবিধুরং জানীত মূর্খাধমং॥

মর্ম্মার্থ।

নিরাকার ব্রহ্ম তিনি, হস্ত পদ নাই,
চেষ্টা নাই, স্রষ্টা তবু বলিতেছ ভাই।

যে জাতিই বল এই অসঙ্গত-বাণী
সুবিস্ময়কর ব'লে আমি মনে মানি।
অতএব শুন ভাই, প্রক্ষিপ্ত এ কথা,
যে যার শাস্ত্রেতে শ্রদ্ধা ছাড়িও না বৃথা।
শাস্ত্রের মীমাংসা-রীতি যে জাতি না জানে
মূর্খাধম সেই জাতি জেন' মনে মনে॥

ये भक्ताः श्रुति दूरदर्शिनि यथा, श्वेताङ्गदेशोद्भवे
नो सम्भाव्यमिदं वचो मम भवेत् तेषान्तु तोषास्पदं।
शिक्षासूक्ष्मधिया मया विरचिताद् भूयाच्चिवस्याच्छुभं
शास्त्रज्ञान-सचेष्ट-शिक्षित-सतां वङ्गस्थलीस्थायिनां॥

মর্ম্মার্থ।

শাস্ত্রে মোর যে বিশ্বাস বাল্যে নাহি ছিল,
শিক্ষা-গুণে একে একে সব উপজিল।
বিলাতী পণ্ডিত হ'তে যে বোধবিধুর,
সেবা করে লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর,
যে পূত মীমাংসা আমি করিলাম ভাই,
সে জন মানিবে ইহা, এ বিশ্বাস নাই।
জাতে আছে, ধাতে আছে, যে সকল লোক,
তাহাদেরি তরে মোর মীমাংসার শ্লোক॥

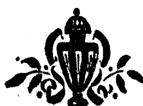
কৃষ্ণচরিত্রাদির ন্যায় গ্রন্থের ফলে, বালকেও সময়ে সময়ে ব্যাসের উপর কটাক্ষ করে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিতে আনন্দিত

হইলেও সময়ে সময়ে আক্ষেপের সহিত বলিয়া থাকেন, যে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির ফল ব্যাসের উপর বালকের কটাক্ষ, তাহার উন্নতি সর্ব্বাংশে মঙ্গলবিধায়ক নহে। নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার মনের সেই ভাবের ব্যঞ্জক।

বিদ্যাভ্যাসমপাস্য তাবকরসানাস্বাদয়ন্ মন্যতে
ব্যাসং ক্ষীণবলং গুরুং তৃণতুলং বালোঽপি কালক্রমাৎ।
বিদ্বাংশ্চ বিচরৈর্নরৈরিব পরৈঃ স্বাচার্য্যতা মাপ্যতে
গুর্ব্বত্বং গুরুতা গতা গুরুগতা হা বঙ্গভাষোন্নতে॥

মর্ম্মার্থ।

হায়! তব রস-পানে বিদ্যাচর্চ্চা ছেড়ে,
শিশুরা অবজ্ঞা করে ব্যাস-ভার্গবেরে!
মনে হ'লে কোন' কথা, প্রকাশিতে নাই,
কি বিদ্বান্, কিবা মূর্খ, আচার্য্য সবাই!
গুরুর গুরুতা আর খাটে না সম্প্রতি,
কি করিলে হায়, বঙ্গভাষার উন্নতি!!





একবিংশ পরিচ্ছেদ।

উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মানুষ্ঠাতা, অনধিকারী ধর্ম্মবক্তা,
বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের বিদ্বেষ্টা প্রভৃতির প্রতি
শ্লেষচ্ছলে ভূরি উপদেশ। প্রাচীন
ও আধুনিক সমাজের চিত্র।
উপসংহার।

ধর্ম্মকার্য্য-সমালোচক হিসাবে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, হিন্দুর কোনও অনুষ্ঠান যেন শাস্ত্রের সহিত অনৈক্য করিয়া সম্পন্ন করা না হয়। সন্ধ্যাপূজাদি-সকলনিত্যকার্য্য-বর্জ্জিত একটী বিষয়ী লোক, কোনও উপায়ে কিছু কিছু আসন-প্রাণায়ম শিক্ষা করিয়া অবৈধ সময়ে অতি অবৈধ-ভাবে ঐ সকল অনুশীলন করিতেন। কাশীধামে কোন' কোন' ভিক্ষুক, সন্ন্যাসি-বেশে ঐ সকল আসনাদি প্রদর্শন করাইয়া ভিক্ষার্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। স্ব স্ব অধিকার মতে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করার পরিবর্ত্তে, যাঁহারা অবৈধ-ভাবে ঐ সকল আসন-প্রাণায়ম অভ্যাসে ব্যস্ত, "কাশীখণ্ড" প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যাসদেব তাঁহাদের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,

কুত্র শ্রৌতবিধানধৌত-মনসো যোগো ধনং যোগিনাং
তদ্যোগঃ পরযোগ এব, নতু স শ্বাসাববোধাসনং।

श्रौताचारलवोऽपि यस्य विधिवत् सञ्चिन्तनं न क्वचं
नो किं मल्लवदेव कुम्भकविधौ मल्लादिवच्चासने ॥

মর্ম্মার্থ।

শ্বাসরোধ আসনাদি ক্রিয়া অবান্তর,
জানিও পরম-যোগ নহে ইহা নর!
যথাশাস্ত্র এ সকল করে' আচরণ,
জগতে নিষ্পাপ চিত্ত হইবে যখন,
ব্রহ্ম সনে সেই চিত্তে ঘটিলে সংযোগ
তাহাই পরম ধন, যোগীদের যোগ।
অনুষ্ঠানে নাহি ঐক্য শাস্ত্রের সহিত,
ব্রহ্মে ভাবে, চিন্তা কিন্তু বিধি-বিগর্হিত,
এ হেন অবৈধ-ভাবে যে মানবদল,
ক্রিয়া করে স্বেচ্ছামত ভবে অবিরল,
কুম্ভকে কুম্ভীর তা'রা লয় মোর হৃদে,
আসনেতে কস্তো করে পলোয়ান্ বেদে!!

এইরূপে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরিতাবলী অন্বেষণ করিলে জানা যায়, বহু উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যেই চিরদিন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছেন। এই যে অনাচারী, অভোজ্যভোজী, অস্পৃশ্য-ব্যক্তিগণ ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করতঃ, হিন্দুধর্ম্মবক্তা রূপে হিন্দুধর্ম্মোপদেশ করতঃ বহু লোককে ভুলাইতেছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহা একটা প্রহসন মনে করেন। ধর্ম্মোপদেশ করিতে হইলে তাঁহারা সদাচারী, সংযতাহারী, ত্রিকালীন আহ্নিক-পূত হোন, এই উদ্দেশ্যেই বোধহয় ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

त्यक्तं यत् सुरवृन्दवन्दनमपि त्यक्तं त्रिसन्ध्यादिकं
यत्तत् सह्यमभोज्यभोजनमतोऽप्यन्यत्त्वया यत् कृतं ।
सह्यं भ्रातरिदं सदा तव कदाचारा न दुःखप्रदाः
सोढुं किन्तु न शक्यते तव तु या दम्भेन वाचालता ।

মর্ম্মার্থ।

ছাড়িয়াছ দেব-সেবা, ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা,
তাহা সহ্য হয় প্রাণে, লাগে না বেদনা।
নিয়ত কতই কর অভোজ্য-ভোজন,
তাহাতেও প্রাণে আমি না পাই বেদন।
ছেড়ে যত অনুষ্ঠান, ঘোর কদাচারে
কাল যাপ' নিরন্তর, তা'ও নেত্রে হেরে
ওহে সুধী সহ্য হয় প্রাণে সমুদয়,
একটী আমার প্রাণে সহ্য নাহি হয়।
ধর্ম্ম উপদেশ ছলে তুমি দম্ভ করে'
বক্তৃতা করিয়া ঘোর' ভুলাইয়া নরে,
পাপ-মুখে বাচালতা শুনে অনিবার
প্রাণে বড় বাজে, হয় অসহ্য আমার!!

যাহারা বঙ্গীয়-বিদ্বৎসমাজ শিথিল করিবার জন্য আবির্ভূত, তাঁহাদের উপর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি আরও কর্কশ। সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের অস্থিমজ্জা দ্বারা যে অনুমানখণ্ডাদি প্রণয়ন করিয়া দেশীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ বঙ্গীয়-বিদ্বৎসমাজকে বজ্র-আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই অনুমানখণ্ডাদির উপর কোনও কোনও অল্পশিক্ষিত

আধুনিক ব্যক্তি এক্ষণে কিরূপ আক্রোশ প্রকাশ করেন, তাহার আভাস এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে আমরা দিয়া আসিয়াছি। স্বদেশদ্রোহী এই সকল ধৃষ্টব্যক্তিকে কথন কথন বলিতে শুনা যায় "অনুমান-খণ্ডটী অসার সামগ্রী। ইহা "ঘটত্ব" "পটত্ব" "অবচ্ছেদকতা" "নিরূপকতা" এই চারিটা কথা লইয়া গলাবাজি করিবার শাস্ত্র।" স্মৃতিশক্তি-প্রভাবে এই সকল শিক্ষাভিমানী আধুনিক-ব্যক্তি এক একটী জগন্নাথতর্কপঞ্চানন-বিশেষ। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ইংরাজি ভাষা না বুঝিলেও, একবার দুই সাহেবকে ইংরাজিতে পরস্পর গালি-বর্ষণ করিতে শুনিয়া আদালতে অবিকল সেই ইংরাজি কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছিলেন। তবে, তিনি বুদ্ধিবলে সমাজ বন্ধন করিয়া গিয়াছেন। নব্য-জগন্নাথতর্কপঞ্চাননদিগের তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাব বঙ্গীয়-সমাজকে সকল শাস্ত্রীয়-শক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে। বৃথা শিক্ষাভিমানী কুশিক্ষিতগণের স্বরূপ-বর্ণনা ন্যায়রত্ন মহাশয় একদা কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট বড় সুন্দর ভাবে করিয়াছিলেন। যথা,

ज्ञात्वार्थं पचभुङ्क्ष्वगच्छवचसां ये स्वं द्वितीयं गुरुं
मत्वा दर्शनतत्त्ववर्षणविधौ दृप्ताः पयोदव्रताः ।
विख्यातुं प्रभवन्तिरब्धिसुषमाः कूपस्थभेकैः समा
नो किन्ते नवभौमवर्व्वरनराः श्वेताङ्गसेवापराः ॥

মর্ম্মার্থ।

'পচ' 'ভুঙ্ক্ষ্ব' 'গচ্ছ' শব্দ ব্যাখ্যা করে' ভবে
মনে মনে আপনারে বৃহস্পতি ভেবে,
দর্শনের তত্ত্ববৃষ্টি করিবার আশে
যে জন বিরাজ করে পয়োধর বেশে,

হে সুবোধ! স্থিরভাবে ভাব' একবার
কা'র সনে তুলা মোরা দিতে পারি তার,
যেই ভেক বাস করে কূপের মাঝারে,
কভু সাধ্য নহে যার উঠিতে উপরে,
অনন্ত সাগর-শোভা সে বুঝিতে গেলে
তারি সনে একমাত্র যোগ্য তুলা মেলে।
সেবা-বিদ্যা শিক্ষা করে' আছ সেবা ল'য়ে
শাস্ত্র-তত্ত্বে ইচ্ছামত কি কাজ বকিয়ে?
'পচ' 'ভুঙ্ক্ষ্ব' 'গচ্ছ' এই তিন লয়ে থাক',
পাক কর, খাও, যাও, বাজে কথা রাখ।

सत्तर्कैः कविशिष्टयुक्तिनिचयैः संमथ्य शास्त्राम्बुधिं
वाचानालिकयार्पयन्तु कवयः कर्णेषु तत्त्वामृतं।
किन्त्वेतन्महदेव चित्रमधुना निःसारवाग्विस्तरै-
र्जानन् वक्तृगिरं नरस्तरति यत् तत्त्वप्रचारव्रती॥

মর্ম্মার্থ।

শাস্ত্রোক্ত-উপায়ে সৎ তর্ক-জাল ধরে'
শাস্ত্রকার-প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে,
সুগভীর শাস্ত্র-সিন্ধু করিয়া মন্থন,
এই ধরাতল মাঝে যে পবিত্র জন,
সরল বাঙ্গালী দিয়া ঢালিতে সক্ষম
পরকর্ণে তত্ত্বামৃত অতি মনোরম,
তত্ত্ব উপদেশ করা তারি শোভা পায়;
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ হ'তেছে ধরায়,

কোন' বস্তু নাই শুধু বাক্য-রাশি ঢেলে
শিখিয়া বাঙ্গালা-কথা তত্ত্ব-কথা বলে !!

सूते साधुसमादृतामृतफलं दुस्तर्क्यतर्काटवी
यस्यां दुर्ज्जय-घोर-सिंहनिचयः प्रीतः सदा क्रीड़ति।
यानं तत्र सुदूरतोऽस्तु न कदाप्याकर्णनं सम्भवे-
दाजीवं खलु खेलतां तनुभृतां काव्यादिकच्छीवने॥

মর্ম্মার্থ।

তর্করূপ যে বিষম দুর্গম অটবী
দেয় সাধু-সমাদৃত অমৃত-পদবী,
যে কানন আলোড়িয়া মহাসুধীগণ,
দুর্জ্জয় মৃগেন্দ্র রূপে করে বিচরণ,
কাব্য-আদি কচ্চী-বনে যেই জীবগণ,
ক্রীড়া ক'রে চিরদিন কাটায় জীবন,
তাহারা কেমনে যাবে সে কাননে হায়,
কর্ণেও শোনেনি বস্তু কিবা তাহে রয় !!

এক্ষণে আর পণ্ডিত-মোহজনক শাস্ত্রীয়-তর্ক নাই। শাস্ত্রাংশ লৌকিক-ভাবে কাগজ-পত্রে লিখিয়া ও বক্তৃতা দ্বারা বিষয়িলোককে ভুলাইয়া নবীন-শিক্ষিতেরা আপনাদের এবং আপনাদের সিদ্ধান্তের সারবত্তা উপলব্ধি করিতেছে। বিদ্বৎসভায় বিদ্যার পরিচয় না দিয়া এইরূপ কাগজে পত্রে বিষয়ি-লোকের মাঝে আস্ফালন করিবার প্রয়াসও দেশীয় নবশিক্ষিতগণকে ক্রমশঃ শাস্ত্রীয়-শক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া দিতেছে। প্রকৃত অভিজ্ঞগণের অনাদৃত কতকগুলো বাগ্‌জাল

লইয়া একদা কতকগুলি বিষয়িলোকের মধ্যে কোনও শিক্ষাভিমানীকে আস্ফালন করিতে দেখিয়া ন্যায়রত্নমহাশয় নিম্নলিখিত সদুপদেশপূর্ণ কবিতাটী রচনা করেন।

लीलाङ्गैर्नटनृत्यदर्शक ! सभा या शोभिता पण्डितैः
शक्तिश्चेद् बुधवीर ! तत्र गमनैः सभ्यान् जय प्रीणय ।
यो यो दर्शनमर्म्मलेशमपि नो जानाति तत्सन्निधौ
वक्तृत्वश्रवणेन शारदघनध्वानं स्मरामो वयं ॥

মর্ম্মার্থ।

ওহে বাগ্মী! মনে পড়ে দেখিয়া তোমারে,
নাটকের নট যেন হাত মুখ নাড়ে!
বস্তু কিছু আছে তব জ্ঞান যদি স্থির,
শুন হে আমার বাক্য, পণ্ডিতের বীর!
পণ্ডিতের সভা মাঝে হ'য়ে উপনীত,
তাদের করিও মুগ্ধ, ক'র পরাজিত।
দর্শনের কিছু মর্ম্ম যাহারা বোঝে না,
যাদের করেছে বিজ্ঞ আপন কল্পনা,
শুনিয়া তাদের সাথে দর্শনের বাদ
মনে পড়ে শরতের মেঘের নিনাদ!!

ন্যায়রত্নমহাশয় মনে করেন, আর্য্যশাস্ত্রসমূহ পাশ্চাত্য-নিয়মে শিক্ষা করিলে উত্তম শিক্ষা হয় না। দেশীয় ধনবানেরা কেহ শাস্ত্ররক্ষায় মনোযোগী হইলে তিনি যেন চতুষ্পাঠীর নিয়মে শিক্ষায় ব্যবস্থা করেন, ইহাই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইচ্ছা। সেরূপ করিতে হইলে, ভিন্ন

ভিন্ন বিভাগ প্রস্তুত করিতে হইবে। পল্লবগ্রাহী অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া, প্রত্যেক বিভাগে কৃতশ্রম সুধী অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। নানা বিষয়ের ভার মস্তকে অর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে, ছাত্রগণ এক বিষয়েই আদ্যোপান্ত যাহাতে গাঢ়রূপে চিন্তা করিতে পারেন, তাহার অবসর দিতে হইবে। কেবল অধ্যয়নে শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায় না। শাস্ত্রীয়-সমাজের একজন অদ্বিতীয় নেতা রঘুনাথশিরোমণি লিখিয়াছেন "অধ্যয়ন ভাবনাভ্যাং সারং নির্ণীয় নিখিল-তন্ত্রাণাং। দীধিতিমধিচিন্তামণিস্তনুতে তার্কিক-শিরোমণিঃ শ্রীমান্।" দর্শন-শাস্ত্রের অন্যতম নেতা মনীষিচূড়ামণি গদাধর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন "পাঠো বৃথা চিন্তনমন্তরেণ।" ৺মহতব্‌চাঁদ্, ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি যে সকল বিদ্যোৎসাহী প্রাচীন-ধনবানের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা বিদ্যামন্দিরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও মুর্শিদাবাদের দেশ-হিতৈষিণী বিদ্বৎপালিনী রাণী শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী প্রভৃতি দূরদর্শিনী ও দূরদর্শিগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিয়া দেশীয় বিদ্যার বিস্তার করিতেছেন। পাশ্চাত্য-নিয়মে আলোচিত শাস্ত্রের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকটীর দ্বারা ন্যায়রত্ন মহাশয় কোনও সময় অদ্ভুত ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

अन्वीक्षादिकभारती श्रुतिमयी वाणी सभागामिनी
दानीमालपतीति रोदनवती पाश्चात्यविद्यालये।
यस्मिः सङ्गतिसंहतिः कुमतिभिः संघातिता माद्दृशां
हाहा नृत्यपरा चरामि च कथं विद्यार्थिकण्ठाश्रिता॥

মর্ম্মার্থ।

সভারে নেহারে যদি বিদ্বৎ-সঙ্কুল
অধুনা যতেক শাস্ত্র কেঁদেই আকুল!
সভায় প্রবেশি তারা সকরুণ ভাবে
পরিচয় দিতে থাকে বিদ্বানের পাশে,
"পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য-প্রথায়
ক্রমশঃ হ'তেছে দেখ কি দুর্দ্দশা হায়!
সব শক্তি গেছে ঘুচে, নড়াচড়া ভার,
ভাবি শুধু কি হ'বে গো, কি হ'বে এবার!
কেমনে আমরা আর নৃত্যপরা হ'য়ে
বিদ্যার্থি-যুবার আহা কণ্ঠ আলিঙ্গিয়ে,
পূর্ব্বমত সভা মাঝে করিব বিহার,
বল গো মোদের দুঃখ ঘুচিবে কি আর?"
সভায় গেলেই এই মর্ম্মভেদি-খেদে
স্মৃতি-তর্ক যত শাস্ত্র ডাক ছেড়ে কাঁদে!!

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস উপলক্ষ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বাচরিত জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইল। এইখানেই আমরা পাঠকগণের নিকট বিদায় লইতেছি। বর্ত্তমান-সমাজের সম্পূর্ণ রোচক করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সকল এই গ্রন্থে আমরা বিবৃত করিতে পারি নাই। ন্যায়রত্নমহাশয় নিঃস্বার্থ-ভাবে সম্পূর্ণ ঋষি-নিয়মে আত্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষিরা, সর্ব্বজনীন-প্রীতিপ্রদ না হইলেও কল্যাণকর সত্যের আদর করিতেন। এ কারণ, অনেক বিষয় লিখিয়া মহর্ষি-গণকে তাঁহাদের বংশধরগণের নিকট সময়ে সময়ে পাগল সাজিতে হই-

তেছে। ঐশ্বরিক অদ্ভুত-কাহিনীসকল লিপিবদ্ধ করিয়া সময়ে সময়ে উপকথা-প্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হইতেছে। কিরূপ লিপি কোন্ সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য হইবে, কিরূপ লিপির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, কিরূপ লিপি কোন্ সময়ে অপমানের হেতু হইবে, তাহা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ বিলক্ষণ জানিতেন। তথাপি তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, লেখকতা করিতে হইলে সর্ব্বজনীন-প্রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা, কল্যাণকর সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করাই প্রয়োজন। ন্যায়রত্নমহাশয়ও, সেই হেতু নিবন্ধন প্রাচীন-সমাজের বহু সারবত্তার প্রশংসা এবং আধুনিক-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু অসার-বস্তুর উপর কটাক্ষ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ভূমিকায়ই আমরা ব্যক্ত করিয়াছি, বর্ত্তমান-সমাজে শিক্ষা অপেক্ষা সমালোচনার স্রোতই প্রবল। সমাজে যখন শিক্ষার স্রোতঃ প্রবল ছিল, তখন লৌকিক-বুদ্ধি, লৌকিক-যুক্তি ও লৌকিক-তর্কে পরিচালিত হইয়া সকলে সকল বিষয়ে কথা কহিতেন না। প্রাচীনেরা বুঝিতেন, লৌকিক-বুদ্ধি, লৌকিক-তর্ক ও লৌকিক-যুক্তির প্রামাণ্য অতি অল্প। আজ বাল্যকালে তোমার সহস্র উপদেশে আমি যে কথা বুঝিলাম না, যে কথার বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় সহস্র সহস্র প্রতিবাদ অস্ত্র আমার মনে উদিত হইতে লাগিল, কল্য যৌবনে অনেক-স্থলে বিনা তর্কে, বিনা উপদেশে, আমি সেই কথাই বুঝিয়া ফেলি। পরশ্বঃ বার্দ্ধক্যে আবার আর এক প্রকার অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যদি বার্দ্ধক্যের পর প্রত্যক্ষগোচর আরও দুই চারিটী অবস্থা থাকিত, তাহাহইলে তখনও বোধহয় আরও নব নব সিদ্ধান্তে চিত্ত সমাহিত হইত। এ কারণ, আত্ম-সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র প্রামাণ্য-বুদ্ধি না করিয়া পূর্ব্বে বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি সমুদয় সামগ্রী শাস্ত্রানুকূল করিতে আর্য্যসমাজ

শিক্ষা করিত। হিন্দুশাস্ত্র এমনই সামগ্রী যে, ইহাতে ধর্ম্ম-নীতি, স্বভাব-নীতি, আচার-নীতি, ব্যবহার-নীতি কিছুরই অভাব নাই। নৈতিক-আলোচনায় সকল নীতি বিষয়েই প্রকৃত-শাস্ত্রজ্ঞগণের দৃষ্টি খুলিয়া যাইত। লোকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে শাস্ত্রজ্ঞ-গুরুর গৃহে বাস করিয়া, তাঁহার আচার, ব্যবহার, মনোভাব, শিক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে নিজ-মনোবৃত্তি গঠিত করিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের অবস্থা এক্ষণে আর পূর্ব্ববৎ নহে। যদি এই পুস্তকে মহাপুরুষের গ্লানিকর কোনও বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি মহাপুরুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে ভ্রম করিয়া অন্যভাবে কোনও বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে, তাঁহাকে দ্বার করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার জন্য কোথাও যদি চেষ্টা করা হইয়া থাকে, যদি সিদ্ধ-প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কোনও সিদ্ধান্ত চলিয়া থাকে, তবে বৃদ্ধাচারের পক্ষপাতী, সেই কাশীবাসী দেশবৎসল বৃদ্ধমহাত্মা এই গ্রন্থকারকে ক্ষমা করুন।

অনেক-ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমার জীবনে যাহা শোভাকর, তোমার জীবনে তাহা শোভাকর নহে। ভৃত্য-জীবনে যাহা শোভাকর, প্রভু-জীবনে তাহা শোভাকর নহে। প্রজার জীবনে যাহা শোভাকর, রাজার জীবনে তাহা শোভাকর নহে। বীর-জীবনে যাহা শোভাকর, বিপ্র-জীবনে তাহা শোভাকর নহে। পুরুষ-জীবনে যাহা শোভাকর, নারী-জীবনে তাহা শোভাকর নহে। যাঁহারা নবীনশিক্ষিত নব-সংস্কারের প্রয়াসী, তাঁহাদের জীবনে হয়তো সংস্কার-চেষ্টা, প্রাচীন-সমাজের সারবত্তায় অবিশ্বাস, প্রাচীনগণের বুদ্ধিমত্তার অপ্রামাণ্য-বুদ্ধি, স্ব-স্ব-প্রধান যুক্তিজালে নির্ভর প্রভৃতি শোভাকর হইতে পারে। কিন্তু ন্যায়রত্নমহাশয়ের জীবনের পক্ষে সেগুলি শোভাকর বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। প্রাচীন-সমাজ রক্ষা, শাস্ত্রত্ব-

নির্ণয়ে প্রাচীনগণের বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাস, নবসংস্কারপ্রয়াসিগণের প্রতি উপেক্ষা, প্রাচীনাবলম্বিত-শাস্ত্রসমূহের সারবত্তা-প্রকাশে যত্ন, স্বেচ্ছাচার-নিবারণ-পক্ষে আগ্রহ, ইত্যাদি কার্য্যই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের শোভাস্পদ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ন্যায়রত্নমহাশয়ের জীবনে যাহা শোভাস্পদ হওয়া উচিত, ন্যায়রত্নমহাশয়ের জীবন যে তদ্দ্বারাই গঠিত, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ সমালোচনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। ন্যায়রত্নমহাশয়ের জীবনে যাহা শোভাকর, সকলের জীবনে যে তাহা শোভাবৰ্দ্ধক, এমন কথা আমরা বলি নাই। যাঁহারা এই সকলের বিরুদ্ধবাদী ও প্রতিষ্ঠিত, হইতে পারে তাঁহাদের জীবনের পক্ষে তাঁহাদের সিদ্ধান্তই শোভাসম্পাদক। অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কেহ মত প্রকাশ করেন, তাঁহার জীবনের তাহা শোভাসম্পাদক, এই বিশ্বাসে আমাদের কোনই আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

নিষ্ঠাপূতকলেবরে ক্ষিতিসুরে প্রোদ্যৎযশোভাস্বরে
ভক্তিক্রীতমহেশ্বরে হিতকরে শাস্ত্রৈকসেবাপরে।
ধীরে ধৈর্য্যধরাধরে গুণধরে কারুণ্যধারাধরে
রোষো মাস্তু চরাচরে মতিমতাং সদ্‌জ্ঞানরত্নাকরে॥



মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের

হস্তাক্ষর ।

শ্রীদুর্গা

কৈবল্যাগমসাধিনী সুরধুনী কাশী চ কৈবল্যদা
যুক্তং তদ্দ্বয়মেব তাবতি ভগবাংস্ত্বং মহামন্ত্রদঃ ।
ভাগধেয়ং বিভর্ত্তি পি—ত্রিজগতাং মাতা মুদা চান্নদা
কিং লব্ধুং বিপদাস্পদে পরপদে ভ্রান্তং মনো ভ্রাম্যসি ।